স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা

(অর্থবছর ২০১১-২৫)

বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর

মূল সংস্করণ

সূচিপত্র

১ পটভূমি ১২

১.১ ভূমিকা ১২
১.২ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ১৩
১.২.১ *প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রোফাইল* ১৩
১.২.২ *জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কাঠামো (ফ্রেমওয়ার্ক)* ১৪
১.৩ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর ১৫
১.৩.১ *আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজ* ১৫
১.৩.২ *পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্য* ১৫
১.৩.৩ *সেক্টর সহযোগীবৃন্দ* ১৭
১.৩.৪ *প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো* ১৮
১.৪ সেক্টর উন্নয়ন কাঠামো ১৯
১.৪.১ *আইনি দলিলপত্র* ২০
১.৪.২ *নীতিমালা ও কৌশলপত্রসমূহ* ২১
১.৫ সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ২২
১.৬ সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মপরিধি ২৩
১.৭ সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনার মেয়াদসমূহ ২৪
১.৮ পরিকল্পনা প্রণয়নে গৃহীত পন্থা ও পদ্ধতিসমূহ ২৫
১.৯ প্রতিবেদন রূপরেখা ২৭

২ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পরিস্থিতি ২৮

২.১ পানি সরবরাহ পটভূমি, সংজ্ঞা ও কভারেজ ২৮
২.১.১ *পানি সরবরাহের পটভূমি* ২৮
২.১.২ *সংজ্ঞা ও কভারেজ* ২৯
২.১.৩ *বিদ্যমান পানি সরবরাহ কভারেজের সার-সংক্ষেপ* ৩১
২.২ স্যানিটেশন পটভূমি, সংজ্ঞা ও কভারেজ ৩২
২.২.১ *স্যানিটেশন পটভূমি* ৩২
২.২.২ *সংজ্ঞা ও কভারেজ* ৩২
২.২.৩ *স্যানিটেশন কভারেজের সার-সংক্ষেপ* ৩৪
২.৩ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন উপখাতসমূহ ৩৫
২.৩.১ *গ্রামীণ ও নগর জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ* ৩৫
২.৪ নগর উপখাত বা সাব-সেক্টর ৩৬
২.৪.১ *নগর সেবাদান ব্যবস্থা* ৩৬
২.৪.২ *ওয়াসাসহ নগর এলাকার পরিস্থিতি* ৩৭
২.৪.৩ *সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর পরিস্থিতি* ৩৯
২.৪.৪ *নগর ড্রেইনেজ ব্যবস্থা* ৪২
২.৪.৫ *নগর উপখাতের জন্য কর্ম-নির্দেশনা* ৪৩
২.৫ গ্রামীণ উপখাত ৪৪
২.৫.১ *গ্রামীণ সেবাদান ব্যবস্থা* ৪৪

২.৫.২ *গ্রামীণ পানি সরবরাহ পরিস্থিতি* ৪৫
২.৫.৩ *গ্রামীণ পানি সরবরাহ কভারেজ* ৪৭
২.৫.৪ *গ্রামীণ স্যানিটেশন পরিস্থিতি* ৪৯
২.৫.৫ *গ্রামীণ উপখাতের জন্য কর্ম-নির্দেশনা* ৫২

৩ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের থিম্যাটিক বিষয়সমূহ ৫৪

৩.১ ভূমিকা ৫৪
৩.২ ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি ৫৪
৩.২.১ *পানিসম্পদ* ৫৪
৩.২.২ *ভূ- পৃষ্ঠস্থ পানি* ৫৫
৩.২.৩ *ভূ- পৃষ্ঠস্থ পানির সমস্যা ও সুপারিশ* ৫৮
৩.৩ ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ৫৯
৩.৩.১ *ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ বিষয়ক প্রেক্ষিত গবেষণা* ৫৯
৩.৩.২ *বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানি* ৫৯
৩.৩.৩ *ভূ-গর্ভস্থ পানির লভ্যতা* ৬০
৩.৩.৪ *পানির স্তর অবনমন ও গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রযুক্তি* ৬২
৩.৩.৫ *পরিমাণগত লভ্যতার প্রভাবকসমূহ* ৬৩
৩.৩.৬ *নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ* ৬৩
৩.৩.৭ *বর্তমানে অসম্পাদিত ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম* ৬৬
৩.৩.৮ *ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য সুপারিশমালা* ৬৬
৩.৪ পানির গুণগত মান.. ৬৬
৩.৪.১ *পানির গুণাগুণ মানদণ্ড ও নির্দেশিকা* ৬৬
৩.৪.২ *পানির গুণাগুণ পরিস্থিতি* ৬৭
৩.৪.৩ *পানির মান পরিবীক্ষণ* ৬৮
৩.৪.৪ *পানির মান বিষয়ক সুপারিশমালা* ৬৮
৩.৫ আর্সেনিক নিরসন ৭০
৩.৫.১ *সংক্রমণ পরিস্থিতি* ৭০
৩.৫.২ *আর্সেনিক নিরসনমূলক কার্যক্রমের সমস্যা ও এ থেকে অর্জিত শিক্ষা* ৭১
৩.৫.৩ *আর্সেনিক নিরসনে সুপারিশমালা* ৭৩
৩.৬ পানি-নিরাপত্তা পরিকল্পনা ৭৩
৩.৬.১ *পানি নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা* ৭৩
৩.৬.২ *পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার ধারণা ও চর্চা* ৭৪
৩.৬.৩ *সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ* ৭৬
৩.৬.৪ *পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার কর্ম-নির্দেশনা* ৭৬
৩.৭ স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার ৭৭
৩.৭.১ *স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারের গুরুত্ব* ৭৭
৩.৭.২ *বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার* ৭৯
৩.৭.৩ *বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারের সমস্যা ও কার্যকারিতা* ৮১
৩.৭.৪ *বিদ্যালয়ে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ* ৮২
৩.৭.৫ *স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারে কর্ম-নির্দেশনা* ৮৫
৩.৮ নাজুক জনগোষ্ঠী ৮৬
৩.৮.১ *ভূমিকা* ৮৬
৩.৮.২ *নারী* ৮৭
৩.৮.৩ *শিশু* ৮৮

৩.৮.৪ *ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তি* ৮৯
৩.৮.৫ *দেশজ/আদিবাসী জনগোষ্ঠী* ৮৯
৩.৮.৬ *সুবিধাবঞ্চিত ও অতি-দরিদ্র ব্যক্তি* ৯০
৩.৮.৭ *ভাসমান জনগোষ্ঠী* ৯১
৩.৮.৮ *নাজুক জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ* ৯২
৩.৮.৯ *নাজুক জনগোষ্ঠী বিষয়ে কর্ম-নির্দেশনা* ৯২
৩.৯ বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ ৯৩
৩.৯.১ *বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ* ৯৩
৩.৯.২ *ক্ষুদ্রাকার হার্ডওয়্যার বাজার* ৯৪
৩.৯.৩ *ক্ষুদ্রাকার সেবা বাজার* ৯৫
৩.৯.৪ *বৃহদাকার নগরসেবা প্রতিষ্ঠানের বাজার* ৯৭
৩.১০ পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ৯৯
৩.১০.১ *পরিবেশ, উন্নয়ন, দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন ও জীবিকার মধ্যে যোগসূত্র* ৯৯
৩.১০.২ *পরিবেশ* ১০০
৩.১০.৩ *জলবায়ু পরিবর্তন* ১০৪
৩.১০.৪ *দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা* ১০৭
৩.১০.৫ *পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্ম-নির্দেশনা* ১০৯
৩.১১ গবেষণা ও উন্নয়ন ১১১
৩.১১.১ *ভূমিকা* ১১১
৩.১১.২ *সংগঠন ও কার্যক্রম* ১১১
৩.১১.৩ *সমস্যা ও অন্তরায়সমূহ* ১১২
৩.১১.৪ *গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ে কর্ম-নির্দেশনা* ১১৪
৩.১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম ১১৫
৩.১২.১ *ভূমিকা* ১১৫
৩.১২.২ *প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো* ১১৫
৩.১২.৩ *পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবস্থা* ১১৬
৩.১২.৪ *সমস্যা ও কর্ম-নির্দেশনা* ১১৮

৪ আইন, নীতিমালা ও কৌশলসমূহ ১২০

৪.১ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতের জন্য আইনি কাঠামো ১২০
৪.১.১ *পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রণয়নাধীন আইন ও প্রবিধানসমূহ* ১২১
৪.১.২ *পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য প্রস্তাবিত নতুন আইন ও প্রবিধানমালা* ১২৪
৪.২ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য জাতীয় নীতিমালা ও কৌশলপত্রসমূহ ১২৭
৪.২.১ *জাতীয় নীতিমালাসমূহ* ১২৭
৪.২.২ *জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র* ১৩০
৪.৩ নতুন সেক্টর উন্নয়ন কর্ম-কাঠামো ১৩২

৫ সেক্টরের সামর্থ্য বৃদ্ধি ১৩৪

৫.১ সংজ্ঞা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির স্তর ১৩৪
৫.২ সংগঠন ও ব্যক্তির সামর্থ্য বৃদ্ধি ১৩৫
৫.২.১ *সরকারি সংস্থাগুলোর সাংগঠনিক কাঠামো* ১৩৬
৫.২.২ *স্থানীয় সরকার বিভাগ (LGD)* ১৩৬
৫.২.৩ *জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE)* ১৩৭

৫.২.৪ পানি সরবরাহ ও পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (WASAs) ১৩৯
৫.২.৫ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা ১৪০
৫.২.৬ ইউনিয়ন পরিষদ ১৪১

৬ সেক্টর বিনিয়োগ পরিকল্পনা **১৪৭**

৬.১ ভূমিকা ১৪৭
৬.১.১ পরিকল্পনার ক্ষেত্রসমূহ ১৪৭
৬.২ বিনিয়োগ প্রাক্কলনের জন্য বিবেচিত প্রভাবকসমূহ ১৪৮
৬.২.১ জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ ১৪৮
৬.২.২ প্রযুক্তি বিকল্প ১৪৮
৬.২.৩ পানির গুণগত মানদণ্ড ১৪৮
৬.২.৪ সেবার একক-প্রতি মূল্য (unit cost) ১৪৯
৬.৩ সেক্টর উন্নয়ন দৃশ্যকল্পসমূহ ১৪৯
৬.৩.১ সেবাস্তর ও পরিচালনা দক্ষতার নির্দেশক ১৪৯
৬.৪ বিনিয়োগ ব্যয় (Investment costs)... ১৫১
৬.৪.১ ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ১৫২
৬.৪.২ বিনিয়োগ ব্যয় বিভাজন ১৫২
৬.৫ তহবিলের উৎস ১৫৩
৬.৫.১ বাজেট লভ্যতা (availability) ১৫৫

৭ সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন **১৫৮**

৭.১ সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (SDP) বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ১৫৮
৭.২ এসডিপি বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণ ১৫৮
৭.৩ এসডিপি কার্যক্রমের সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ১৫৮
৭.৩.১ সেক্টর পর্যায়ে সমন্বয়ের বর্তমান অবস্থা ১৫৯
৭.৩.২ সমস্যাসমূহ ১৬০
৭.৩.৩ সেক্টর সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের জন্য কর্ম-নির্দেশনা ১৬১
৭.৪ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে সেক্টর-ভিত্তিক পন্থা (SWAp) ১৬৫
৭.৪.১ সোয়াপ সম্পর্কে ধারণা ১৬৫
৭.৪.২ বাংলাদেশে সোয়াপ বাস্তবায়ন পরিস্থিতি ও অর্জিত শিখন ১৬৭
৭.৪.৩ সমস্যাসমূহ ১৬৯
৭.৪.৪ সোয়াপ বিষয়ে সুপারিশমালা ১৬৯
৭.৫ এসডিপি বাস্তবায়নের পথ-নির্দেশনা (Road map) ১৭০
৭.৫.১ প্রারম্ভিক পর্যায়ে প্রধান কার্যক্রমসমূহ ১৭০
৭.৬ ঝুঁকিসমূহ ও নিরসনমূলক পদক্ষেপ ১৭১

সারণি তালিকা

সারণি ১.১ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমের অর্থনৈতিক সুফল ১৬
সারণি ১.২ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজ অর্জনের লাভ-ক্ষতির অনুপাত ১৬
সারণি ২.১ পানি সরবরাহ কভারেজ নিরূপণের বিভিন্ন মানদণ্ড.. ৩০
সারণি ২.২ বিভিন্ন মানদণ্ড অনুযায়ী পানি সরবরাহ কভারেজের সার-সংক্ষেপ...৩১

সারণি ২.৩ স্যানিটেশন কভারেজ নিরূপণে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের মানদণ্ডের সংজ্ঞা ৩৩
সারণি ২.৪ স্যানিটেশন কভারেজের সার-সংক্ষেপ ৩৪
সারণি ২.৫ ওয়াসাভুক্ত শহরগুলোর পানি সরবরাহ পরিস্থিতি ৩৮
সারণি ২.৬ ওয়াসাভুক্ত শহরগুলোর স্যানিটেশন পরিস্থিতি ৩৯
সারণি ২.৭ তিনটি সিটি কর্পোরেশনের পানি সরবরাহ পরিস্থিতি ৪০
সারণি ২.৮ পৌরসভাসমূহে পাইপবাহিত পানি সরবরাহ পরিস্থিতি ৪০
সারণি ২.৯ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের স্যানিটেশন পরিস্থিতি ৪২
সারণি ২.১০ দুর্গম এলাকাভুক্ত ইউনিয়নের সংখ্যা ৪৬
সারণি ২.১১ সরকারি পানির উৎস সংখ্যা ৪৮
সারণি ২.১২ গ্রামীণ পানি সরবরাহ কভারেজ ৪৯
সারণি ২.১৩ গ্রামীণ এলাকায় স্যানিটেশন পরিস্থিতি ৪৯
সারণি ৩.১ বাংলাদেশের বৃহত্তর জলাশয় ৫৬
সারণি ৩.২ ব্যবহারযোগ্য পুনঃভরাট ও ভূ-গর্ভস্থ পানির চাহিদা ৬০
সারণি ৩.৩ ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় যুক্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ ৬৪
সারণি ৩.৪ ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা বা উন্নয়নে সম্পৃক্ত সরকারি সংস্থার বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যত কর্মকাণ্ড......৬৫
সারণি ৩.৫ পানির গুণগত মানের স্থিতিমাপসমূহের ধরণ ৬৭
সারণি ৩.৬ পানির মান পরিবীক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়/স্তর ৬৯
সারণি ৩.৭ বিভিন্ন আর্সেনিক সংক্রমিত ও নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজভুক্ত এলাকার অধীন ইউনিয়ন সংখ্যা........ ৭১
সারণি ৩.৮ বিভিন্ন আর্সেনিক-সংক্রমিত ও নিরাপদ পানি সরবরাহ কভারেজভুক্ত এলাকায় চিহ্নিত আর্সেনিকোসিস রোগীর সংখ্যা........ ৭১
সারণি ৩.৯ পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের পানি সরবরাহ প্রযুক্তি (শতকরা)........১১৭
সারণি ৩.১০ পরিবারসমূহ কর্তৃক ব্যবহৃত উন্নত পায়খানার পর্যায় (শতকরা হার) ১১৭
সারণি ৪.১ পানি ও স্যানিটেশন খাত নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন, অধ্যাদেশ ও অন্যান্য আইনি দলিলপত্র ১২১
সারণি ৬.১ বিনিয়োগ পরিকল্পনার বিবেচ্য পরিকল্পনা ক্ষেত্রসমূহ........১৪৭
সারণি ৬.২ নগর পানি সরবরাহে সেবাস্তর ও পরিচালনা দক্ষতার নির্দেশক ১৪৯
সারণি ৬.৩ গ্রামীণ পানি সরবরাহে সেবাস্তর ও পরিচালনা দক্ষতার নির্দেশক (উৎসভিত্তিক) ১৫০
সারণি ৬.৪ নগর স্যানিটেশনে সেবাস্তর ও পরিচালনা দক্ষতার নির্দেশক........১৫০
সারণি ৬.৫ গ্রামীণ স্যানিটেশনে সেবাস্তর ও পরিচালনা দক্ষতার নির্দেশক ১৫০
সারণি ৬.৬ বিভিন্ন উন্নয়ন দৃশ্যকল্পের জন্য প্রাক্কলিত মোট বিনিয়োগ ব্যয় ১৫১
সারণি ৬.৭ বিভিন্ন শ্রেণীর নগর উপখাত ও গ্রামীণ উপখাতের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ব্যয় ১৫৩
সারণি ৬.৮ মোট বিনিয়োগ ব্যয় অর্থায়নের ক্ষেত্রে সেক্টর সহযোগীদের অবদান........১৫৪
সারণি ৬.৯ এসডিপি'র স্বল্পমেয়াদে সরকারি খাতে বিনিয়োগ চাহিদা ও বাজেট লভ্যতা ১৫৬
সারণি ৭.১ জাতীয় পর্যায়ে সেক্টর তথ্য ব্যবস্থাপনা দক্ষতার প্রধান নির্দেশকসমূহ ১৬২
সারণি ৭.২ বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য প্রস্তাবিত সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা ১৬৪
সারণি ৭.৩ অনুমিত ঝুঁকিসমূহ ও প্রশমনমূলক পদক্ষেপ ১৭২

চিত্র তালিকা

চিত্র ১.১ (ক) বাংলাদেশ, আঞ্চলিক দেশসমূহ, দক্ষিণ এশিয়া ও বৈশ্বিক পানি সরবরাহ কভারেজ ১৫
চিত্র ১.১ (খ) বাংলাদেশ, আঞ্চলিক দেশসমূহ, দক্ষিণ এশিয়া ও বৈশ্বিক স্যানিটেশন কভারেজ. ১৫
চিত্র ১.২ সেক্টর উন্নয়ন কাঠামোর স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম যেটির আওতায় সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে........২০
চিত্র ১.৩ ডায়াগ্রামে এসডিপি বাস্তবায়নের তিন মেয়াদে সেক্টরের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন প্রদর্শিত হয়েছে ২৪
চিত্র ২.১ ২০০৩ ও ২০০৯ সনের জাতীয় স্যানিটেশন কভারেজ ৩৫
চিত্র ২.২ জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ ৩৬
চিত্র ২.৩ গ্রামীণ এলাকায় স্যানিটেশন অনুশীলন ৫২
চিত্র ৩.১ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদী ও সেগুলোর জলনিকাশ এলাকা ৫৬
চিত্র ৩.২ ডিপিএইচই কর্তৃক নিরূপিত (২০০৯ সন) বাংলাদেশের নিম্নতম পানিস্তর গভীরতা ৬২
চিত্র ৩.৩ ১৫০মিটার পর্যন্ত ও ১৫০ মিটারের অধিক গভীরতায় স্থাপিত নলকূপে আর্সেনিকের বিন্যাস ৭০

চিত্র ৩.৪ ডায়ারিয়াজনিত রোগে শিশুমৃত্যুর হার কমাতে হার্ডওয়ার ও হাইজিন কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা ৭৯
চিত্র ৩.৫ দারিদ্র্য ও নাজুক জনগোষ্ঠী - একটি দুষ্টচক্র ৮৬
চিত্র ৩.৬ পানি সরবরাহ নও স্যানিটেশন ক্টেরের তিনটি প্রধান বাজারের অংশ ৯৪
চিত্র ৩.৭ জলবায়ু পরিবর্তনের কার্যকারণ ডায়াগ্রাম: নির্দেশক, পানি ও স্যানিটেশনের পরিণাম এবং মানব জীবনের ওপর প্রভাব....................১০৬
চিত্র ৩.৮ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র ১০৮
চিত্র ৪.১ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০০৯'র আওতায় ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় প্রস্তাবিত কার্যক্রম, ভূমিকা ও দায়িত্ব বিভাজন ১২৩
চিত্র ৪.২ আর্সেনিক নিরসনের জন্য নীতিমালা ও পরিকল্পনাসমূহের সংগঠন....................১৩০
চিত্র ৪.৩ অভিপ্রেত সেক্টর উন্নয়ন কর্ম-কাঠামো ১৩৩
চিত্র ৫.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর অধীনস্থ সংস্থাগুলোর সাংগঠনিক কাঠামো ১৩৬
চিত্র ৬.১ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ ব্যয়ের পরিমাণ ১৫১
চিত্র ৬.২ স্বল্পমেয়াদে (অর্থবছর ২০১১-১৫) বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে মোট ব্যয়ের শতকরা বিভাজন ১৫৩
চিত্র ৬.৩ স্বল্পমেয়াদে (অর্থ বছর ২০১১-১৫) তহবিল উৎসের শতকরা হার....................১৫৪
চিত্র ৬.৪ ২০০৭-১১ অর্থবছরসমূহে এডিপি বাজেট বরাদ্দের শতকরা হার ১৫৫
চিত্র ৬.৫ ২০০৭-১১ অর্থবছরসমূহে এডিপি বরাদ্দের (মিলিয়ন বাংলাদেশি টাকায়) পরিমাণ....................১৫৫
চিত্র ৬.৬ বিগত পাঁচ বছরের এডিপি ও ২০১১-১৩ অর্থবছরের MTBF বরাদ্দ....................১৫৬
চিত্র ৬.৭ সেক্টর সংস্থাসমূহের MTBF বরাদ্দ....................১৫৬
চিত্র ৭.১ সেক্টর সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা....................১৬১
চিত্র ৭.২ একটি সোয়াপের উপাদানসমূহ ১৬৬
চিত্র ৭.৩ বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে সোয়াপ-এর স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম ১৭০

বক্স তালিকা

বক্স ১.১ সেক্টর ও সেক্টরের কতিপয় মৌলিক উপাদানের সংজ্ঞা ২৩
বক্স ২.১ বিভিন্ন ধরণের পায়খানার সাধারণ্যে ব্যবহৃত সংজ্ঞাসমূহ ৩৩
বক্স ২.২ জনগোষ্ঠী-নেতৃত্বে সার্বিক স্যানিটেশন (কমিউনিটি-লেড টোটাল স্যানিটেশন).................... ৫০
বক্স ২.৩ স্যানিটেশন সোপান (স্যানিটেশন ল্যাডার) ৫১
বক্স ৩.১ পানিতাত্ত্বিক চক্র ৫৫
বক্স ৩.২ নিরাপদ খাবার পানির কর্ম-কাঠামো ৭৫
বক্স ৩.৩ মল-মুখের মাধ্যমে রোগ সংক্রমণের এফ-ডায়াগ্রাম ৭৮
বক্স ৩.৪ মীনা ৮০
বক্স ৩.৫ স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ বিষয়ে জীবন-দক্ষতা (Life-Skills) ৮২
বক্স ৩.৬ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণের স্থিতিশীল স্বাস্থ্যসুফল কর্ম-কাঠামো.................... ৮৩
বক্স ৩.৭ বিদ্যালয়ে ওয়াশ কার্যক্রমের সুফল ৮৪
বক্স ৩.৮ জেণ্ডার পরিভাষার সংজ্ঞা ৮৭
বক্স ৩.৯ শহুরে বস্তির ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য উদ্ভাবনীমূলক কমিউনিটি ল্যাট্রিনের মডেল ৯০
বক্স ৩.১০ স্যানিটেশন সোপানে আরোহণ - বেসরকারি খাতের অবদান ৯৫
বক্স ৩.১১ বাংলাদেশঃ সেবাসুবিধার ক্ষেত্রে ঢাকার বস্তিবাসীদের অভিগম্যতার উন্নয়ন ৯৬
বক্স ৩.১২ অধিকতর ভারসাম্যপূর্ণ ও টেকসই সমাধানের জন্য ত্রিপক্ষীয় অংশীদারিত্ব ৯৮
বক্স ৩.১৩ বাংলাদেশে PPP'র উত্তরণ পর্যায় ৯৯
বক্স ৩.১৪ পরিবেশ, উন্নয়ন, দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে যোগসূত্র ১০০
বক্স ৩.১৫ পরিবেশের বৃহত্তর ক্ষেত্র ১০০
বক্স ৩.১৬ বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নগরী – ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ভূ- পৃষ্ঠস্থ পানি দূষণ ১০২
বক্স ৩.১৭ পরিবেশের ওপর চাপ, দূষণ পর্যায় এবং জীবন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর প্রভাবের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক.... ....১০৩
বক্স ৩.১৮ জলবায়ু পরিবর্তন বিভিন্ন উপায়ে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ বাড়াবে ১০৫

বক্স ৩.১৯	উদ্ভাবন একটি কৌশলী প্রক্রিয়া যা জটিল ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করে এমন নীতিসমূহ দ্বারা উন্নয়ন করা যায়	১১৩
বক্স ৩.২০	অব্যাহত এবং নতুন গবেষণা ও উন্নয়নের প্রধান কিছু বিষয়সমূহ	১১৫
বক্স ৪.১	তিনটি প্রধান সহযোগী: নীতি নির্ধারক, সেবাপ্রদানকারী ও ভোক্তার মধ্যেকার জবাবদিহিতার সম্পর্ক.	১২৫
বক্স ৪.২	কার্যকর নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্বশর্তসমূহ বিষয়ে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা	১২৬
বক্স ৫.১	সামর্থ্য বৃদ্ধির স্তরসমূহ	১৩৫
বক্স ৫.২	হাইসাওয়া ফান্ড: বিকেন্দ্রীকৃত গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানের একটি নতুন ধারণা	১৪৩
বক্স ৫.৩	আনুভূমিক শিখন কর্মসূচি (হরাইজন্টাল লার্নিং প্রোগ্রাম - HLP)	১৪৪
বক্স ৫.৪	পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগোষ্ঠী ব্যবস্থাপনায় পাইপবাহিত পানি সরবরাহ স্কীম: অন্যত্র উন্নয়নের অনুসরণীয় মডেল	১৪৫
বক্স ৭.১	প্রস্তাবিত সেক্টর তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সরলীকৃত রূপরেখা	১৬৩
বক্স ৭.২	প্রকল্প ধারণার পরিবর্তে সোয়াপ-এর সুবিধাসমূহ	১৬৬
বক্স ৭.৩	বাংলাদেশে সোয়াপ বাস্তবায়ন	১৬৮

শব্দ-সংক্ষেপ তালিকা

এডিবি	এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক)
এডিপি	এ্যানুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি)
এপিএসইউ	(আপসু) আর্সেনিক পলিসি সাপোর্ট ইউনিট
অসএইড	অস্ট্রেলিয়ান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট
বিএডিসি	বাংলাদেশে এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন)
বিবিএস	বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস্ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)
সিসিইডিএম	ক্লাইমেট চেঞ্জ, এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট (জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা)
বিসিএসআইআর	বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্স (বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ)
বিডিটি	বাংলাদেশি টাকা
বিএমডিএ	বারিন্দ মাল্টিপারপাস ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ)
বিওও (বু)	বিল্ড, অপারেট এ্যান্ড ওউন
বিএসটিআই	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস্ এ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন
বিটিও	বিল্ড অপারেট ট্রান্সফার
বিইউইটি (বুয়েট)	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড টেকনোলজি (বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)
বিডব্লিউডিবি	বাংলাদেশ ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (পানি উন্নয়ন বোর্ড)
সিবিও	কমিউনিটি বেজড অর্গানাইজেশন (জনগোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠন)
সিডিসি	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার
সিএইচটি	চিটাগাং হিল ট্রাক্টস্ (পার্বত্য চট্টগ্রাম)
সিআইডিএ (সিডা)	কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি
সিআইএস	কমনওয়েলথ্ অব ইনডিপেন্ডেন্ট স্টেটস্
সিএলটিএস	কমিউনিটি-লেড টোটাল স্যানিটেশন
ডিএএলওয়াই (ডালি)	ডিজএবিলিটি-এ্যাডজাস্টেড লাইফ-ইয়ারস্
ডানিডা	ড্যানিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসিস্ট্যান্স
ডিএফআইডি	ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট
ডিজি-এইচএস	ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব হেলথ্ সার্ভিসেস (স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তর)
ডিএমসি	ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি)
ডিএমবি	ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ব্যুরো
ডিওই	ডিপার্টমেন্ট অব এনভায়রনমেন্ট (পরিবেশ অধিদপ্তর)
ডিপি	ডেভেলপমেন্ট পার্টনার (উন্নয়ন সহযোগী)
ডিপিই	ডাইরেক্টরেট অব প্রাইমারী এডুকেশন (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর)
ডিপিএইচই	ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর)
ডিআরআর	ডাইরেক্টরেট অব রিলিফ এ্যান্ড রিহ্যাবিলাইটেশন (ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর)
ডিএসকে	দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র
ডিএসপি	ডিপ-সেট পাম্প
ডি-ওয়াসা	ঢাকা ওয়াসা (ওয়াটার এ্যান্ড স্যুয়ারেজ অথরিটি)
ইআরডি	এক্সটারনাল রিসোর্স ডিভিশন (বহিঃসম্পদ বিভাগ)
এফডিআই	ফরেইন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট (প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ)
এফজিডি	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন
জিডিপি	গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট
জিওবি	গভার্নমেন্ট অব বাংলাদেশ
জিএসবি	জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ

এইচডিসি	হিল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (পার্বত্য জেলা পরিষদ)
এইচএলপি	হরাইজোন্টাল লার্নিং প্রোগ্রাম
এইচপিএসপি	হেলথ্ এ্যান্ড পপুলেশন সেক্টর প্রোগ্রাম
হাইসাওয়া	হাইজিন, স্যানিটেশন এ্যান্ড ওয়াটার সাপ্লাই
আইইসি	ইনফরমেশন, এডুকেশন এ্যান্ড কমিউনিকেশন
আইজি	ইনফিলট্রেশন গ্যালারি
আইআইএফসি	ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার
আইএমডিএমসিসি	ইন্টার-মিনিস্ট্রিয়াল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটি (আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি)
আইপিএএম	ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান ফর আর্সেনিক মিটিগেশন (আর্সেনিক নিরসন বাস্তবায়ন পরিকল্পনা)
আইপিসিসি	ইন্টার-গভার্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ
আইপি-ডব্লিউএস	ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান ফর ওয়াটার সাপ্লাই
আইআরপি	আয়রন রিমুভাল প্লান্ট
আইটিএন	ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং নেটওয়ার্ক
জাইকা	জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি
জেএমপি	জয়েন্ট মনিটরিং প্রোগ্রাম
কেআইআই	কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ
কেএসএ	নলেজ, স্কিল এ্যান্ড এটিচিউড
এলসিজি	লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ
এলজিডি	লোকাল গভার্নমেন্ট ডিভিশন (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
এলজিইডি	লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর)
এলজিআই	লোকাল গভার্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান)
এলজিএসপি	লোকাল গভার্নমেন্ট সাপোর্ট প্রজেক্ট
এলপিসিডি	লিটার পার ক্যাপিটা পার ডে (জনপ্রতি দৈনিক লিটার)
এমডিজি	মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা)
এমআইসিএস	মাল্টিপল ইনডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে
এমআইএস	ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম
এমওইউ	মেমোরান্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (সমঝোতা স্মারক)
এমটিবিএফ	মিডিয়াম টার্ম বাজেট ফ্রেমওয়ার্ক (মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো)
এনজিও	নন-গভার্নমেন্ট অর্গানাইজেশন (বেসরকারি সংস্থা)
এনআইএলজি	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর লোকাল গভার্নমেন্ট
নিপোর্ট	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর পপুলেশন রিসার্স এ্যান্ড ট্রেনিং
এনপিডিএম	ন্যাশনাল প্ল্যান ফর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট
এনওসি	নো অবজেকশন সার্টিফিকেট
এনএসএস	ন্যাশনাল স্যানিটেশন স্ট্র্যাটেজি
ওডিএফ	ওপেন ডেফিকেশন ফ্রি
ওইসিডি (ওসেড)	অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ওএ্যান্ডএম	অপারেশন এ্যান্ড মেইনটেনেন্স (পরিচালনা ও সংরক্ষণ)
পিইডিপি	প্রাইমারী এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি)
পাইকম	প্রাইভেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার কমিটি
পিপিবি	পার্টস পার বিলিয়ন
পিপিপি	পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব)
পিআরএসপি	পোভার্টি রিডাকশন স্ট্র্যাটেজি পেপার (দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র)
পিএসইউ	পলিসি সাপোর্ট ইউনিট
পিএসএফ	পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (পুকুর পাড়ে বালির ফিল্টার)
পিডব্লিউএসএস	পৌরসভা ওয়াটার সাপ্লাই সেকশন
র‌্যামো	রিস্ক এ্যাসেসমেন্ট অব আর্সেনিক মিটিগেশন অপশনস্

আরসি	রিজিওনাল কাউন্সিল (আঞ্চলিক পরিষদ)
আরএ্যান্ডডি	রিসার্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (গবেষণা ও উন্নয়ন)
আরডিএ	রুরাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমি (গ্রাম উন্নয়ন একাডেমি)
আরএইচএস	রেইন-ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম (বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি)
সার্ক	সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন (দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা)
সাকোসান	সাউথ এশিয়ান কনফারেন্স অন স্যানিটেশন
এসডিএফ	সেক্টর ডেভেলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক
এসডিপি	সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম/প্ল্যান
শেওয়া-বি	স্যানিটেশন, হাইজিন এডুকেশন এ্যান্ড ওয়াটার সাপ্লাই ইন বাংলাদেশ
এসআইপি	সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান (খাত বিনিয়োগ পরিকল্পনা)
এসআইএস	সেক্টর ইনফরমেশন সিস্টেম (খাত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি)
এসএসটি	শ্যালো শ্রাউডেড টিউবওয়েল
সোয়াপ	সেক্টর ওয়াইড এ্যাপ্রোচ
টিএলসিসি	টাউন লেবেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি
টিপিপি	ট্রাইপারটাইট পার্টনারশীপ (ত্রি-পক্ষীয় অংশীদারিত্ব)
ইউডিডি	আরবান ডেভেলপমেন্ট ডাইরেক্টরেট (নগর উন্নয়ন পরিদপ্তর)
ইউএফডব্লিউ	আন-এ্যাকাউন্টেড ফর ওয়াটার (হিসাব বহির্ভূত পানি)
ইউএন	ইউনাইটেড নেশনস্ (জাতিসংঘ)
ইউএনডিপি	ইউনাইটেড নেশনস্ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি)
ইউএনএফপিএ	ইউনাইটেড নেশনস্ পপুলেশন ফান্ড (জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল)
ইউনিসেফ	ইউনাইটেড নেশনস্ চিলড্রেনস্ ফান্ড (জাতিসংঘ শিশু তহবিল)
ভিইআরসি (ভার্ক)	ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার
ভিআইপি	ভেন্টিলেটেড ইমপ্রুভড পিট (বায়ু-নির্গমনসহ উন্নত গর্ত পায়খানা)
ভিএসএসটি	ভেরি-শ্যালো শ্রাউডেড টিউবওয়েল
ওয়ারপো	ওয়াটার রিসোর্সেস প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন (পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা)
ওয়াসা	ওয়াটার সাপ্লাই এ্যান্ড স্যুয়ারেজ অথরিটি
ওয়াশ	ওয়াটার, স্যানিটেশন এ্যান্ড হাইজিন
ওয়াটসান	ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন
ডব্লিউএইচও	ওয়ার্ল্ড হেলথ্ অর্গানাইজেশন (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)
ওয়েডেক	ওয়াটার, ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার
ডব্লিউআরসি	ওয়াটার সাপ্লাই রেগুলেটরী কমিশন
ডব্লিউএসপি	ওয়াটার সেফটি প্ল্যান (পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা)/ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন প্রোগ্রাম
ডব্লিউএসএস	ওয়াটার সাপ্লাই এ্যান্ড স্যানিটেশন

অধ্যায় ১
পটভূমি

অধ্যায়টিতে বর্ণিত আছে সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনার (এসডিপি) পটভূমি। সংক্ষেপে বর্ণিত আছে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের বিদ্যমান প্রেক্ষিত এবং ইতিপূর্বে প্রণীত সেক্টর উন্নয়ন ফ্রেমওয়ার্ক, যেখানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেক্টর সংশ্লিষ্ট আইনি, নীতি ও কৌশল এবং পরিকল্পনা সংক্রান্ত দলিলসমূহ। পরবর্তীতে বর্ণিত হয়েছে সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনার (এসডিপি) উদ্দেশ্য ও কর্মপরিধি এবং এর পরিকল্পনা মেয়াদসমূহ। অতঃপর বর্ণনা করা হয়েছে পরিকল্পনাটি প্রণয়নের সাথে যুক্ত সহযোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে গৃহীত পন্থা ও পদ্ধতিসমূহ। অধ্যায়টির সমাপ্তি টানা হয়েছে পরিকল্পনা দলিলের একটি রূপরেখা সংযোজনের মাধ্যমে।

১.১ ভূমিকা

২০০৫ সনে বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য ১০ বছর মেয়াদি সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (এসডিপি ২০০৫) প্রণয়ন করে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-এর অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ। এসডিপি ২০০৫ এ সেক্টর সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা, কৌশল ও লক্ষ্যসমূহ বিশ্লেষণ এবং বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের উন্নয়নে একটি কর্ম-কাঠামো (ফ্রেমওয়ার্ক) প্রণীত হয়। বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ[১,২] পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য প্রণীত এসডিপি ২০০৫-কে পরিকল্পনা দলিল হিসেবে ব্যবহার করে। পরবর্তী সময়ে সরকার এই এসডিপি সংশোধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সংশোধিত এসডিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একটি পৃথক বিশ্লেষণ, স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারে (hygiene promotion) বিশেষ দৃষ্টি প্রদান এবং পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর চাহিদা অধিকতর গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে মত দেয়া হয়। এছাড়াও আলোচ্য এসডিপিতে উদ্ভূত নতুন উন্নয়ন ধারাসমূহ, যেমন : পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা (water safety plan), সেক্টর ওয়াইড এ্যাপ্রোচ (SWAp) এবং পরিবেশ সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মত বিষয়গুলো মূল্যায়ন ও অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্ব অনুভূত হয়।

তদানুযায়ী, স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (PSU/পিএসইউ) কর্তৃক পরবর্তী এসডিপি[৩] (সংশোধিত) প্রণয়নের উদ্যোগ গৃহীত হয়। এই সংশোধিত এসডিপি হবে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের কৌশলগত পরিকল্পনা দলিল। ১৫ বছর মেয়াদি পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন ২০১০-১১ অর্থবছরে[৪] শুরু হয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শেষ হবে।

---

[১] এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ২০০৯, সেক্টর সহায়তা কর্মসূচি মূল্যায়ন, সূত্র নম্বর: এসএপি: ব্যান ২০০৯-০২

[২] বাংলাদেশ সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী যেমন এডিবি, ডানিডা, জাপান সরকার, কোরীয় সরকার ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে সম্পাদিত অংশীদারিত্ব কাঠামো।

[৩] এসডিপি প্রণয়নের আর্থিক সহযোগিতা এসেছে ডানিডা থেকে, এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী ও এনজিওরা এতে কারিগরী সহায়তা প্রদান করেছেন।

[৪] অর্থবছর গণনা করা হয় জুলাই থেকে জুন মাস পর্যন্ত।

১.২ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

১.২.১ প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রোফাইল

বাংলাদেশ প্রায় ১৪৪,০০০ বর্গ-কিলোমিটার এলাকা ও ২০১০ সনের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ১৫০ মিলিয়ন (১৫ কোটি) জনসংখ্যা অধ্যুষিত পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ সাতটি বিভাগে বিভক্ত। বিভাগগুলো ৬৪টি জেলায় ও জেলাগুলো পুনরায় ৪৮২টি উপজেলায় বিভক্ত। উপজেলাগুলো আবার বিভক্ত সর্বমোট ৪,৪৯৮টি ইউনিয়নে। এটি বাংলাদেশে বিদ্যমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর। প্রশাসনিক কাঠামোতে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। তবে বর্তমানে কেবলমাত্র উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়েই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। নগর এলাকায় দুই ধরনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এগুলো হলো: সাতটি বৃহত্তর শহরের জন্য সিটি কর্পোরেশন এবং বড় থেকে মাঝারি শহরগুলোর জন্য পৌরসভা। দেশে বর্তমানে মোট ৮টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩০৮টি পৌরসভা বিদ্যমান। সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে দেশটির শাসনব্যবস্থা পরিচালিত এবং দেশে এক কক্ষবিশিষ্ট জাতীয় সংসদ রয়েছে। বর্তমানে সরকার পরিচালিত হচ্ছে মোট ৩৫টি মন্ত্রণালয় এবং এগুলোর অধীন ৭টি বিভাগ[৫]-এর মাধ্যমে।

নানাবিধ বাহ্যিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও দেশের স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। গত দশকে দেশটির জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল গড়ে ৫.৮ শতাংশ। মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় ২০০৯ সনে ৬২১ মার্কিন ডলারে পৌঁচেছে। দেশের অর্থনীতির দুটি সঞ্চালক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে তৈরি পোষাক ও বৈদেশিক শ্রম বাজার থেকে অর্জিত আয়। অর্জিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চেয়েও এখানকার সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের ধারা চোখে পড়ার মত। অনুকূল সরকারি নীতির কারণে বাংলাদেশে দ্রুত মানবিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে এবং যার ফলে তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়নের গতিধারা যথেষ্ট বেগবান হচ্ছে। ১৯৭৪ সনের ২.৯ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০০৯ সনে ১.২ শতাংশে নেমে এসেছে। দারিদ্র্যের প্রবণতাও লক্ষ্যনীয়ভাবে ক্রমহ্রাসমান। জাতীয়ভাবে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা ১৯৯০ সনের শুরুতে ছিল ৫৭ শতাংশ, যা ২০০০ সনে ৪৯ শতাংশ ও ২০০৫ সনে ৪০ শতাংশে[৬] নেমে এসেছে। ২০০৯ সনের প্রাক্কলন অনুযায়ী এই হার ৩১.১ থেকে ৩২.৫ শতাংশের মধ্যে। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার ১৯৯১ সনে ছিল প্রতি হাজারে (live birth) ১৫১ জন, যা ২০০৭ সনে হাজারপ্রতি ৬৫-তে নেমে এসেছে। একই সময়ে নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতিহাজারে (live birth) ৯৪ থেকে কমে ৫২-তে দাঁড়িয়েছে[৭]।

ব্যক্তিগত খানাপর্যায়ে আয় বাড়লেও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশা, নারী-পুরুষ ও অঞ্চলভেদে দারিদ্র্যের হারে তফাৎ রয়েই গেছে। ২০০৫ সনের হিসাব অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার নিম্নস্তরের ৪০ শতাংশ মানুষ, যাঁদেরকে দরিদ্র শ্রেণীভূক্ত করা হয়, তাঁরা মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ১৪.৪ শতাংশ ভোগ করে; অথচ উপরের স্তরের মাত্র ৫ শতাংশ মানুষ (যাঁদেরকে ধনী আখ্যায়িত করা হয়) ভোগ করে ২৭ শতাংশ আয়। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায়, হত-দরিদ্রদের অধিকাংশই নারী, কেননা তাঁরা আয়-বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে তেমন জড়িত নয়। দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যও বিদ্যমান, যেমনঃ দেশের পূর্বাঞ্চলের তুলনায় পশ্চিমাঞ্চলে দারিদ্র্যের প্রকোপ বেশি। তিনটি পশ্চিমাঞ্চলীয় বিভাগ, যেমনঃ খুলনা, বরিশাল ও রাজশাহীতে ২০০৫ সনের হিসাব অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার ছিল যথাক্রমে ৪৫.৭, ৫২.০, ৫২.২ শতাংশ; যখন দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় বিভাগ যেমনঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে এই হার ছিল তুলনামূলকভাবে কম, যথাক্রমে ৩২.০, ৩৪.০, ৩৩.৮ শতাংশ[৮]।

---

[৫] কয়েকটি মন্ত্রণালয় দুটি বা ততোধিক বিভাগে বিভক্ত, যার প্রত্যেকটির প্রধান একজন সচিব।

[৬] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), হাউজহোল্ড ইনকাম এ্যান্ড এক্সপেনডিচার সার্ভে ২০০৫ (২০০৫ সনের পরে আর কোন জাতীয় জরিপ কার্যক্রম গৃহীত হয় নাই)।

[৭] স্বাস্থ্যবার্তা ২০০৯, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS), স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

[৮] বাংলাদেশের অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র, জেনারেল ইকোনমিক ডিভিশন, পরিকল্পনা কমিশন, মার্চ ২০০৮

১.২.২ জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কাঠামো

সরকারের অর্থবছর হিসাব করা হয় জুলাই থেকে পরবর্তী জুন মাস পর্যন্ত এবং প্রত্যেক অর্থ বছরের জন্য একটি জাতীয় বাজেট প্রণীত হয়। জাতীয় বাজেটের দুটি অংশ থাকে, যেমন: ১) উন্নয়ন বাজেট, যার প্রতিফলন ঘটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) মাধ্যমে; এবং ২) প্রশাসনিক ও নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহে প্রণীত রাজস্ব বাজেট। বাংলাদেশ সরকার প্রচলিতভাবে পঞ্চ-বার্ষিকী জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। এভাবে কয়েকটি পঞ্চ-বার্ষিকী পর্যায় পেড়িয়ে এসে বর্তমানে সরকার তার ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০১১-১৫) প্রণয়ন করছে।

সরকারি ব্যয়ে অধিকতর দক্ষতা ও কার্যকারিতা আনতে ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে সরকার একটি মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) প্রবর্তন করে। এমটিবিএফ প্রক্রিয়ায় সম্পদ বরাদ্দে মন্ত্রণায়লগুলোর বিদ্যমান নীতিমালা ও অগ্রাধিকারসমূহ এবং অতঃপর সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থাগুলোর বরাদ্দকৃত সম্পদ কাজে লাগানোর নৈপূণ্যের মধ্যে একটি দৃশ্যমান যোগসূত্র স্থাপন করা হচ্ছে। এভাবে প্রতিবছর এমটিবিএফ প্রণীত হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে ত্রি-বার্ষিক বাজেটের একটি থোক বরাদ্দ (a three-year budget envelope) দেয়া হচ্ছে। বরাদ্দের প্রক্রিয়াটি ক্রমান্বয়ে পাঁচ বছরের জন্য করা হচ্ছে, যাতে তা সরকারের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হয়। বর্তমানে স্থানীয় সরকার বিভাগসহ সরকারের ৩৩টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় তাদের নিজস্ব বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করছে[৯]।

দারিদ্র্য বিমোচনকে প্রাধান্য দিয়ে ২০০৫-০৮ অর্থবছরের জন্য ***"সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন: দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন জাতীয় কৌশলপত্র"*** শিরোণামে দেশের প্রথম দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP-I) প্রণীত হয়। ***পরিবর্তনের পদক্ষেপ*** শিরোণামে পিআরএসপি-২ বা এনএসএপিআর-২ প্রণীত হয় ২০০৯-১১ অর্থবছরের জন্য।

দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার একটি দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প (Vision) গ্রহণ করেছে, যার প্রতিফলন দেখা যাবে বর্তমানে প্রণয়নাধীন দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০১০-২১)। প্রেক্ষিত পরিকল্পনাটিতে দেশের ভবিষ্যত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সংযোজিত হবে এবং ২০২১ সনের মধ্যে সেগুলো অর্জনের জন্য যাবতীয় কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আশা করা হচ্ছে, ২০২১ সনে অর্জিত প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সাফল্যের সাথে সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালিত হবে। ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী দুটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমেই সরকারের এই দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প বাস্তবায়িত হবে।

দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প বাস্তবায়নের নিরিখে সরকার পাঁচটি অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে: (ক) সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পরিপালন ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার মুখে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ; (খ) দুর্নীতি দমনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ; (গ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানী উৎপাদন; (ঘ) দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূরীকরণ; এবং (ঙ) সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প অর্জনে বিভিন্ন সেক্টরে ১২টি লক্ষ্য স্থিরকৃত হয়েছে। এগুলোর অন্যতম হলো "২০১৫ সনের মধ্যে দেশের সকল নাগরিকের জন্য আবাসন নিশ্চিতকরণ, ২০১১ সনের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ এবং ২০১৩ সনের মধ্যে প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের আওতায় নিয়ে আসা"। লক্ষ্যটির মধ্য দিয়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরকে সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডায় অগ্রাধিকারভূক্ত করার-ই ইঙ্গিত বহন করে। স্থিরকৃত পাঁচটি অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্র ও ১২টি লক্ষ্যগুচ্ছ জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে ও আসন্ন ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হচ্ছে।

জাতীয় পরিকল্পনা দলিলটিতে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও লক্ষ্যও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেমন: সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি), যেখানে আন্তর্জাতিকভাবে সমগ্র পৃথিবীর টেকসই নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশন সেবাবঞ্চিত বিদ্যমান জনসংখ্যাকে ২০১৫ সনের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে (এমডিজি ৭, লক্ষ্য ১০)।

---

[৯] অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো, অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১২-১৩; অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইট: www.mof.gov.bd

১.৩ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর

১.৩.১ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে প্রস্তুতকৃত "প্রোগ্রেস অন স্যানিটেশন এ্যান্ড ড্রিংকিং ওয়াটার ২০১০ আপডেট" প্রতিবেদনটিতে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজের চিত্র যাচাই করা হয়েছে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজের একটি একক সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়েছে প্রতিবেদনটিতে। প্রতিবেদনের সূত্র অনুযায়ী, বাংলাদেশসহ সাতটি দক্ষিণ-এশীয় দেশ, দক্ষিণ এশিয়া ও সমগ্র বিশ্বের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজের অবস্থা যথাক্রমে চিত্র ১.১ক ও ১.১খ তে প্রদর্শিত হলো।

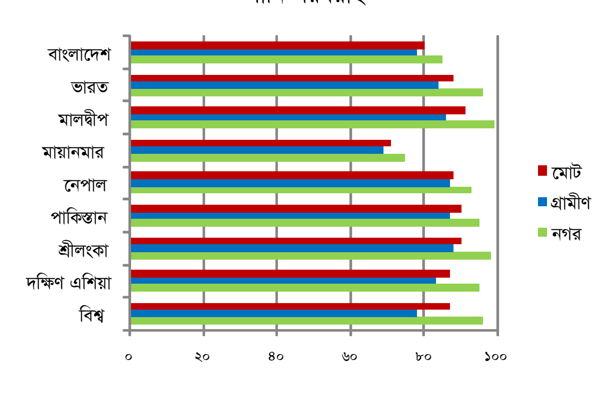

চিত্র ১.১ (ক): বাংলাদেশ, আঞ্চলিক দেশসমূহ, দক্ষিণ-এশিয়া ও বৈশ্বিক পানি সরবরাহ কভারেজ

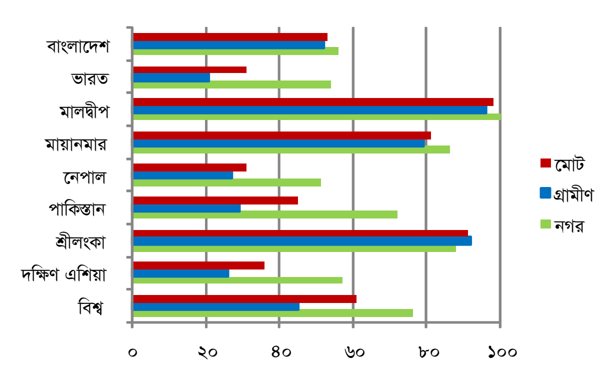

চিত্র ১.১ (খ): বাংলাদেশ, আঞ্চলিক দেশসমূহ, দক্ষিণ-এশিয়া ও বৈশ্বিক স্যানিটেশন কভারেজ

সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ প্রণীত জেএমপি, ২০০৮

বাংলাদেশের পানি সরবরাহ কভারেজ ৮০%, যা বৈশ্বিক ও দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক কভারেজের (উভয়ই ৮৭%) সাথে তুলনীয় কিন্তু এককভাবে শ্রীলংকা (৯০%), পাকিস্তান (৯০%) ও ভারতের (৮৮%) কভারেজের তুলনায় কম। স্যানিটেশনে বাংলাদেশের কভারেজ ৫৩%, যা বৈশ্বিক (৬১%) ও দক্ষিণ এশীয় (৩৬%) কভারেজের মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে, তবে এককভাবে শ্রীলংকার (৯১%) কভারেজের চেয়ে কম এবং পাকিস্তান (৪৫%) ও ভারতের (৩১%) চেয়ে বেশি। দেশীয় মানদণ্ডে বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজ পুনরায় অনুচ্ছেদ ২-এ বিশ্লেষিত আছে।

১.৩.২ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্য

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবায় অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ একটি নৈতিক ও মূল্যবোধ-বিষয়ক দায়িত্বশীলতা, যা পৃথিবীব্যাপী মানবগোষ্ঠীর প্রচলিত সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে উৎসরিত। মানবিক মূল্যবোধ প্রসার কার্যক্রমে বিশ্ব পানি পরিষদ (World Water Council) যথার্থই বলে যে সামাজিক মর্যাদা, ন্যায্যতা, আবেগ ও সংহতি এমন সব মূল্যবোধ যা পৃথিবীব্যাপী সকলের মধ্যে বিনিময় হয়ে থাকে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীতে পানি ও স্যানিটেশন সেবা প্রদান এসকল মূল্যবোধ প্রসারে ব্যাপকভাবে অবদান রাখে। জাতিসংঘের ৬৪তম সাধারণ অধিবেশনে (জুলাই ২৮, ২০১০) গৃহীত ঘোষণায় নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন খাবার পানিকে **মানবাধিকার** হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার জন্য অপরিহার্য। সে কারণেই সকলের জন্য নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও আর্থিকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ খাবার পানি ও স্যানিটেশন সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় অর্থসম্পদের যোগান, সামর্থ্য বৃদ্ধি, প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতি জাতিসংঘের তরফ থেকে উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা ১৯৯৮তে পানি একটি সামাজিক ও একই সাথে অর্থনৈতিক পণ্য হিসেবে স্বীকৃত। পানি ও স্যানিটেশনের অর্থনৈতিক সুফল হিসেবে সময় সাশ্রয়সহ স্বাস্থ্যসেবা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয় সংকোচনকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। নিম্নে প্রদত্ত সারণি ১.১ এ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার অর্থনৈতিক সুফলের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপিত হলো।

সারণি ১.১: পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমের অর্থনৈতিক সুফল

সুফলসমূহ	বিশদ বর্ণনা
রোগ-ভোগ এড়ানোর প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক সুফল	• পানি ও স্যানিটেশনঘটিত রোগ চিকিৎসার ব্যয়হ্রাস • চিকিৎসার কারণে ভ্রমণজনিত ব্যয়হ্রাস • চিকিৎসা গ্রহণের সময় সাশ্রয়
স্বাস্থ্যগত উন্নতির সাথে সম্পর্কিত পরোক্ষ অর্থনৈতিক সুফল	• ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তির নিজের কাজের বা শিশুর স্কুলের সাশ্রয়কৃত সময় বা দিনের মূল্য • রোগীর অভিভাবক বা পরিচর্যাকারীর সাশ্রয়কৃত সময়ের মূল্য • একটি জীবন রক্ষার সম্ভাব্য অর্থনৈতিক অবদানের মূল্য
অ-স্বাস্থ্যগত সুফল	• সুবিধা - পানি সংগ্রহ বা স্যানিটেশন ব্যবস্থা ব্যবহারে সাশ্রয়কৃত সময় • বাড়িতে শ্রম সাশ্রয় পদ্ধতির উপস্থিতি • অধিকতর ব্যয়বহুল পানির উৎস থেকে সহজ সমাধানে উত্তরণ • নিজ সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি • ক্ষুদ্র ব্যবসায় উন্নয়ন, মৎসচাষ ও অন্যান্য খাতে ব্যবসা বৃদ্ধি যেমন: পর্যটন

সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০০৬। মানবিক উন্নয়ন প্রতিবেদন: স্বল্পব্যয়ী পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রমের অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত প্রভাব বিষয়ে সাময়িক পত্র।

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায়, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের অর্থনৈতিক সুফল অনেক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষা (২০০৬) অনুযায়ী পানি ও স্যানিটেশনের এমডিজি ও সার্বজনীন লক্ষ্য (১০০%) অর্জনের দিক থেকে বাংলাদেশ ও বিশ্বের অন্যান্য ৬টি অঞ্চলের লাভ-ক্ষতির অনুমিত অনুপাত এমন যে, প্রতি ১ ডলার বিনিয়োগের বিপরীতে লাভের পরিমান দাঁড়াবে ৫ থেকে ৩৫ ডলারের মধ্যে (সারণি ১.২)। সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশের জন্য, এমডিজি লক্ষ্য অর্জনে পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে প্রতি ১ ডলার বিনিয়োগের বিপরীতে প্রাক্কলিত লাভের পরিমান হবে ৫.৪ ডলার। সার্বজনীন কভারেজ অর্জন বিবেচনায় লাভের পরিমানটি দাঁড়াবে ৫.৬ ডলারে। অর্থাৎ, বাংলাদেশে পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে বিনিয়োগ থেকে লাভের পরিমান প্রায় পাঁচগুণ হবে। সারণিতে প্রদত্ত উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, লাভ-ক্ষতির হিসাবটি শুধুমাত্র পানি ও স্যানিটেশনের মধ্যে করা হলে পানির তুলনায় স্যানিটেশনের লাভ বেশি।

সারণি ১.২: পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজ অর্জনের লাভ-ক্ষতির অনুপাত

দেশ/অঞ্চল	এমডিজি কভারেজ			সার্বজনীন কভারেজ		
	পানি	স্যানিটেশন	পানি ও স্যানিটেশন	পানি	স্যানিটেশন	পানি ও স্যানিটেশন
বাংলাদেশ	**৩.৫**	**৬.৪**	**৫.৪**	**৩.৭**	**৬.৩**	**৫.৬**
দক্ষিণ এশিয়া	৩.৫	৬.৯	৬.৬	৩.৯	৬.৬	৬.৬
পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অঞ্চল	৬.৯	১২.৫	১০.১	৬.৬	১৩.৮	১২.২
সাব-সাহারান আফ্রিকা	২.৮	৬.৬	৫.৭	৩.৬	৬.৫	৫.৭
আরব দেশসমূহ	৬.১	৫.৩	৫.৪	৫.৯	১২.৭	১১.৩
লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চল	৮.১	৩৭.৮	৩৫.৯	১৭.২	৩৯.২	৩৬.৫
পূর্ব ইউরোপ ও কমনওয়েল্থভুক্ত সার্বভৌম দেশসমূহ (সিআইএস)	৮.৩	২৭.৭	১৮.৯	৮.৯	২৯.৯	২৭.৪
ছয় অঞ্চলের গড়	**৪.৪**	**৯.১**	**৮.১**	**৫.৮**	**১১.২**	**১০.৩**

বিশ্বব্যাংকের ২০০৬ সনের এনভায়রনমেন্ট কান্ট্রি এ্যাসিস্টেন্স স্ট্র্যাটেজির ভাষ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে প্রতি বছর প্রায় ৮০ কোটি ডলারের (অনুমিত) ক্ষতি হচ্ছে। হিসাবটি 'ডালি' (DALY: Disability-Adjusted Life-Year) পদ্ধতিতে করা হয়েছে। এতে কেবলমাত্র স্বাস্থ্যগত (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) সুফল বা লাভকে (health benefit) হিসেবে আনা হয়েছে। অন্যদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (২০০৬) বলছে, বাংলাদেশে ১০০ ভাগ কভারেজের জন্য আনুমানিক ৬৬ কোটি ২০ লক্ষ ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন। কিন্তু এ বিনিয়োগ হতে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অ-স্বাস্থ্যগত (non-health benefit) সুফল পাওয়া যাবে প্রায় ৩৬৮ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার। বাংলাদেশে অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক প্রভাব বিষয়ে ২০১০ সনে ডব্লিউএসপি-বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষায়[১০] বলা হয়েছে, কেবলমাত্র অপর্যাপ্ত স্যানিটেশনের কারণে সৃষ্ট বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রভাব বা ক্ষতির পরিমাণ (economic impact of inadequate sanitation) প্রায় ২৯,৫৫০ কোটি টাকার সমান। ডলারে এর পরিমাণ ৪২৩ কোটি। এটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির (GDP) ৬.৩ শতাংশ।

১.৩.৩ সেক্টর সহযোগীবৃন্দ (Stakeholders)

প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে বিভিন্ন ধরনের সহযোগী (স্টেকহোল্ডার) সম্পৃক্ত। সেক্টরটির প্রধান প্রধান সহযোগী হলো:

- **সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থা:** সরকার সেক্টরের প্রধান সহযোগী বা স্টেকহোল্ডার। সেক্টরের পরিকল্পনা প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে সরকার সম্পৃক্ত। সরকার বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার (institutional set-up) মাধ্যমে সেক্টর পরিচালনা করে। যেমন: কেন্দ্রীয় পর্যায়ে (মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থা), বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) ও আধা-সরকারি সংস্থা (উদাহরণস্বরূপ, ওয়াসা)। জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা অনুযায়ী সেক্টরের মুখ্য কর্তৃত্বপরায়ণ সংস্থা হলো ডিপিএইচই;

- **উন্নয়ন সহযোগী:** কারিগরী ও আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ সেক্টরে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। সংশ্লিষ্ট সরকারি বা সংগঠনের নীতিমালা অনুযায়ী তাদের সহযোগিতার পরিধি নির্ধারিত। এরূপ সহযোগিতা গ্রহিতা দেশের জাতীয় নীতিমালা ও অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। উন্নয়ন সহযোগীরা তাদের সহযোগিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থার মাধ্যমেই দিয়ে থাকে। তবে এনজিওদেরকে সরাসরি সহযোগিতা প্রদানের বিষয়টিও এখন সাধারণ রেওয়াজে পরিণত;

- **বেসরকারি সংগঠন বা সংস্থা (NGO):** স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন তৃণমূল এলাকায় এনজিওরা কাজ করে। জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে উদ্বুদ্ধকরণ ও শিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পকে সহযোগিতা দিচ্ছে এনজিওরা । এদের অনেকেই আবার সরাসরি কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথেও সম্পৃক্ত;

- **জনগোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠন (CBO):** স্ব-নির্বাচিত কমিটি ও দলের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠনসমূহ গ্রামীণ হস্তচালিত নলকূপ বা অন্যান্য পানির উৎস পরিচালনা ও সংরক্ষণ করে। ক্রমান্বয়ে নগর এলাকায় পানি সরবরাহ পদ্ধতি এবং বস্তিতে কমিউনিটি ল্যাট্রিন পরিচালনা ও সংরক্ষণের অধিকতর দায়িত্বও গ্রহণ করছে তারা। সিবিওগুলো যেসকল সেবাসুবিধার ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সেগুলো সাধারণত সরকার বা এনজিও কর্তৃক প্রদত্ত;

---

[১০] ইকোনমিক ইমপ্যাক্টস্ অব ইনএডিকুয়েট স্যানিটেশন ইন বাংলাদেশ (খসড়া), ড. আবুল বারাকাত, জুলাই ২০১০।

- **বেসরকারি খাত ও ব্যক্তি:** বেসরকারি ঠিকাদার (contractors), সরবরাহকারী, উৎপাদনকারী, হার্ডওয়ার দোকানি ও পরামর্শকের (consultants) মত অনেক বেসরকারি সত্তা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের উন্নয়নের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। উল্লেখ্য যে, দেশের গ্রামীণ ও নগর এলাকার ব্যক্তিগত বসতবাড়ির নিজস্ব উদ্যোগে ইতোমধ্যে বিপুলসংখ্যক হস্তচালিত নলকূপ ও পায়খানা স্থাপিত হয়েছে (আরও বিস্তারিত দেখুন অনুচ্ছেদ ৩.৯ পিপিপি বিষয়ে)। নলকূপগুলো হার্ডওয়ার দোকান থেকে কেনা এবং বেসরকারি ড্রিলিং কন্ট্রাক্টর কর্তৃক স্থাপিত হয়। পায়খানার সরঞ্জাম কেনা হয় ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের নিকট থেকে এবং স্থাপিত হয় নিজেদের উদ্যোগেই অথবা শ্রমিক নিয়োজিত করে; এবং

- **অন্যান্য:** অন্যান্য সংগঠন ও ব্যক্তিগণ, যেমন: শিক্ষামূলক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম, নির্মাণ ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (company) এবং সেক্টর পেশাজীবীগণ (sector professionals) প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে দেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের উন্নয়ন ও পরিচালনায় সম্পৃক্ত।

১.৩.৪ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বিগত প্রায় ১৫০ বছরের পথ পরিক্রমায় গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, যার সূত্রপাত ১৮৮৫ সনের বেঙ্গল লোকাল সেল্ফ-গভর্নমেন্ট আইন (Bengal Local Self-government Act) পাসের মাধ্যমে। আইনটির মাধ্যমে স্থানীয় রাস্তা-ঘাট, জনস্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব দিয়ে প্রথম **ইউনিয়ন কমিটি** গঠিত হয় এবং কমিটিগুলোকে স্থানীয়ভাবে তহবিল গঠনের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে শহর এলাকায় ১৮৬৩ সন থেকে জনস্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছে মিউনিসিপালিটিগুলো। এরপর নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের দায়িত্বার্পন করে ১৯৩৫ সনে প্রতিষ্ঠা করা হয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সনে এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে সরকার প্রথমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতিগুলোর পুনর্বাসনে গুরুত্বারোপ এবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে ডিপিএইচই'র মাধ্যমে। তখন থেকেই মূলতঃ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর দ্রুত উন্নতির পথে চলতে শুরু করে এবং এর কার্যক্রমের সাথে মানুষের অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। বিদ্যমান জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সার-সংক্ষেপ (অনুচ্ছেদ ২ ও ৫ এ বিস্তারিত বর্ণিত আছে) নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-এর (MoLGRD&C) অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ (LGD) জাতীয় পর্যায়ে সেক্টরের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। স্থানীয় সরকার বিভাগে-এর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) এবং পানি সরবরাহ ও স্যুয়ারেজ কর্তৃপক্ষ (WASA) কাজ করে। ডিপিএইচই গ্রামীণ ও ওয়াসার আওতা-বহির্ভূত নগর এলাকায় সরকারি খাতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। ডিপিএইচই'র বাইরেও স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর অধীনে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ হিসেবে নগর এলাকায় পানি সরবরাহ ও ড্রেইনেজ উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে। জাতীয় পর্যায়ে সেক্টর সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে, যেমন: সরকারি সংস্থা, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয় করে জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরাম। ফোরামটি স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ পদাধিকার বলে ফোরামের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

গ্রামীণ এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর। স্থানীয় পর্যায়ে ডিপিএইচই, এনজিও ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব হচ্ছে উপজেলা এবং ইউনিয়ন ওয়াটসান কমিটির। জেলা পর্যায়ে বর্তমানে কোন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা (জেলা পরিষদ) কার্যকর নেই।

নগর এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব মূলত: ডিপিএইচই'র। তবে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলো পর্যায়ক্রমে পানি সরবরাহ পদ্ধতি পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনায় অধিকহারে সম্পৃক্ত হচ্ছে। ১৯৬৩ সনে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক প্রতিষ্ঠান (special purpose institutions) হিসেবে পানি সরবরাহ, স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা ও ড্রেইনেজ সেবা প্রদানের দায়িত্ব দিয়ে ওয়াসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। খুলনা ওয়াসা প্রতিষ্ঠা করা হয় ২০০৮ সনে। সরকার সম্প্রতি রাজশাহী ওয়াসা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে। নতুন ঘোষিত ওয়াসার সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল চাহিদা চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়ায় আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে ভিন্ন। এখানে ডিপিএইচইসহ সরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকা অধ্যায় ৩-এ বিস্তারিত বর্ণিত আছে।

১.৪ সেক্টর উন্নয়ন কাঠামো

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিকল্পনা, সমন্বয় ও বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের। সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করবে সেক্টর উন্নয়ন কাঠামোর (এসডিএফ) অধীনে, যার ভিত্তি হবে সেক্টর-সংশ্লিষ্ট আইনি দলিলপত্র, নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ[১১]। বর্তমান ও প্রত্যাশিত ভবিষ্যত আইনি কাঠামো, নীতিমালা, কৌশলাদি ও পরিকল্পনা সমন্বয়ে গঠিত কাঠামোটির একটি স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম চিত্র ১.২ এ প্রদর্শিত হলো। প্রত্যাশা করা হচ্ছে, সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে আইনি দলিল, নীতিমালা ও কৌশলসমূহ সুসমন্বিত ও সাযুজ্যপূর্ণ হবে।

[১১] সেক্টর উন্নয়ন কাঠামোটি (এসডিএফ) প্রণীত হয় ২০০৪ সনে, যেখানে শুধুমাত্র জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা ১৯৯৮ বিশ্লেষিত হয় এবং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের একটি কাঠামো সুপারিশ করা হয়। উপরোল্লিখিত সেক্টর রূপরেখায় সমগ্র সেক্টরটিকেই বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে, সাথে সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এসডিএফ ২০০৪ এর সুপারিশমালা এবং সংশ্লিষ্ট আইনি দলিলপত্র, অন্যান্য নীতিমালা ও কৌশলাদি যার সবগুলিই হয় সেক্টর নির্দিষ্ট, না হয় সেক্টরের সাথে সম্পর্কিত।

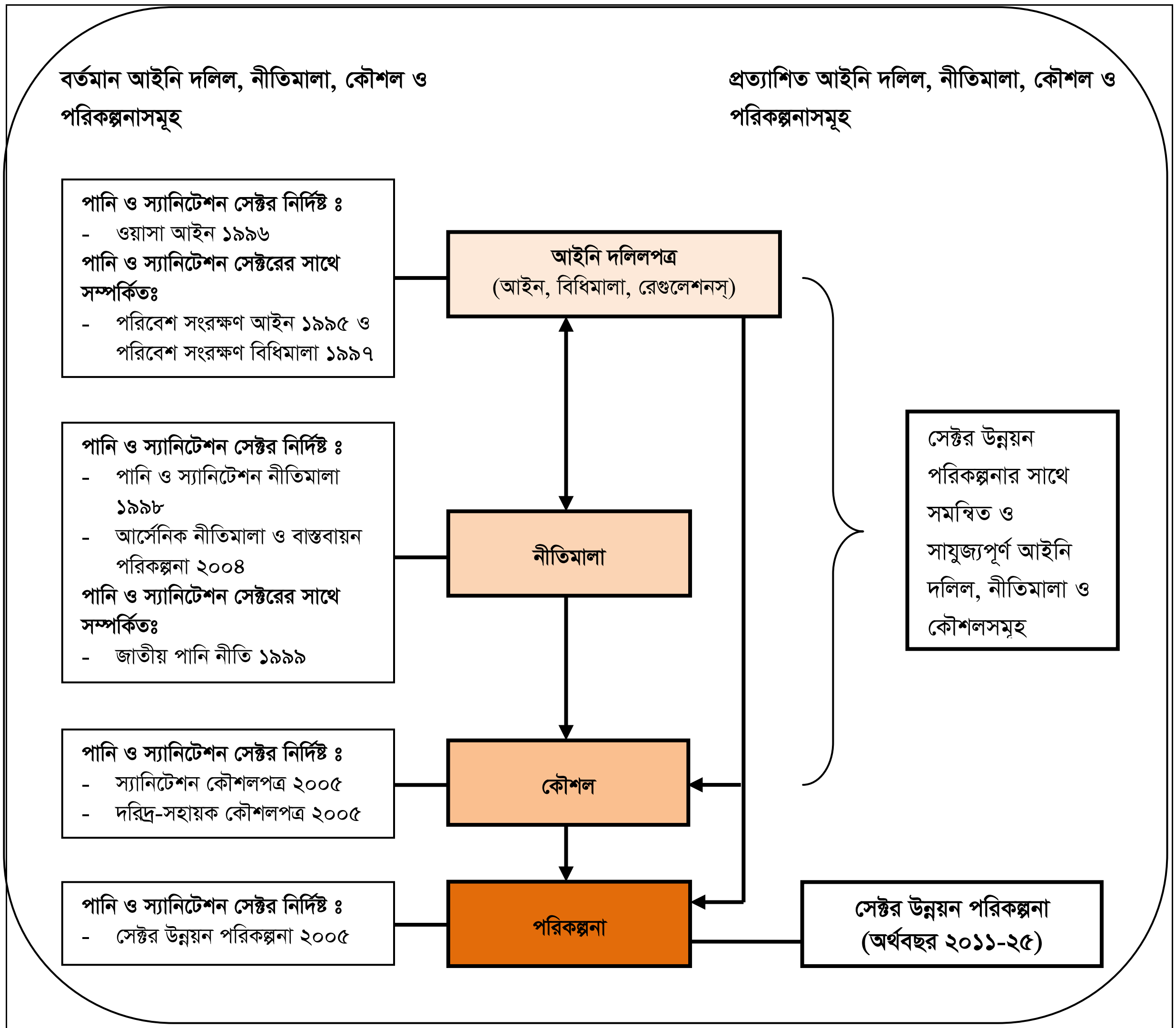

চিত্র ১.২: সেক্টর উন্নয়ন কাঠামোর স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম যেটির আওতায় সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে

১.৪.১ আইনি দলিলপত্র (legal instruments)

অনেকগুলো আইন (Acts), অধ্যাদেশ (Ordinances) ও বিধিমালা (Rules) সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের আইনি দলিলপত্র (বা হাতিয়ার)। এসকল দলিলপত্রে নির্ধারিত আছে সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইনি দলিলপত্র সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচিত হলো:

- পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭-এ সরবরাহকৃত খাবার পানির মান ও জলাশয়ে বর্জ্য অপসারণের শর্তাবলী নির্ধারিত আছে;
- ওয়াসা আইন ১৯৯৬ দ্বারা পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বসহ ওয়াসার ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব নির্ধারিত; এবং
- স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯-এ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়সহ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ) কাজ ও দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিদ্যমান আইনের নবায়ন ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য নতুন আইন, বিধিমালা ও রেগুলেশনসহ আইনি দলিলপত্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা অধ্যায় ৪ এ বর্ণনা করা হয়েছে।

১.৪.২ নীতিমালা ও কৌশলপত্রসমূহ

নিম্নোক্ত নীতিমালা, কৌশলপত্র ও অন্যান্য দলিলাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের কার্যাবলী পরিচালিত:

সুনির্দিষ্টভাবে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য

- জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা ১৯৯৮;
- জাতীয় আর্সেনিক নিরসন নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (NAMIP) ২০০৪;
- জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপ্রত্র ২০০৫;
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র-সহায়ক কৌশলপত্র ২০০৫; এবং
- বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য জাতীয় সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি ২০০৫ (SDP 2005)।

পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা সেক্টর-নির্দিষ্ট, কিন্তু পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের সাথে সম্পর্কিত

- জাতীয় পানি নীতি (NWP) ১৯৯৯; এবং
- জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NWMP) ২০০৪।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের সাথে পারস্পরিক সেক্টর সম্পর্কিত

- জাতীয় দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র– ২ (সংশোধিত), ২০০৯-১১ অর্থবছরের জন্য (NSAPR II or PRSP-II), ২০০৯;
- ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০১১-১৫);
- প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১);
- পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭;
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্ম পরিকল্পনা ২০০৯; এবং
- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (PPP) মাধ্যমে উদ্দীপ্ত বিনিয়োগ উদ্যোগ (invigorating investment initiative), জুন ২০০৯ (অর্থ মন্ত্রণালয়ের অবস্থান পত্র)।

অন্যান্য আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার যেমন সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার লক্ষ্য ৭, উদ্দেশ্য ১০ বাস্তবায়নেও বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ, যা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের সাথে সম্পর্কিত (অনুচ্ছেদ ১.২.২) ।

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ ও জাতীয় পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০৪-এ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সাতটি সেক্টরের প্রতি পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার বৃহত্তর দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতকৃত বাংলাদেশ পানি আইনের খসড়াটি বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা ১৯৯৮ হলো পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের মূল নীতি-নির্দেশনা। নীতিমালাটির লক্ষ্য হলো - বিদ্যমান গতানুগতিক সেবাব্যবস্থায় একটি ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন ও সেক্টরের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা। এতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে সেবাব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে সেবা পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পদ্ধতি পরিচালনা ও সংরক্ষণে

ব্যবহারকারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ওপর। নীতিমালাটিতে স্বীকার করা হয়েছে সেবাপদ্ধতির উন্নয়ন ও সেবাদান ব্যবস্থায় এনজিও ও বেসরকারি খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকেও। তবে কীভাবে তারা সেবাদান ব্যবস্থার মানদণ্ড বজায় রাখবে, তা নিশ্চিত করা হয়নি। সরকার ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থা পরিচালিত জাতীয় স্যানিটেশন প্রচারাভিযানকে দিক-নির্দেশনা প্রদান ও সমন্বয়ের জন্য ২০০৫ প্রণীত হয় জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্র। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের দরিদ্র-সহায়ক কৌশলপত্র ২০০৫ প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র গ্রাহকদের জন্য একটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রতিষ্ঠা করা।

সময়ের পথপরিক্রমায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে নতুন নতুন সমস্যা চিহ্নিত হচ্ছে। সমস্যাগুলোর সমাধানে এখন সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত নীতিমালা, কৌশলাদি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ, ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক সংক্রমণের ব্যাপক সমস্যা সমাধানকল্পে ২০০৪ সনে প্রণীত হয় জাতীয় আর্সেনিক নিরসন বাস্তবায়ন পরিকল্পনা। সেখানে সুপারিশ করা হয়েছে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরসহ কৃষি ও স্বাস্থ্য সেক্টরের আর্সেনিক সমস্যা সমাধানে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ। বর্তমানে আর্সেনিক বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যা ও সেগুলো নিরসনকল্পে নতুন জ্ঞান সংযোজন করে পরিকল্পনাটির সংশোধিত হচ্ছে এবং আশা করা হচ্ছে, শীঘ্রই সংশোধিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় সেগুলোর প্রতিফলন দেখা যাবে। অন্যান্য প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার ব্যয়-ভাগাভাগি ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারের জন্য জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বর্তমানে উভয় কৌশলপত্রই স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে প্রণয়নাধীন আছে।

সম্প্রতি প্রণীত কিছু কিছু জাতীয় পরিকল্পনা দলিলে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের গুরুত্ব প্রতিভাত হচ্ছে। এসকল দলিলেই দেশের উন্নয়নের দিক-নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত আছে। সংশোধিত জাতীয় দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (এনএসএপিআর-২), ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় সরকার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা কৌশলপত্র ও কর্ম পরিকল্পনা ২০০৯ তেও পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাসুবিধা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত। অর্থ মন্ত্রণালয়ের পিপিপি বিষয়ক অবস্থানপত্র ২০০৯-এ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পিপিপি সহায়তা প্রাপ্তিতে সরকারের দিক থেকে প্রাকযোগ্য বিবেচিত হচ্ছে সেক্টরটি।

এসকল নীতিমালা, কৌশলাদি ও পরিকল্পনার পুনঃপর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনার (এসডিপি) সাথে এগুলোর সাযুজ্যকরণ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা অধ্যায় ৪-এ সংযোজিত আছে।

১.৫ সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের সকল কার্যক্রম পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের একটি কর্ম-কাঠামো (framework) প্রণয়নই এসডিপি'র মূল উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য অনুযায়ী, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সকল জাতীয় ও সেক্টর নীতিমালা, কৌশলপত্রসমূহ এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনার (এসডিপি) সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

একটি কৌশলগত পরিকল্পনা দলিল হিসেবে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের উদ্ভূত সমকালীন ও ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরা হয়েছে এতে। এসডিপিতে সেক্টরের উন্নয়নের জন্য একটি পথ-নির্দেশনা (road map) ও তৎ-সম্পর্কিত সেক্টর বিনিয়োগ পরিকল্পনাও থাকছে। একটি সেক্টর উন্নয়ন কাঠামোর (SDF) অধীনে এগুলো বাস্তবায়িত হবে। কাঠামোটির একটি স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম (schematic diagram) চিত্র ১.২-এ প্রদর্শিত হলো। এসডিপিতে বিদ্যমান আইনি দলিলপত্র, নীতিমালা ও কৌশলাদি যাচাইপূর্বক বিশ্লেষিত হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত শুন্যতা পূরণে যথাযথ কর্ম-নির্দেশনা সংযোজিত আছে।

১.৬ সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মপরিধি (Scope)

বাংলাদেশের "উন্নয়ন খাতসমূহকে" বিভিন্ন সংস্থা, পেশাজীবী ও শিক্ষাবিদগণ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, পানি সরবরাহ সার্বিকভাবে পানিসম্পদ খাতের একটি উপখাত, স্যানিটেশন পরিবেশ খাতের একটি উপখাত এবং স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার বা হাইজিন প্রমোশন স্বাস্থ্য খাতের একটি উপখাত হিসেবে বিবেচিত। তবে জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা ১৯৯৮ অনুযায়ী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনকে একটি পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ খাত হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। জাতীয় নীতিমালার বিবেচনামতেই এসডিপিতে দেশের নগর ও গ্রামীণ এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করেই পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতের উপাদানগুলো বিশ্লেষিত হয়েছে।

স্যানিটেশনের কর্মপরিধি নির্ধারিত হয়েছে অনেকগুলো কর্মকাণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেগুলো সাধারণভাবে পরিবেশগত স্যানিটেশন হিসেবে গণ্য (বক্স ১.১ দেখুন)। স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার সকল ধরণের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমের কার্যকারিতা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণের অন্যতম মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত। যদিও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারের বিষয়টি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন উভয়ের সাথেই পরস্পর-সম্পর্কিত, এসডিপিতে এটি উপস্থাপিত হয়েছে স্যানিটেশনের সাথে যুক্ত করে। এসডিপিতে কতিপয় সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়েছে, যেগুলো মূলতঃ

বক্স ১.১: সেক্টর ও সেক্টরের কতিপয় মৌলিক উপাদানের সংজ্ঞা

নিরাপদ পানি সরবরাহ *বলতে ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি উত্তোলন ও বৃষ্টির পানি সংগ্রহ; তৎপরবর্তী পরিশোধন, সংরক্ষণ, সঞ্চালন ও গৃহস্থালীতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সরবরাহকরণকে বুঝানো হয়েছে।*

স্যানিটেশন *বলতে মনুষ্য পয়ঃবর্জ্য অপসারণ, নর্দমা ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে বুঝানো হয়েছে (প্রচলিত অর্থে যাকে বলা হয়* ***পরিবেশগত স্যানিটেশন****)।* ***স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার (হাইজিন প্রোমোশন)*** *যদিও জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা ১৯৯৮ তে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ নেই, বিষয়টি স্যানিটেশনের সাথে অন্তর্ভুক্ত আছে।*

হাইজিন বা স্বাস্থ্যাভ্যাস *অর্থ হলো অসুস্থতা বা রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধকল্পে কোন একজন ব্যক্তির নিজেকে বা তার আশপাশের অন্যদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।* ***স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার*** *বলতে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ পরিবর্তনের একটি ইতিবাচক প্রক্রিয়া বা পন্থাকে বুঝানো হয়েছে। (জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা ১৯৯৮ তে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, তবে এসডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)।*

সেক্টর *কথাটির মাধ্যমে খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরকে বুঝানো হয়েছে।*

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা ১৯৯৮-এর ভিত্তিতেই নিরূপিত। সংজ্ঞাগুলো নিচের বক্স ১.১ এ সন্নিবেশিত আছে।

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা ১৯৯৮ থেকে কেবলমাত্র একটি উপাদানের সংজ্ঞাই এখানে অসংযোজিত রয়েছে, যেটি হলো কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। কেননা, নগর এলাকার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি পৃথক পরিকল্পনা-নির্দেশনা বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রণয়নাধীন[১২] রয়েছে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে খাত পরিকল্পনাটি প্রণয়ণের কাজ শেষ হওয়া মাত্রই স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক এসডিপি বাস্তবায়নের সাথে তা সুসমন্বিতকরণ করা হবে।

[১২] কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল ও এ বিষয়ে একটি খসড়া আইন বর্তমানে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণয়নাধীন রয়েছে।

১.৭ সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনার মেয়াদসমূহ

তিন-পর্যায়ের পরিকল্পনা পন্থা

সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনাটি (এসডিপি) ১৫ বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে, যার শুরু হবে ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে। এসডিপি বাস্তবায়নের সময়টি তিনটি পরিকল্পনা মেয়াদ, যথা: ১৫ বছরব্যাপী দীর্ঘমেয়াদ, ১০ বছরব্যাপী মধ্যমেয়াদ ও ৫ বছরব্যাপী স্বল্পমেয়াদে বিভক্ত হবে। এসডিপির পরিকল্পনা মেয়াদসমূহ সরকারের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এটি হবে একটি পরিবর্তশীল বা আবর্তক দলিল, যা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পুনঃপর্যালোচিত ও সংশোধিত হবে।

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহ, যেসকল কর্মসূচি চলমান বা বাস্তবায়নাধীন, ইতোমধ্যে অনুমোদিত বা অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এসকল কর্মসূচি ও প্রকল্পের অর্থায়ন অনুমোদিত থাকতে হবে অথবা স্বল্পমেয়াদেই এগুলোর অর্থায়ন প্রক্রিয়া অনুমোদিত হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকতে হবে।

মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে পরবর্তী পর্যায়ের অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প ও কর্মসূচি। স্ব-স্ব প্রকল্প বা কর্মসূচির সাথে প্রাক্কলিত বাজেটও থাকবে। প্রথম পাঁচবছর মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রণীত মধ্যমেয়াদটি নতুন স্বল্পমেয়াদ হিসেবে বিবেচিত হবে, যার সাথে যুক্ত থাকবে বিস্তারিত কর্মসূচি ও প্রকল্প পরিকল্পনা ও অর্থায়ন নিশ্চয়তা।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণীত হবে সরকারের রূপকল্পকে ধারণ করে, যেখানে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত থাকবে সম্ভাব্য সেক্টর অর্থায়ন, প্রত্যাশিত পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পদ্ধতি পরিচালনা ও সংরক্ষণ (ওএ্যান্ডএম) সামর্থ্যের ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদ শেষে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরটির উন্নয়ন কী পর্যায়ে থাকবে।

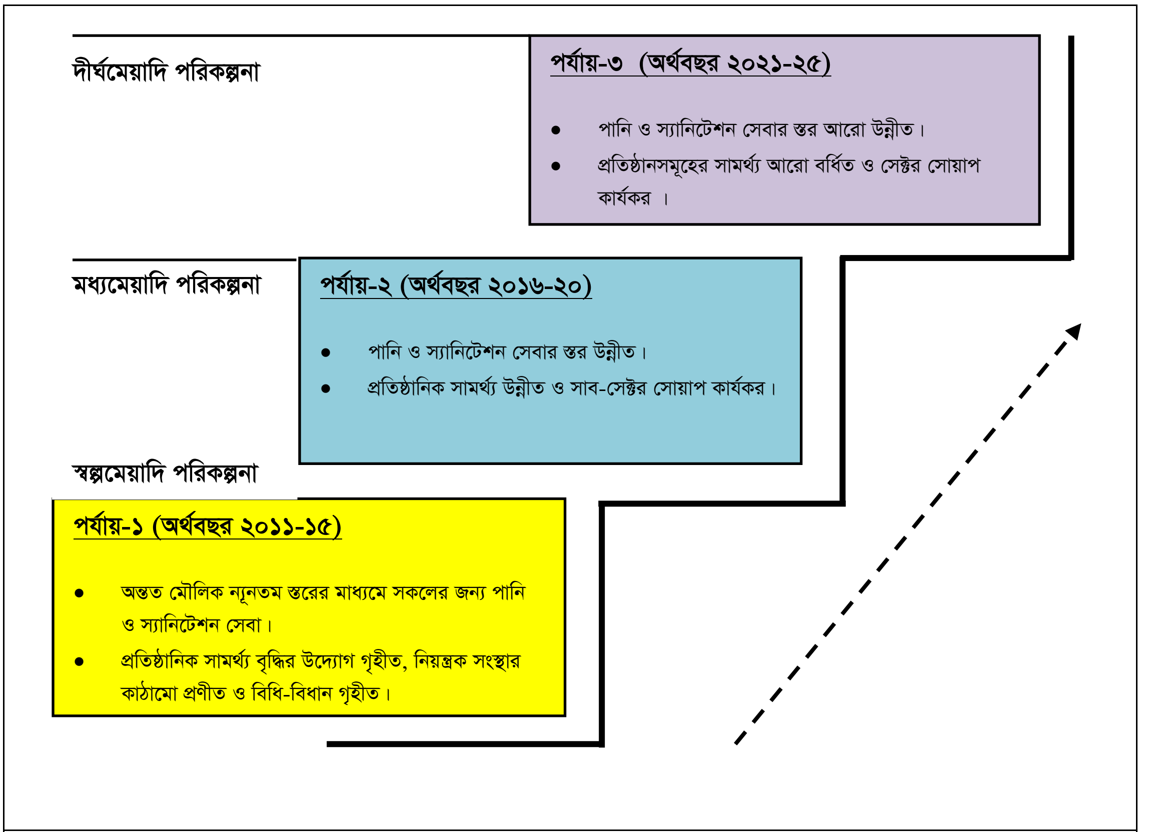

চিত্র ১.৩ : ডায়াগ্রামে এসডিপি বাস্তবায়নের তিন মেয়াদে সেক্টরের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন প্রদর্শিত হয়েছে

তিনটি পরিকল্পনা মেয়াদে সেক্টরের বিকাশমান উন্নয়ন (progressive development) উপরের চিত্র ১.৩-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো – সকলের, বিশেষ করে দরিদ্র ও নাজুক (vulnerable) জনগোষ্ঠীর জন্য অন্ততঃপক্ষে মৌলিক ন্যূনতম পানি ও স্যানিটেশন সেবা[১৩] নিশ্চিত করা। বিদ্যমান জাতীয় দ্রুত দারিদ্র্য-বিমোচন কৌশলপত্র (NSAPR-II) অনুসারে সকলের জন্য ২০১১ সনের মধ্যে নিরাপদ খাবার পানি এবং ২০১৩ সনের মধ্যে স্যানিটেশন সেবাসুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। প্রথমে ন্যূনতম সেবার স্তর (minimum service level) নিশ্চিত করা হবে এবং তৎপরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে উন্নীত করতে হবে সেবার মান। যুগপৎভাবে, গ্রহণ করতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধির উদ্যোগ। তদুপরি স্বল্পমেয়াদেই সেক্টর পরিচালনার উপাদানসমূহ, যেমনঃ একটি আইনি ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো (legal and regulatory framework) প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রণয়ন করতে হবে নতুন নীতিমালা ও কৌশল বা সম্পন্ন করা হবে বিদ্যমান নীতিমালা ও কৌশলপত্রগুলো সংশোধনের কাজ। একই সাথে সেক্টর সহযোগীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য একটি মোর্চা বা ভিত্তি প্রস্তুত করা হবে। ধাপে ধাপে গৃহীত হবে সেক্টর-ব্যাপী পন্থা বা সোয়াপ বাস্তবায়নের উদ্যোগ। সারকথা হলো, সকলের জন্য ন্যূনতম সেবা প্রদান ছাড়াও স্বল্পমেয়াদের কর্মকাণ্ডের উপরেই রচিত হবে পরবর্তী মেয়াদসমূহের বিকাশমান ও টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি।

প্রথম পর্যায়ে রচিত দৃঢ় ভিত্তির ওপরই মধ্যমেয়াদের সকল কার্যক্রম গড়ে উঠবে। সেবার স্তর এমনভাবে উন্নীত হবে যে তা জীবনমানের অধিকতর উন্নয়নে অবদান রাখবে। প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন চলমান থাকবে এবং উপখাত (sub-sector), যেমনঃ নগর ও গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচি পর্যায়ে সোয়াপ প্রতিষ্ঠিত হবে।

দীর্ঘমেয়াদে সেবাস্তর আরও উন্নত হবে। আশা করা যায়, সে সময়ের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য সেক্টরটি অটুট সামর্থ্যের (sound capacity) অধিকারী হবে। সেক্টরের সকল সহযোগী সংস্থা একটি সুসমন্বিত পন্থা (well coordinated approach) অনুসরণ করবে এবং প্রতিষ্ঠিত হবে একটি পূর্ণাঙ্গ সেক্টর সোয়াপ। তিনটি পরিকল্পনা মেয়াদের জন্য বিস্তারিত পথ-নির্দেশনা (road map) অধ্যায় ৭-এ বর্ণনা করা হয়েছে।

১.৮ পরিকল্পনা প্রণয়নে গৃহীত পন্থা ও পদ্ধতিসমূহ

সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয় সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (এসডিপি)। তিনি সময়ে সময়ে প্রণয়ন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহের (এলজিডি, ডিপিএইচই, ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা) উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও প্রধানগণের সাথে সম্পাদিত আলোচনা ও আয়োজিত নীতি-নির্ধারণী কর্মশালায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রাখেন। কর্মশালাসমূহের ফলাফল হলো সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের মধ্যে স্বাক্ষরিত এক গুচ্ছ ''সমঝোতা বিবৃতি (agreed statement)"। এসকল বিবৃতিতে সেক্টরের উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণের মূল নীতিমালা ও তাদের গৃহীতব্য সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত হয়। এসডিপি বাস্তবায়নের পথ-নির্দেশনা বা রোড-ম্যাপে এসকল কর্মকাণ্ড প্রতিফলিত।

সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর সভাপতিত্বে ও বিভিন্ন সরকারি, উন্নয়ন সহযোগী বা দাতাসংস্থা, এনজিও ও বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরাম কর্মকাণ্ড সমন্বয়ে সহযোগিতা প্রদান করে। এসডিপি প্রণয়নের প্রক্রিয়াটিতে নির্দেশনা প্রদান ও তত্ত্বাবধান করতে ফোরামের অধীনে একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়। বিভিন্ন কমিটি গঠন, ওয়ার্কিং গ্রুপ ও থিম্যাটিক গ্রুপ প্রতিষ্ঠাসহ নিচের অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এসডিপি প্রণয়নের সার্বিক প্রক্রিয়াটি।

[১৩] মৌলিক ও উন্নত পর্যায়ের সেবাসুবিধা অনুচ্ছেদ ২-তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কার্যপত্রসমূহ (Working documents)

এসডিপি প্রণয়নের কাজকে সহায়তা করতে প্রস্তুত করা হয় বেশ কিছু কার্যপত্র, যেগুলোর প্রাসঙ্গিক অংশ এই প্রতিবেদনে সংযোজিত আছে। কার্যপত্রগুলো যেসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি, তা হলো: ১) থিম্যাটিক গ্রুপ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত থিম্যাটিক প্রতিবেদন; ২) এসডিপি পরামর্শকদের সহায়তায় আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কিছু সুনির্দিষ্ট গবেষণা, যার জন্য কারিগরী সহায়তা প্রদান করে উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ, যেমন: এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), ডিএফআইডি, বিশ্বব্যাংকের পানি ও স্যানিটেশন কর্মসূচি এবং ইউনিসেফ; এবং ৩) এসডিপি পরামর্শকবৃন্দ কর্তৃক সম্পাদিত কিছু বিষয় বা সমস্যা-নির্দিষ্ট গবেষণা। তৈরি করা হয় সর্বমোট ২০টি কার্যপত্র, যার একটি তালিকা সংযোজনী ১-এ প্রণীত হয়েছে।

অংশগ্রহণ ও পরামর্শমূলক আলোচনা

একটি সমন্বিত বা ব্যাপকভিত্তিক পন্থা অবলম্বনের ওপরই অনেকাংশে নির্ভর করে উন্নয়নের সাফল্য, যেখানে উন্নয়ন সহযোগী বিশেষ করে সেইসব মানুষ যাদের জন্য তা করা হয়, তাদের প্রয়োজনের দিকটি বিবেচনায় থাকে। সেই বিবেচনা থেকেই এসডিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অবলম্বন করা হয় একটি ব্যাপকভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক পন্থা। এটির বিস্তৃতি ঘটে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় উভয় পর্যায়েই। দারিদ্র্যপ্রবণ ও দুর্গম এলাকায় বসবাসরত মানুষের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দেওয়া হয় বিশেষ নজর, যেন তাঁদের চাহিদা ও বক্তব্য এসডিপিতে প্রতিফলিত হয়।

এসডিপি বিষয়ে সম্পন্ন করা হয় একটি ব্যাপক পরামর্শমূলক আলোচনা। আলোচনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম, বিস্তৃত চরাঞ্চল (ও নদী দ্বীপসমূহ), হাওর-বাওর, বন্যা-প্রবণ, খরা-প্রবণ, পানির নিম্নস্তর এলাকা ও উপকূলীয় অঞ্চলের মত বিশেষ জটিল এলাকাগুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের জনগোষ্ঠীসমূহের বিশেষ করে শহুরে বস্তি ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র মানুষের সাথে দলীয় আলোচনা (group discussion) ও সরেজমিন পরিদর্শন (physical observation) করা হয় তাদের অবস্থান। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও অফিসের প্রতিনিধিবৃন্দ যেমন ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ, উপজেলা নির্বাহী অফিসারবৃন্দ এবং উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ডিপিএইচই প্রকৌশলীদের সাথে অনেক সংখ্যক ফোকাস দল আলোচনা (focus group discussion) ও তথ্য-সমৃদ্ধ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার (KII: key informant interview) অনুষ্ঠিত হয়। পৌরসভার মেয়র, পানি সরবরাহ শাখার তত্ত্বাবধায়ক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথেও পৃথক পরামর্শমূলক আলোচনা (consultative workshop) করা হয়। আলোচনা হয় সিটি কর্পোরেশন ও ওয়াসা কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে। এছাড়াও অতিরিক্ত হিসেবে এনজিও, অন্যান্য সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের সাথেও পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ে ব্যাপকভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

দুটি আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করা হয় দেশের দুটি সমস্যা-সংকুল এলাকায়, যেমন: ১) ভৌগলিক, আর্থ-সামাজিক ও সমস্যা-চরিত্রের দিক দিয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি শহর; এবং ২) হাওর-বাওর ও বন্যাপ্রবণ নিচু এলাকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলা।

ঢাকা-ভিত্তিক উন্নয়ন সহযোগী, যেমন: সরকারি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরসমূহ (যথা - ডিপিএইচই ও এলজিইডি), বিভিন্ন প্রকল্প অফিস এবং সকল প্রধান দ্বি-পাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক দাতাসংস্থার (এডিবি, অস-এইড, ডিএফআইডি, ডানিডা, জাইকা, বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ ও ইউএনডিপি, যারা দেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের উন্নয়নের সাথে জড়িত) সাথে এসডিপি বিষয়ে তাদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের জন্যে ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে সোয়াপ বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং অনুরূপভাবে তা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের সোয়াপ প্রণয়নে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্টভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিশেষ পরামর্শমূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে, সেক্টর সংশ্লিষ্ট সহযোগীদের নিয়ে তিনটি জাতীয় কর্মশালা আয়োজিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল এসডিপি'র মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে সকলের সাথে মতামত বিনিময় ও পরামর্শ সম্পন্ন করা।

থিম্যাটিক দলসমূহ

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরামের সাব-কমিটি কর্তৃক ১২টি থিম্যাটিক গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি গ্রুপকে এসডিপি'র জন্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় একটি করে সুনির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। প্রত্যেকটি গ্রুপ অনেকগুলো সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হয়, যার মধ্যে ছিলেন শিক্ষা বিশেষজ্ঞ (academia), সরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও, বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিবৃন্দ ও এসডিপি পরামর্শকবৃন্দ। দলীয় বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ গ্রুপের সদস্য নির্বাচিত হন এবং গ্রুপের কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য প্রতিটি গ্রুপে একটি ফোকাল বা মূল প্রতিনিধি সংস্থা ঠিক করা হয় (থিম্যাটিক গ্রুপগুলোর তালিকা ও গ্রুপ সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দের নাম সংযোজনী ২ এ সন্নিবেশিত আছে)।

বিষয়ভিত্তিক দল গঠনের দুটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল:

- এসডিপি প্রণয়ন পর্যায়ে প্রতিটি বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কারিগরী সহযোগিতা প্রদান, এবং
- বিষয়ভিত্তিক সুপারিশগুলোর বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান এবং তিনটি নির্দিষ্ট মেয়াদে এসডিপি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কারিগরী নির্দেশনা প্রদান।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর নতুন ধারণা বিনিময় ও এসডিপি'র সংশ্লিষ্ট অংশ পর্যালোচনা করে প্রতিটি থিম্যাটিক গ্রুপ তাদের স্ব-স্ব প্রতিবেদন তৈরি করে।

জুটিতে পর্যালোচনা (Peer review)

প্রণীত এসডিপি'র উচ্চমান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন শিক্ষায়তন, সরকারি দপ্তর, এনজিও ও উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক এসডিপি'র খসড়া প্রতিবেদনটি জুটিতে পর্যালোচনা করা হয়। সংযোজনী ৩-এ জুটিতে পর্যালোচনাকারী বিশেষজ্ঞবৃন্দের নাম সন্নিবেশিত আছে।

১.৯ প্রতিবেদন রূপরেখা (Outline)

সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (SDP) দলিলের প্রথম অধ্যায়ে প্রদান করা হয়েছে একটি ভূমিকা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে দেশের বিদ্যমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পরিস্থিতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা। তৃতীয় অধ্যায়ে বিধৃত আছে সেক্টরের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিস্তারিত বিশ্লেষণ। সেক্টর সম্পর্কিত আইন-কানুন, নীতিমালা ও কৌশলাদি বর্ণিত আছে চতুর্থ অধ্যায়ে এবং পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম। সেক্টরের বিনিয়োগ ব্যয় সংযোজিত আছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। পরিশেষে, সপ্তম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে এসডিপি বাস্তবায়নের পথ-নির্দেশনা বা রোড-ম্যাপ। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে যুক্ত করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয় বাস্তবায়নের কর্ম-নির্দেশনা। এসকল কর্ম-নির্দেশনার ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত হয়েছে সামগ্রিকভাবে এসডিপি বাস্তবায়নের পথ-নির্দেশনা।

প্রতিবেদনটির সাথে যুক্ত আছে বেশ কয়েকটি সংযোজনী। এসডিপি প্রণয়নের ভিত্তিমূল উপকরণ হিসেবে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন কার্যপত্র (তালিকা সংযোজনী ১ এ দেখুন) পলিসি সাপোর্ট ইউনিটের (পিএসইউ) ওয়েব সাইটে (www.psu-wss.org) পাওয়া যাবে। সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি সারাংশ সংস্করণ (SDP Summary Version) পাওয়া যাবে। বাংলায় অনুদিত সারাংশ সংস্করণ প্রতিবেদনটিও সকলের জন্য সহজলভ্য করা হয়েছে।

অধ্যায় ২

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পরিস্থিতি

এই অধ্যায়ের প্রথমেই বর্ণিত আছে বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং তৎপরে বর্ণিত আছে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজ যাচাই ও সংজ্ঞায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ। এরপর সংযুক্ত আছে দেশের বিদ্যমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পরিস্থিতির বর্ণনা। পুনরায় নগর ও গ্রামীণ উপ-খাতগুলোর কারিগরী দিকসমূহ, সেবার স্তর ও কভারেজের বিস্তারিত বর্ণনাসহ সেক্টরের চিহ্নিত সমস্যা ও কর্ম নির্দেশনা উপস্থাপিত হয়েছে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের অন্যান্য দিকসমূহ যেমন: পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, পানির মান ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার (hygiene promotion) এবং এসবের সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক দিকগুলো আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়সমূহে।

২.১ পানি সরবরাহ পটভূমি, সংজ্ঞা ও কভারেজ

২.১.১ পানি সরবরাহের পটভূমি

১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্বে মূলত পুকুর, কূয়া ও খাল-বিলই ছিল প্রচলিত খাবার পানির প্রধান উৎস। সেসময়ে হাতেগোনা কয়েকটি শহরের মধ্যেই পাইপবাহিত পানি সরবরাহ-ব্যবস্থা সীমিত ছিল। মূলত ডিপিএইচই'র মাধ্যমেই আশির দশকে অনেক শহরে পাইপবাহিত পানি সরবরাহের গোড়াপত্তন হয়। পর্যায়ক্রমে পৌরসভাগুলো অধিকহারে সম্পৃক্ত হতে থাকে পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে। বড় বড় নগরীর ক্রমবর্ধমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৩ সনে ঢাকা ও চট্টগ্রামে এবং ২০০৮ সনে খুলনায় ওয়াসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাজশাহী শহরেও প্রতিষ্ঠার করা হচ্ছে ওয়াসা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উপজেলা পর্যায়ের ছোট ছোট শহরেও পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

সত্তর দশকের শুরুতে গ্রামাঞ্চলে প্রথম ব্যাপকহারে হস্তচালিত নলকূপ প্রবর্তিত হয়। তখন ডিপিএইচই'র মাধ্যমেই সরকার এগুলো বিনামূল্যে সরবরাহ করে। নলকূপের উপকরণ যেমন পাইপ ও ওয়েল স্ক্রীন বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো এবং ডিপিএইচই-এর ওপরই নলকূপ স্থাপন এবং এগুলোর পরিচালনা ও সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। ব্যবহারকারী ও বেসরকারি খাতের ওপর সরকারি উদ্যোগে গৃহীত নলকূপ স্থাপন প্রকল্পগুলো ইতিবাচক দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রভাব ফেলে। কালের আবর্তে নলকূপ ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় বাজারের সামর্থ্য দারুণভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আশির দশকে স্থাপিত নলকূপগুলোর পরিচালনা ও সংরক্ষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর উপর অর্পন করা হয়। বেসরকারি খাতের নলকূপ উৎপাদন ও স্থাপন সামর্থ্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত উদ্যোগে নলকূপ স্থাপন শুরু হয় সত্তর দশকে, এবং দেখা যায় বর্তমানে দেশে স্থাপিত মোট নলকূপের প্রায় ৮০ ভাগই স্থাপিত হয়েছে বেসরকারি উদ্যোগে। এসকল নলকূপের অধিকাংশই হস্তচালিত অগভীর নলকূপ, যা ব্যক্তিগত বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত। এনজিওরাও বেশকিছু নলকূপ বিতরণ করে, তবে তা মূলত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এখনও পর্যন্ত গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা হস্তচালিত নলকূপ-নির্ভরই রয়ে গেছে; সামান্য কিছু ক্ষেত্রে পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (pond sand filter), পাত-কূয়া (ring well) ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতির (rain water harvesting) মত পানির উৎস ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

২.১.২ সংজ্ঞা ও কভারেজ

পানি সরবরাহ কভারেজের চ্যালেঞ্জসমূহ

পানি সরবরাহের কভারেজ সংজ্ঞায়ন ও নিরূপণে বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর দুটি বৃহত্তর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন:

- একটি একক মানদণ্ডের ভিত্তিতে কভারেজের সংজ্ঞায়ন (definition of coverage); এবং
- কভারেজ নিরূপণে নির্ভরযোগ্য তথ্যের (data) অভাব।

কভারেজের সংজ্ঞা: ঐতিহাসিকভাবে সেক্টর সংস্থাসমূহ যেমন ডিপিএইচই কর্তৃক পানি সরবরাহ কভারেজ নিরূপণের জন্য যে মানদণ্ড ব্যবহৃত হচ্ছে, তা সময়ে সময়ে উন্নয়ন প্রেক্ষিত পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তীত হচ্ছে। যেমন প্রথমে নলকূপ-প্রতি ১৫০ জনসংখ্যাকে মানদণ্ড ধরা হতো, যা বর্তমানে ৫০ জনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা ১৯৯৮ অনুযায়ী পানি সরবরাহ কভারেজের মানদণ্ড ঠিক করা হয়েছে ৫০ জনের জন্য একটি পানির উৎসের (point source) ভিত্তিতে; কিন্তু মানদণ্ডটি পরিপালনের জন্য কোন সময়সীমা নির্ধারিত নাই। আবার এই মানদণ্ডটি গ্রামীণ এলাকার জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু সেটি নগর এলাকার পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য উপযোগী নয়। এদিকে সরকার কর্তৃক ২০১১ সনের মধ্যে সকলের জন্য পানি সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে, বাস্তব অবস্থার নিরিখে যা অর্জনের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। সেক্টরের পেশাজীবীগণ ও সংস্থাসমূহের অনেকেই পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজ নিরূপণের জন্য যৌথ পরিবীক্ষণ কর্মসূচি (JMP: joint monitoring program) মানদণ্ড ব্যবহার করে থাকেন। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনের নিমিত্তে সাধারণভাবে কভারেজ নিরূপণে জেএমপি মানদণ্ড ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইউনিসেফ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত তথ্যসহ জেএমপি জরিপ ফলাফল প্রকাশ করে, যার সাথে অন্যান্য কিছু তথ্যও সংযুক্ত আছে। জরিপ প্রতিবেদনটির নাম হলো বহু-নির্দেশক গুচ্ছ জরিপ (MICS: multiple indicator cluster survey)। যাহোক, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের নিজস্ব জাতীয় প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজ নিরূপণে ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ড ব্যবহার করে।

নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব: গ্রামীণ ও নগর উভয় এলাকার কভারেজ নিরূপণে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। নগর এলাকার বেলায়, সকল উৎপাদন নলকূপে মিটার ব্যবস্থা যুক্ত নাই অথবা ব্যবহারের সঠিক পরিমাণ প্রদর্শণে সক্ষম রাখতে মিটারগুলোর যথাযথ পরিচর্যা (not calibrated) নেওয়া হয় না। আবার, নগর এলাকার অধিকাংশ বসতবাড়ির পানির সংযোগ মিটারবিহীন এবং এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে সংযোগ সংখ্যার (আইনসম্মত ও বে-আইনি উভয়েরই) সঠিক হিসাবও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় না। যেহেতু বহুতল ভবনসহ নানারকম বসতবাড়িতে সংযোগ দেয়া হয়ে থাকে, উপর্যুক্ত সমস্যার কারণে প্রতিটি সংযোগের মাধ্যমে সেবাপ্রাপ্ত মোট জনসংখ্যার হিসাবও যথাযথভাবে নিরূপণ করা যায় না। ফলে উৎপাদিত ও সরবরাহকৃত মোট পানির পরিমাণ নিরূপণের ক্ষেত্রে তথ্য-নির্ভরযোগ্যতার প্রশ্নটি থেকেই যায়। পাশাপাশি নগর এলাকাতে বিপুল সংখ্যক সরকারি ও বেসরকারি হস্তচালিত নলকূপও ব্যবহৃত হয়। পাইপবাহিত পানির সংযোগ আছে এমন বহু বসতবাড়িতেও হস্তচালিত নলকূপ রয়েছে। যেহেতু হস্তচালিত নলকূপ ও এগুলোর ব্যবহারকারীর প্রকৃত সংখ্যা অজানা, সেহেতু নগর এলাকায় হস্তচালিত নলকূপের মাধ্যমে অর্জিত কভারেজ নিরূপণ সত্যিই খুব দুরূহ।

একই ধরণের সমস্যা গ্রামীণ এলাকাতেও বিদ্যমান। জাতীয়ভাবে পানি সরবরাহের কোন ভিত্তিজরিপ এখনো সম্পন্ন হয়নি, যেমনটা ২০০৩ সনে হয়েছে স্যানিটেশন জরিপের জন্য। অথচ একই জরিপের মাধ্যমে দেশের মোট নলকূপ বা অন্যান্য সকল ধরণের পানির উৎস-সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব ছিল। সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত হস্তচালিত নলকূপ ও অন্যান্য পানির উৎসের একটি হিসাব পাওয়া যায়, কিন্তু বেসরকারিভাবে স্থাপিত নলকূপের কোন তথ্য সেখানে নেই। এনজিওদের মাধ্যমে সরবরাহকৃত ও স্থাপিত হস্তচালিত নলকূপ ও অন্যান্য পানির উৎসের সঠিক তথ্য-প্রাপ্তিও কষ্টসাধ্য।

পানি সরবরাহের কভারেজ নিরূপণের জন্য একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও মানদণ্ডের এহেন অনুপস্থিতিতে এসডিপিতে দুই ধরণের বাংলাদেশ মানদণ্ড বিবেচিত হয়েছে, যা নিম্নে বর্ণিত আছে। অতিরিক্ত হিসেবে দেশে অর্জিত অগ্রগতি অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সাথে তুলনা করার সুবিধার্থে জেএমপি মানদণ্ডকেও ব্যবহারযোগ্য বিবেচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মৌলিক মানদণ্ড (basic standard)**:** পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাসুবিধার ক্ষেত্রে অন্ততঃপক্ষে বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য ২০১১ সনের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও ২০১৩ সনের মধ্যে সকলের জন্য স্যানিটেশন অর্জন নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ উন্নত মানদণ্ড (improved standard)**:** পানি সরবরাহ সেবাসুবিধার ক্ষেত্রে অন্ততঃপক্ষে জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা ১৯৯৮তে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা এবং স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০০৫-এ নির্ধারিত মানদণ্ড অর্জন করা।

জেএমপি মানদণ্ড (JMP standard)**:** পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাসুবিধার ক্ষেত্রে অন্ততঃপক্ষে জেএমপি কর্তৃক সংজ্ঞায়িত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এমডিজি) নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন।

পানি সরবরাহ কভারেজ নিরূপণে ব্যবহৃতব্য তিনটি মানদণ্ডের বিস্তারিত সংজ্ঞা সারণি ২.১ এ উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের দুটি মানদণ্ড ও জেএমপি মানদণ্ডের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো - জেএমপি মানদণ্ড কেবলমাত্র 'নিরাপদ পানির উৎস' ব্যবহারকেই বিবেচনা করে; এতে সেবাস্তর অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে কতসংখ্যক মানুষ নলকূপ ব্যবহার করে বা নগরাঞ্চলে পাইপবাহিত পানির সংযোগ কতজন ব্যবহার করছে এসব বিবেচনায় নেয় না। বাংলাদেশ মৌলিক মানদণ্ডে পানির উৎস-প্রতি ১০০ জন ব্যবহারকারীকে বিবেচনা করা হয়, যখন উন্নত মানদণ্ড অনুযায়ী উৎস-প্রতি ব্যবহারকারীর পরিমাণ ধরা হয় ৫০ জন।

সারণি ২.১: পানি সরবরাহ কভারেজ নিরূপণের বিভিন্ন মানদণ্ড

বাংলাদেশ মৌলিক মানদণ্ড	বাংলাদেশ উন্নত মানদণ্ড	জেএমপি মানদণ্ড
২০১১ সনের মধ্যে সকলের জন্য পানি সরবরাহের সরকারি লক্ষ্যমাত্র অর্জনে অন্ততঃপক্ষে নিম্নবর্ণিত পানি সরবরাহ সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্য অর্জন করা।	জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা ১৯৯৮তে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অন্ততঃপক্ষে নিম্নবর্ণিত পানি সরবরাহ সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্য অর্জন করা।	এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অন্ততঃপক্ষে নিম্নবর্ণিত পানি সরবরাহ সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্য অর্জন করা।
নিম্নবর্ণিত ধরণের ব্যক্তিগত বা ভাগে ব্যবহৃত পানি সরবরাহ সুবিধাদি: **নগর ও গ্রামীণ:** • একাধিক কল/ট্যাপ, উঠান সংযোগ বা ভাগে ব্যবহৃতব্য সংযোগসহ বসতবাড়িতে পাইপবাহিত পানি সরবরাহ; • সর্বোচ্চ ১০০ জনের জন্য ভাগে ব্যবহৃতব্য গণকল বা পাবলিক স্ট্যান্ডপাইপ; • নিরাপদ পানির উৎস, যেমন: হস্তচালিত নলকূপ, পাত-কূয়া, পিএসএফ, সংরক্ষিত কূয়া, সংরক্ষিত ঝর্ণা ও বৃষ্টির পানি	নিম্নবর্ণিত ধরণের ব্যক্তিগত বা ভাগে ব্যবহৃত পানি সরবরাহ সুবিধাদি: **নগর:** • একাধিক কল/ট্যাপ, উঠান সংযোগ বা ভাগে ব্যবহৃতব্য সংযোগসহ বসতবাড়িতে পাইপবাহিত পানি সরবরাহ; • সর্বোচ্চ ৫০ জনের জন্য ভাগে ব্যবহৃতব্য গণকল বা পাবলিক স্ট্যান্ডপাইপ; **গ্রামীণ:** • একাধিক কল/ট্যাপ, উঠান সংযোগ বা ভাগে ব্যবহৃতব্য সংযোগসহ বসতবাড়িতে পাইপবাহিত পানি	নিম্নবর্ণিত ধরণের ব্যক্তিগত বা ভাগে ব্যবহৃত পানি সরবরাহ সুবিধাদি: **নগর ও গ্রামীণ:** • একাধিক কল/ট্যাপ, উঠান সংযোগ বা ভাগে ব্যবহৃতব্য সংযোগসহ বসতবাড়িতে পাইপবাহিত পানি সরবরাহ; • গণকল বা পাবলিক স্ট্যান্ডপাইপ; • নিরাপদ পানির উৎস, যেমন: হস্তচালিত নলকূপ, পাত-কূয়া, পিএসএফ, সংরক্ষিত কূয়া, সংরক্ষিত ঝর্ণা ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি;

সংরক্ষণ পদ্ধতি; সর্বোচ্চ ১০০ জনের জন্য ভাগে ব্যবহৃতব্য সরকারি পানির উৎস এবং সর্বোচ্চ ৫ জনের জন্য ভাগে ব্যবহৃতব্য ব্যক্তিগত পানির উৎস।	সরবরাহ; ● সর্বোচ্চ ৫০ জনের জন্য ভাগে ব্যবহৃতব্য গণকল বা পাবলিক স্ট্যান্ডপাইপ; ● নিরাপদ পানির উৎস, যেমন: হস্তচালিত নলকূপ, পাত-কূয়া, পিএসএফ, সংরক্ষিত কূয়া, সংরক্ষিত ঝর্ণা ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি; সর্বোচ্চ ৫০ জনের জন্য ভাগে ব্যবহৃতব্য সরকারি পানির উৎস এবং সর্বোচ্চ ৫ জনের জন্য ভাগে ব্যবহৃতব্য ব্যক্তিগত পানির উৎস।	

২.১.৩ বিদ্যমান পানি সরবরাহ কভারেজের সার-সংক্ষেপ

নগর ও গ্রামীণ এলাকার নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুপস্থিতির প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত উপায়ে পানি সরবরাহ কভারেজ প্রাক্কলন করা হয়েছে। বিদ্যমান নগর পানি সরবরাহ কভারেজের চিত্র সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ডিপিএইচই কর্তৃক প্রাক্কলিত তথ্যের ভিত্তিতে উপস্থাপিত। স্থানীয় তথ্যসূত্রের ভিত্তিতেই এসকল সংস্থার প্রাক্কলন সম্পন্ন হয়েছে এবং তাতে পানি উৎপাদন ও গৃহস্থালী সংযোগ, রাস্তায় স্থাপিত গণকল ও হস্তচালিত নলকূপের সংখ্যা, এবং পাইপ-নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সেবাভুক্ত এলাকার মত বিষয়গুলো বিবেচিত।

সেক্টর বিশেষজ্ঞগণের মতে, বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে ব্যবহৃত বেসরকারি অগভীর হস্তচালিত নলকূপের অনুমিত সংখ্যা সরকারি নলকূপের সংখ্যার প্রায় আট গুণ। বেসরকারি গভীর নলকূপ ও ডিপ-সেট পাম্প (DSP) নলকূপের সংখ্যা একই ধরণের সরকারি নলকূপের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং অন্যান্য বেসরকারি পানির উৎস যেমন বিভিন্ন ধরণের বিকল্প প্রযুক্তি (উদাহরণ স্বরূপ, পিএসএফ ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি) সরকারি স্থাপনার প্রায় এক-দশমাংশ। গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন ধরণের পানির উৎসের সংখ্যা নির্ধারণে এসকল উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সরকার ও এনজিও কর্তৃক পানির উৎস কোন কোন ক্ষেত্রে যৌথ পরিবার, আবার একক পরিবারের (গড়ে পাঁচজন ব্যবহারকারী) ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছে; এ বিষয়টিও গ্রামীণ এলাকার পানি সরবরাহ কভারেজ নিরূপণে বিবেচিত হয়েছে।

বাংলাদেশ মৌলিক মানদণ্ড, বাংলাদেশ উন্নত মানদণ্ড ও জেএমপি মানদণ্ডের ভিত্তিতে নিরূপিত পানি সরবরাহ কভারেজের একটি সার-সংক্ষেপ সারণি ২.২ তে উপস্থাপিত হলো। জেএমপি প্রদত্ত তথ্য-উপাত্ত যৌথভাবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ কর্তৃক পরিচালিত একটি নমুনা খানা জরিপের (যেটি বহু-নির্দেশক গুচ্ছ জরিপ প্রতিবেদন বা MICS রিপোর্ট ২০০৯ সূত্রে প্রাপ্ত) মাধ্যমে সংগৃহীত। দেশের বিদ্যমান পানি সরবরাহ কভারেজ বাংলাদেশ মৌলিক মানদণ্ড অনুযায়ী ৭৫ শতাংশ, বাংলাদেশ উন্নত মানদণ্ড অনুযায়ী ৫০ শতাংশ এবং জেএমপি মানদণ্ড অনুযায়ী ৮৫.৫ শতাংশ। বিভিন্ন ক্যাটেগরির নগর ও গ্রামীণ পানি সরবরাহ কভারেজের বিস্তারিত বর্ণনা ও এগুলো নিরূপণের পদ্ধতিসমূহের পুনঃব্যাখ্যা পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে সন্নিবেশিত আছে।

সারণি ২.২: বিভিন্ন মানদণ্ড অনুযায়ী পানি সরবরাহ কভারেজের সার-সংক্ষেপ

এলাকা	পানি সরবরাহ কভারেজের শতকরা হার (%)		
	বাংলাদেশ মৌলিক মানদণ্ড	বাংলাদেশ উন্নত মানদণ্ড	জেএমপি মানদণ্ড
নগর	৮২	৩৪	৯৩.৩
সকল ওয়াসা	৮৪	৭২	-
সকল সিটি কর্পোরেশন	৭৬	৬১	-

সকল পৌরসভা ও গ্রোথ-সেন্টার	৮৫	১২	-
গ্রামীণ	৭১	৫১	৮৩.৮
জাতীয়	**৭৪**	**৫০**	**৮৫.৫**

২.২ স্যানিটেশন পটভূমি, সংজ্ঞা ও কভারেজ

২.২.১ স্যানিটেশন পটভূমি

১৯৮০ ও ১৯৯০'র দিকে স্যানিটেশন কভারেজের অগ্রগতি, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় বরং বেশ ধীরগতির ছিল; সেসময়ে বার্ষিক কভারেজ প্রবৃদ্ধি ছিল বড়জোড় ১ শতাংশ। স্যানিটেশন কভারেজ নিরূপণ করার লক্ষ্যে ২০০৩ সনের অক্টোবর মাসে সরকার কর্তৃক একটি জাতীয় ভিত্তি-জরিপ করা হয়, যেখানে দেখা যায় যে দেশের প্রায় ২১ মিলিয়ন পরিবারের মধ্যে মাত্র ৩৩ শতাংশ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে, ২৫ শতাংশ ব্যবহার করে অ-স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা এবং ৪২ শতাংশ পরিবারের কোন ধরণের পায়খানা-ই নাই, তারা মূলত উন্মুক্ত স্থানেই মলত্যাগে অভ্যস্ত। এধরণের শোচনীয় কভারেজ সরকারকে একটি জাতীয় স্যানিটেশন প্রচারাভিযান গ্রহণের পথে উদ্বুদ্ধ করে, যার উদ্দেশ্য ছিল দেশে দ্রুত স্যানিটেশন কভারেজ বৃদ্ধি করা। প্রাথমিকভাবে "২০১০ সনের মধ্যে ১০০ ভাগ স্যানিটেশন" কভারেজ অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। তবে, বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৯ সনে লক্ষ্যমাত্রাটি "২০১৩ সনের মধ্যে ১০০ ভাগ স্যানিটেশন" -এ পুনঃনির্ধারিত হয়।

২০০৩ সনে জাতীয় স্যানিটেশন প্রচারাভিযান শুরুর পরে স্যানিটেশন প্রসারের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক অনেকগুলো নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গঠন করা হয় একটি জাতীয় স্যানিটেশন সেক্রেটারিয়েট এবং স্যানিটেশন উন্নয়নের কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান ও সেগুলো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করা হয় টাস্কফোর্স। সেই ২০০৩ সন থেকেই প্রতিবছর অক্টোবর মাসকে "জাতীয় স্যানিটেশন মাস" হিসেবে উদযাপন করা হচ্ছে। স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে বিভিন্ন গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালানো হয়। সুনির্দিষ্টভাবে স্যানিটেশন প্রসারের জন্যই সরকার উপজেলাসমূহে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) ২০ শতাংশ ব্লক বরাদ্দ মঞ্জুর করে আসছে, যা কেবলমাত্র উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ব্যবহৃত হবে। আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী ও সুশীল সমাজের মধ্যে একটি অংশীদারিত্বমূলক পন্থাকে সরকার উৎসাহিত করে। এর মাধ্যমে স্যানিটেশন কভারেজ বৃদ্ধিতে সকল উন্নয়ন সহযোগীর মধ্যে কার্যকর অংশীদারিত্ব সৃষ্টির দৃঢ় ভিত্তি রচিত হয়েছে এবং অংশীদারদের যৌথ কার্যক্রমের সমন্বিত প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

২.২.২ সংজ্ঞা ও কভারেজ

স্যানিটেশন কভারেজের চ্যালেঞ্জসমূহ

পানি সরবরাহ কভারেজের মতই স্যানিটেশন কভারেজের ক্ষেত্রেও দুই ধরণের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, যেমনঃ

- একটি একক মানদণ্ডের ভিত্তিতে কভারেজ সংজ্ঞায়ন, এবং
- কভারেজ নিরূপণে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অনুপস্থিতি।

কভারেজের সংজ্ঞাঃ দেশে পায়খানার বিভিন্ন ধরণের সংজ্ঞা ব্যবহৃত হচ্ছে (বক্স ২.১) এবং স্যানিটেশন কভারেজ বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের সংজ্ঞা ও তথ্যচিত্রের ব্যবহার দেখা যায়।

বক্স ২.১: বিভিন্ন ধরণের পায়খানার সাধারণ্যে ব্যবহৃত সংজ্ঞাসমূহ

স্বাস্থ্যসম্মত (hygienic) পায়খানা: *এধরণের পায়খানা কার্যকরভাবে রোগ সংক্রমণের 'মল-মুখ' পথকে (faecal-oral route) নিয়ন্ত্রণ করে। জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০০৫ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার সুপারিশ করে এবং এধরণের পায়খানার ন্যূনতম মানদণ্ড বা প্রকৃতি হলো লিড বা ফ্ল্যাপসহ জলাবদ্ধ গর্ত পায়খানা।*

উন্নত (improved) পায়খানা: *বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ প্রণীত জেএমপি সংজ্ঞা অনুসারে এসকল পায়খানা "মনুষ্য সংস্পর্শ থেকে মনুষ্য পয়ঃবর্জ্যকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পৃথকীকরণ নিশ্চিত করে"। এধরণের পায়খানার ন্যূনতম মানদণ্ড বা প্রকৃতি হলো স্ল্যাবসহ গর্ত পায়খানা।*

অ-স্বাস্থ্যসম্মত (un-hygienic) পায়খানা: *এধরণের পায়খানা কেবল একটি নির্দিষ্ট জায়গায় মলত্যাগকে সীমাবদ্ধ করে, কিন্তু বিভিন্ন পথেই বা ভাবেই মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মনুষ্য পয়ঃবর্জ্যের সংস্পর্শে আসতে পারে। এধরণের পায়খানার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে স্লাব বা ফ্ল্যাপছাড়া গর্ত ও বালতি (bucket) পায়খানা।*

নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব বা অনুপস্থিতি: ডিপিএইচই ভবনে অবস্থিত জাতীয় স্যানিটেশন সেক্রেটারিয়েট ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিয়মিত স্যানিটেশন কভারেজ প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এসকল প্রতিবেদনের মাধ্যমে মূলত ২০০৩ সনের জাতীয় স্যানিটেশন জরিপে প্রাপ্ত তথ্য আপডেট করা হয়। যাহোক, এসকল প্রতিবেদন ব্যবহারের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, কেননা ২০০৩ সনের পর থেকেই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচিত হয় না এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের পদ্ধতিতে সবসময় যাচাই নির্দেশক (means of verification) বা পরস্পর-যাচাই (cross-checking) ব্যবহৃত হয় না। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের মানুষের সেবা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যসহ অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত বহু-নির্দেশক গুচ্ছ জরিপ (বা MISC) ২০০৯ এ পাওয়া যায়। যে কারণে এমআইসিএস থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতেই প্রাক্কলন করা হয়েছে স্যানিটেশন কভারেজ। যাহোক, এমআইসিএস প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া না গেলেই কেবলমাত্র জাতীয় স্যানিটেশন সেক্রেটারিয়েটের তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

পানি সরবরাহের অনুরূপ কারণেই স্যানিটেশন কভারেজ নিরূপণে তিন ধরণের মানদণ্ডই ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন: ১) বাংলাদেশ মৌলিক মানদণ্ড, ২) বাংলাদেশ উন্নত মানদণ্ড, এবং ৩) জেএমপি মানদণ্ড। বিস্তারিত বর্ণিত আছে সারণি ২.৩ তে। ২০১৩ সনের মধ্যে সকলের জন্য স্যানিটেশন সেবা প্রদানের সরকারি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিরিখে স্যানিটেশন কভারেজের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মৌলিক মানদণ্ড এবং জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০০৫-এ প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ উন্নত মানদণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে। জেএমপি মানদণ্ড নির্ধারিত হয়েছে জেএমপি সংজ্ঞা অনুসারেই। এগুলোর মধ্যে মূল পার্থক্য হলো মৌলিক মানদণ্ড উন্নত পায়খানার ব্যবহারকে বিবেচনা করে, কিন্তু পায়খানাটি একাধিক পরিবার কর্তৃকও ব্যবহৃত হতে পারে। জেএমপি মানদণ্ড অনেকটা বাংলাদেশ মৌলিক স্যানিটেশন মানদণ্ডের মত-ই, শুধুমাত্র ব্যতিক্রম হলো জেএমপি মানদণ্ড একাধিক পরিবার কর্তৃক একটি পায়খানার ভাগে ব্যবহারকে বিবেচনায় নেয় না, যেখানে বাংলাদেশ উন্নত মানদণ্ড স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকে বিবেচনায় নেয়, যা এক বা সর্বোচ্চ দুটি পরিবার কর্তৃক ভাগে ব্যবহৃত হতে পারে।

সারণি ২.৩: স্যানিটেশন কভারেজ নিরূপণে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের মানদণ্ডের সংজ্ঞা

বাংলাদেশ মৌলিক মানদণ্ড	বাংলাদেশ উন্নত মানদণ্ড	জেএমপি মানদণ্ড
২০১৩ সনের মধ্যে সকলের জন্য স্যানিটেশন সেবা প্রদানের সরকারি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অন্ততঃপক্ষে নিম্নবর্ণিত স্যানিটেশন সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্য অর্জন করা।	জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০০৫তে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অন্ততঃপক্ষে নিম্নবর্ণিত স্যানিটেশন সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্য অর্জন করা।	জেএমপি মানদণ্ডের ভিত্তিতে নির্ধারিতএমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অন্ততঃপক্ষে নিম্নবর্ণিত স্যানিটেশন সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্য অর্জন করা।
নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগত বা ভাগে ব্যবহৃত	নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগত বা সর্বোচ্চ দুটি	নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত

পায়খানার ধরণ: • পাইপসম্বলিত স্যুয়ার পদ্ধতি বা সেপটিক ট্যাংকের সাথে সংযুক্ত ফ্লাশ এবং পউর ফ্লাশ পায়খানা • স্লাব ও লিড বা ফ্ল্যাপসহ জলাবদ্ধ গর্ত পায়খানা • স্লাবসহ কিন্তু জলাবদ্ধ, লিড বা ফ্ল্যাপছাড়া গর্ত পায়খানা • বায়ু-নির্গমণ পাইপসহ উন্নত গর্ত পায়খানা • কম্পোস্টিং ল্যাট্রিন/পায়খানা	পরিবার কর্তৃক ভাগে ব্যবহৃত পায়খানার ধরণ: • পাইপসম্বলিত স্যুয়ার পদ্ধতি বা সেপটিক ট্যাংকের সাথে সংযুক্ত ফ্লাশ এবং পউর ফ্লাশ পায়খানা • স্লাব ও লিড বা ফ্ল্যাপসহ জলাবদ্ধ গর্ত পায়খানা • বায়ু-নির্গমণ পাইপসহ উন্নত গর্ত পায়খানা • কম্পোস্টিং ল্যাট্রিন/পায়খানা	পায়খানার ধরণ: • পাইপসম্বলিত স্যুয়ার পদ্ধতি বা সেপটিক ট্যাংকের সাথে সংযুক্ত ফ্লাশ এবং পউর ফ্লাশ পায়খানা • স্লাব ও লিড বা ফ্ল্যাপসহ জলাবদ্ধ গর্ত পায়খানা • স্লাবসহ কিন্তু জলাবদ্ধ, লিড বা ফ্ল্যাপছাড়া গর্ত পায়খানা • বায়ু-নির্গমণ পাইপসহ উন্নত গর্ত পায়খানা • কম্পোস্টিং ল্যাট্রিন/পায়খানা

২.২.৩ স্যানিটেশন কভারেজের সার-সংক্ষেপ

এমআইসিএস ২০০৯ প্রতিবেদনে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে এবং ২০০৯ সনের স্যানিটেশন কভারেজের তিনটি সংজ্ঞা অনুযায়ী বিভিন্ন এলাকার জন্য পৃথককৃত জাতীয় স্যানিটেশন কভারেজ সারণি ২.৪ তে উপস্থাপিত হলো। একই সারণিতে ২০০৩ সনের স্যানিটেশন পরিস্থিতিও অন্তর্ভুক্ত আছে।

সারণি ২.৪: স্যানিটেশন কভারেজের সার-সংক্ষেপ

এলাকা	**২০০৩ সনের ভিত্তিমূল পরিস্থিতি**		**২০০৯ সনের স্যানিটেশন কভারেজের শতকরা হার (%)**		
	মোট খানার সংখ্যা	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী খানার হার (মৌলিক মানদণ্ড)	বাংলাদেশ মৌলিক মানদণ্ড	বাংলাদেশ উন্নত মানদণ্ড	জেএমপি মানদণ্ড
নগর	৩,০৬৭,৭৬১	৬০.০	৮৬.৪	৫৮.০	৫৩.৫
সিটি কর্পোরেশনসমূহ	১,২১৬,৪২৪	৬৯.৯	৮৭.৬	৬০.২	৫৩.৩
পৌরসভাসমূহ	১,৮৫১,৩৩৭	৫৩.১	৮৫.৮	৫৭.৫	৫৪.৭
গ্রামীণ	১৮,৩২৬,৩৩২	২৮.৮	৭৮.৯	৪৯.৯	৫৪.৩
জাতীয়	**২১,৩৯৪,০৯৩**	**৩৩.২**	**৮০.৪**	**৫১.৫**	**৫৪.১**

বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে নগর ও গ্রামীণ স্যানিটেশন কভারেজের বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত ব্যাখ্যা পুনরায় নিচের অনুচ্ছেদে উপস্থাপিত।

মৌলিক স্যানিটেশন মানদণ্ড বিবেচনায় স্যানিটেশন কভারেজ উচ্চ পর্যায়ের, কিন্তু উন্নত বা স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন মানদণ্ড বিবেচনা করা হলে সেটি কমে যায়। মৌলিক স্যানিটেশন মানদণ্ড অনুযায়ী ২০০৯ সনের জাতীয় স্যানিটেশন কভারেজ প্রায় ৮০.৪ শতাংশ, কিন্তু বাংলাদেশ উন্নত মানদণ্ড ও জেএমপি মানদণ্ড বিবেচনায় ঐ হার কমে যথাক্রমে ৫২.৫ শতাংশ ও ৫৪.১ শতাংশে দাঁড়ায়। মৌলিক স্যানিটেশন মানদণ্ড অনুযায়ী ২০০৩ থেকে ২০০৯ সনের মধ্যে জাতীয় স্যানিটেশন কভারেজের তারতম্য নিচের চিত্র ২.১ এ প্রদর্শিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, একটি পরিস্কার উন্নতি ঘটেছে মৌলিক স্যানিটেশন কভারেজের বেলায়, শতকরা হিসাবে তা ৩৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮০.৪ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। একই সাথে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের প্রবণতা দারুণভাবে কমে গেছে, শতকরা হিসাবে তা ৪২ শতাংশ থেকে মাত্র ৫.৭ শতাংশে নেমে এসেছে।

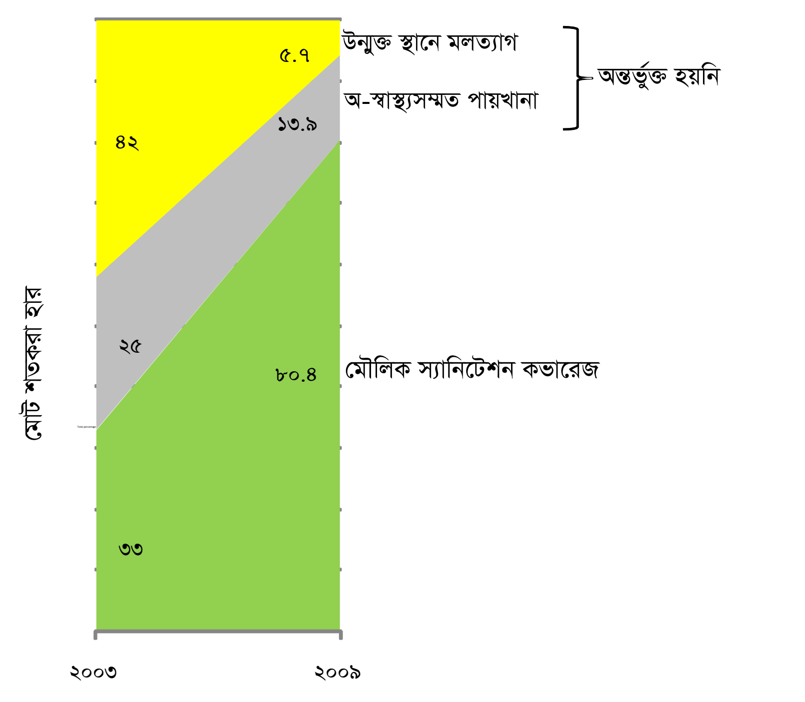

চিত্র ২.১: ২০০৩ ও ২০০৯ সনের জাতীয় স্যানিটেশন কভারেজ

২.৩ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন উপখাতসমূহ

নগর ও গ্রামীণ এলাকার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য থাকার কারণে এসডিপিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতকে দুটি উপখাতে বিভক্ত করা হয়েছে:

- নগর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সাব-সেক্টর বা উপখাত; এবং
- গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সাব-সেক্টর বা উপখাত।

পরবর্তী অনুচ্ছেদে দুটি সাব-সেক্টরকে পুনরায় কয়েকটি বৃহত্তর ক্যাটেগরিতে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। উভয় সাব-সেক্টরের বেলাতেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর বিশেষ জোড় দেওয়া হয়েছে, কেননা এলাকাটি দেশের অন্যান্য অংশ থেকে ভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।

২.৩.১ গ্রামীণ ও নগর জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) কর্তৃক ২০২৫ সন পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ চিত্র ২.২ তে উপস্থাপিত হলো। পৃথকভাবে নগর ও গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ করেছে পরিকল্পনা কমিশন, সেটি পর্যালোচনা করেছে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (UDD) ও জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT), এবং এরই ভিত্তিতে পুনরায় নগর ও গ্রামীণ এলাকার জনসংখ্যা প্রক্ষেপণের কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। প্রক্ষেপণ অনুযায়ী আশা করা হচ্ছে, ২০১৫ সনের পর থেকে গ্রামীণ জনসংখ্যা স্থিতিশীল হবে এবং ২০২৫ সনের পর থেকে প্রবৃদ্ধি কমতে থাকবে। অপরদিকে, নগর জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটবে, যার কারণ হলো মানুষের মধ্যে গ্রাম থেকে শহরে ক্রমবর্ধমান অভিবাসন প্রবণতা ও গ্রামীণ এলাকার ক্রম-নগরায়ন। প্রক্ষেপণ অনুসারে, ২০১৫, ২০২০ ও ২০২৫ সনে দেশের মোট জনসংখ্যা যথাক্রমে ১৬২ মিলিয়ন, ১৭২ মিলিয়ন ও ১৮৩ মিলিয়নে দাঁড়াবে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের (সুনির্দিষ্টভাবে নগর ও গ্রামীণ এলাকার) ভবিষ্যত উন্নয়ন চাহিদা বিশ্লেষণ ও নিরূপণের উদ্দেশ্যে এসকল প্রক্ষেপণ এসডিপিতে ব্যবহৃত হয়েছে।

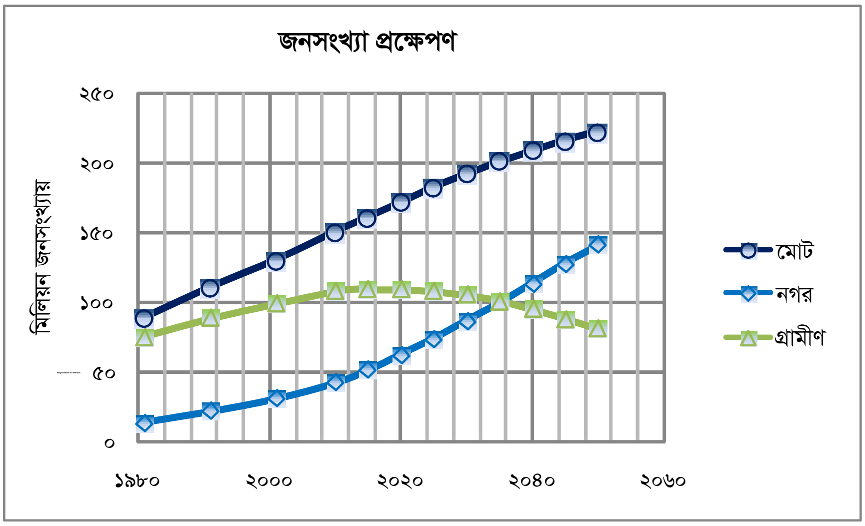

চিত্র ২.২: জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ

২.৪ নগর উপখাত বা সাব-সেক্টর

বাংলাদেশে ২০০৯ সনে সিটি কর্পোরেশন[১৪] ছিল ৬টি এবং পৌরসভার সংখ্যা ছিল ৩০৮টি। এসকল সিটি কর্পোরেশনের ভিতরে তিনটি বড় নগরী যেমন: ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় তিনটি পৃথক ওয়াসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। রাজশাহী সিটিতেও ওয়াসা প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। ওয়াসা নেই এমন সিটি কর্পোরেশন ও ৩০৮টি পৌরসভা নিজেরাই তাদের স্ব-স্ব পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাসুবিধার ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

২.৪.১ নগর সেবাদান ব্যবস্থা

নগর এলাকার বৃহত্তর কয়েকটি সেবাদান পদ্ধতির বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপিত হলো। এসকল পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা অধ্যায় ৫-এ বিস্তারিত বর্ণিত আছে।

ওয়াসাসমূহ: ওয়াসা হলো বৃহৎ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, যারা সেবা পদ্ধতিগুলো পরিচালনা করে, প্রদত্ত সেবার রাজস্ব আদায় করে ও একইসাথে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে ওয়াসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৬৩ সনে। সম্প্রতি, ২০০৮ সনের মে মাসে খুলনায় ওয়াসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এটি এখনও তার সাংগঠনিক উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অধীন পানি ও স্যানিটেশন শাখার জনবল ও তাদের কর্মকাণ্ড অতি সম্প্রতি ওয়াসার কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ: নগরভিত্তিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, যেমন: সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ পানি সরবরাহ পদ্ধতিগুলোর পরিচালনা ও সংরক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। নতুন পানি সরবরাহ পদ্ধতি নির্মাণ ও মোটাদাগের পুনর্বাসন কর্মসূচিগুলো প্রাথমিকভাবে ডিপিএইচই বাস্তবায়ন করে থাকে। নির্মাণ কাজ শেষে ডিপিএইচই এগুলো পরিচালনা ও সংরক্ষণের জন্য সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার কাছে হস্তান্তর করে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত পাইপবাহিত পানি সরবরাহ পদ্ধতির ক্ষুদ্র সম্প্রসারণের কাজ, নলকূপ ও অন্যান্য পানির উৎস বিতরণ এবং নিম্ন-আয়ভুক্ত জনগোষ্ঠীতে স্যানিটেশন সেবা প্রদান করে থাকে।

ক্ষুদ্র-পরিসরের সেবা প্রদানকারী: বর্তমানে মূলত এগুলো হলো এনজিও, যারা নিম্ন-আয়ের জনগোষ্ঠীতে পাইপবাহিত পানি সরবরাহ পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত ক্ষুদ্র পানির উৎসসমূহ পরিচালনা করে থাকে। বিলিং এর জন্য নিয়োগকৃত

[১৪] সম্প্রতি রংপুর শহরকেও দেশের ৭ম সিটি কর্পোরেশন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

কেবলমাত্র কতিপয় সেবা-চুক্তিভুক্ত সংস্থা ছাড়া (বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বিষয়ে অনুচ্ছেদ ৩.৯.১-তে অধিক বর্ণনা সংযোজিত আছে) পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বর্তমানে কোন আনুষ্ঠানিক বেসরকারি উদ্যোক্তা নাই।

বেসরকারি ব্যক্তি: সরকারি পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ও স্যুয়ারেজ সেবাব্যবস্থার পাশাপাশি বেসরকারিভাবে ব্যক্তিগত (খানা/বসতবাড়ি) নলকূপ স্থাপিত হয়ে থাকে। তবে স্যানিটেশন সেবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবস্থিত ।

এনজিও: এরা মূলত নিম্ন-আয়ের জনগোষ্ঠীতে নলকূপ, অন্যান্য পানির উৎস, কমিউনিটি পায়খানা ও একক পরিবারে ব্যবহার্য্য গর্ত পায়খানা বিতরণ করে।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন এবং শহরের আকারের ভিত্তিতে নগর উপখাতকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে:

- ওয়াসাসহ নগর (সিটি) এলাকা; এবং
- সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ।

উপর্যুক্ত দুটি ক্যাটেগরির এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পরিস্থিতির বিস্তারিত বর্ণনা নিচে উপস্থাপিত হলো।

২.৪.২ ওয়াসাসহ নগর (city including WASAs) এলাকার পরিস্থিতি

পানি সরবরাহ

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী, চট্টগ্রাম বন্দর-নগরী ও খুলনাকে বলা হয় শিল্প-নগরী। এসকল নগরী, সুনির্দিষ্টভাবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম উচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ও বিকাশমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এবং এসবের কারণে নগরীগুলোর জায়গা-জমি, অবকাঠামো ও পরিবেশের উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রচুর সু-উচ্চ ভবন তৈরি হচ্ছে, সেখানে অবস্থিত বড় বড় অফিসে অত্যধিক পরিমাণ পানি সরবরাহ করতে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন সংযোগ দিতে হচ্ছে। এরূপ উন্নয়ন ইতোমধ্যেই চাপে ন্যূজ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার ওপর কঠিনতর চাপ সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে স্যুয়ারেজ পদ্ধতির মত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তণে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, জায়গার অভাব, ভূ-প্রাকৃতিক সমস্যা (চট্টগ্রাম ব্যতীত) ও প্রচণ্ড যানবাহনের চাপের কারণে বেশ দুরূহ ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ। অধিকন্তু, বিনিয়োগ এবং পরিচালনা ও সংরক্ষণের দিক থেকে স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা ব্যয়বহুল। সিটি কর্পোরেশন এলাকাসমূহের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৫ শতাংশই বসবাস করে বস্তিতে, এবং তাও আবার সেখানকার মোট ভূমি এলাকার মাত্র ৪ শতাংশ জায়গায়[১৫]।

উপর্যুক্ত কারণে সকল নগরীতেই পানি সরবরাহের সংকট বিরাজমান। পানি সরবরাহের মূল উৎসই হলো ভূ-গর্ভস্থ পানি। যে পানির স্তর নগরবাসীর পানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটায় সেটিই ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে পড়ছে। ফলে ভবিষ্যতে নতুন উৎস অনেকটা ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি-নির্ভর হয়ে পড়বে, যার জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের তুলনায় অনেক বেশি বিনিয়োগ দরকার হবে। এসডিপি তৈরির সময় বড় বড় ছয়টি মেট্রোপলিটন শহরের ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ- পৃষ্ঠস্থ পানির সম্ভাব্য প্রাপ্যতা বিষয়ে একটি যাচাই সম্পন্ন হয়েছে।

ওয়াসা কাজ করছে - এমন নগরীগুলোর পানি সরবরাহ পরিস্থিতি সারণি ২.৫-এ উপস্থাপিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, কেবলমাত্র ঢাকা নগরীতেই তুলনামূলকভাবে পানি সরবরাহের উচ্চ কভারেজ (৮৩ শতাংশ) রয়েছে, অথচ চট্টগ্রাম ও

---

[১৫] স্লামস্ অব বাংলাদেশ: ম্যাপিং এ্যান্ড সেনসাস ২০০৫, নগর গবেষণা কেন্দ্র (সিইউএস) বাংলাদেশ; নিপোর্ট বাংলাদেশ, মিজারস্ ইভ্যালুয়েশন অব ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলিনা এ্যাট চ্যাপেল হিল এ্যান্ড ইউএসএআইডি, মে ২০০৬

খুলনা নগরীতে কভারেজের এই হার অনেক কম, যথাক্রমে ৪১ শতাংশ ও ৪৫ শতাংশ। একমাত্র খুলনা ব্যতিরেকে যেখানে প্রায় ১০,০০০ হস্তচালিত নলকূপ রয়েছে, অন্যান্য দুটি বড় নগরীতে পানির উৎসের পরিমাণ নগণ্য। সেখানে অনেক মানুষ নদী ও পুকুরের দূষিত পানি ব্যবহার করে অথবা অনেক দূর থেকে সংগ্রহ করে ব্যবহার করে। উচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ এসকল নগরীতে (খুলনা নগরী ব্যতিত, যেখানে গভীর নলকূপ উপযোগী) হস্তচালিত নলকূপের মত পানির উৎস যথোপযুক্ত, কেননা সেগুলো কম ক্ষমতাসম্পন্ন এবং অগভীর স্তর থেকে পানি উত্তোলনে ব্যবহৃত হয় এবং এই পানির স্তরটি নগরীতে ঘনস্থাপিত সেপটিক ট্যাংক ও গর্ত পায়খানার কারণে সহজেই দূষিত হওয়ার ঝুঁকি বহন করে। একারণেই বড় বড় নগরীগুলোকে পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করতে হয়।

সারণি ২.৫: ওয়াসাভুক্ত শহরগুলোর পানি সরবরাহ পরিস্থিতি

ওয়াসা	২০১০ সনে প্রাক্কলিত জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	দৈনিক পানি উৎপাদন (ঘনমিটার)	ভূগর্ভস্থ পানির উৎস (উৎপাদন নলকুপ সংখ্যা)	ভূ- পৃষ্ঠস্থ পানির উৎস (ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সংখ্যা)	পাইপ লাইন (কিমি)	গৃহস্থালী সংযোগ (সংখ্যা)	সরবরাহ ঘন্টা	পাইপবাহিত সরবরাহের মাধ্যমে উন্নত কভারেজ (%)	পাইপবাহিত ও পয়েন্ট-সোর্স এর মাধ্যমে মৌলিক কভারেজ (%)
ঢাকা	১০.২৯	১,৯২০,০০০	৫০১	৪	২,৫৩৩	২৬৬,৫৫৫	২২	৮৩	৮৮
চট্টগ্রাম	৩.৩১	২০০,০০০	৭৩	১	৫৫৬	৪৬,২৯৯	১২	৪১	৪৬
খুলনা	১.২৬	৩৫,০০০	৫৬	-	২২৭	১৫,৩০০	১২	৪৫	৮৫
মোট	**১৪.৮৬**	**২,১৫৫,০০০**	**৬৩০**	**৫**	**৩,৩১৬**	**৩২৮,১৫৪**	**১২-২২**	**৭২**	**৮০**

সূত্র: ওয়াসাসমূহ কর্তৃক প্রণীত স্ট্যাটাস রিপোর্ট ২০০৯

পানি সরবরাহ পদ্ধতিগুলোর পরিচালনা ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়, যেটি প্রতিভাত হচ্ছে উচ্চহারে পানি হারানোর (high water loss) মাধ্যমে অথবা কারিগরীভাবে যাকে হিসাব-বহির্ভূত পানি (unaccounted for water) অভিহিত করা হয়। ঢাকা নগরীতে হিসাব বহির্ভূত পানির পরিমাণ প্রায় ৩৫-৪০ শতাংশ; চট্টগ্রাম ও খুলনাতেও পরিমাণটি প্রায় একই রকম বলে ধারণা। সরবরাহ পদ্ধতিগুলোর নিয়মিত সংস্কার সঠিকভাবে করা হয় না, যার ফলে পাইপলাইনে অতিমাত্রায় ছিদ্র হয় এবং পাইপ, উৎপাদন কূপ ও যন্ত্রপাতির অকাল অবক্ষয় ঘটে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের অধিকাংশ পানির সংযোগেই মিটার সংযুক্ত আছে, কিন্তু খুলনাতে কোন মিটার ব্যবস্থা নাই। কোন ওয়াসাই সারা সপ্তাহ ২৪ ঘন্টা পানি সরবরাহ করতে সক্ষম নয়। ঢাকা ওয়াসা সর্বোচ্চ দৈনিক প্রায় ২২ ঘন্টা সরবরাহ করে, কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে সেখানে ভয়াবহ পানি-সংকট দেখা দেয়। পানি-সংকটের বিষয়টি মারাত্মক আকার ধারণ করে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার কারণে। অন্য দুটি ওয়াসা দৈনিক সর্বোচ্চ ১২ ঘন্ট সরবরাহ করতে পারে এবং সেখানেও একই ধরণের সংকট বিদ্যমান। ঢাকা ওয়াসা তার বিনিয়োগ ব্যয়ের একটি সামান্য অংশই পুনরুদ্ধার করতে পারে, যেখানে চট্টগ্রাম ও খুলনা ওয়াসা বড়জোর পদ্ধতি পরিচালনা ও সংরক্ষণ ব্যয় পুনরুদ্ধারে সক্ষম।

স্যানিটেশন

ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য নগরীতে প্রচলিত স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা অনুপস্থিত। ঢাকার মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৫ শতাংশ একটি স্যুয়ার নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত, বাঁকীরা অন্যান্য অনসাইট স্যানিটেশন পদ্ধতি যেমন: সেপটিক ট্যাংক, গর্ত পায়খানা, অস্বাস্থ্যকর পায়খানা ব্যবহার করে অথবা কোন ধরণের পায়খানা-ই ব্যবহার করে না। ঢাকার স্যুয়ার নেটওয়ার্ক থেকে যে পরিমাণ পয়ঃবর্জ্য জমে তা একটিমাত্র পরিশোধন কেন্দ্রের (পাগলায় অবস্থিত) বর্জ্য পরিশোধন করার বিদ্যমান ক্ষমতার প্রায় তিনগুণ বেশি। একারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিশোধন কেন্দ্রকে এড়িয়ে যাওয়া হয় এবং জমাট পয়ঃবর্জ্যের অধিকাংশই অপরিশোধিত অবস্থায় সরাসরি নদীতে অবমুক্ত করা হয়। বৃহত্তম নগরীগুলোর সু-উচ্চ ভবনসহ অনেক দালান-কোঠায় কোন ধরণের স্যানিটেশন পদ্ধতিই সংযুক্ত নাই অথবা তাদের সেপটিক ট্যাংকগুলো থেকে পয়ঃবর্জ্য উপচে পড়ে এবং বর্জ্য সরাসরি নিকটস্থ লেক, খাল ও নদীতে গিয়ে পড়ে। ফলে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় মারাত্মক পরিবেশ দূষণ ঘটে ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দেয়। নগরীর বস্তিগুলোর স্যানিটারি পরিস্থিতি অবর্ণনীয়,

যাদের মাত্র ৮ থেকে ১২ শতাংশের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে। অধিকাংশ বস্তিবাসীর মলত্যাগের জন্য নর্দমা, মুক্ত স্থান, রাস্তার ধার কিম্বা নদীতীর ভিন্ন অন্য কোন ব্যবস্থা-ই নাই।

এমআইসিএস প্রতিবেদনে তিনটি নগরীর জন্য পৃথকভাবে প্রণীত কোন তথ্যের অনুপস্থিতিতে কেবলমাত্র ছয়টি সিটি কর্পোরেশনের গড় হিসাব সারণি ২.৬ এ উপস্থাপিত হলো। একই সারণিতে জাতীয় স্যানিটেশন সেক্রেটারিয়েট সূত্রে প্রাপ্ত তিনটি নগরীর স্যানিটেশন পরিস্থিতিও অন্তর্ভুক্ত আছে।

সারণি ২.৬: ওয়াসাভুক্ত শহরগুলোর স্যানিটেশন পরিস্থিতি

ওয়াসা	২০০৩ সনের ভিত্তিমূল পরিস্থিতি		স্যানিটেশন কভারেজের শতকরা হার (স্যানিটেশন সেক্রেটারিয়েট ২০০৯* অনুযায়ী)	স্যানিটেশন কভারেজের শতকরা হার (এমআইসিএস ২০০৯ সূত্রে হিসাবকৃত তথ্য)**		
	মোট খানার সংখ্যা	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী খানার শতকরা হার		মৌলিক মানদণ্ড	উন্নত মানদণ্ড	জেএমপি মানদণ্ড
ঢাকা	৬৬৯,৭৬৭	৮১.৬	৮৪.৬	হ.ধ.	হ.ধ.	হ.ধ.
চট্টগ্রাম	৩১০,৬৯৮	৫১.১	৮৭.৪	হ.ধ.	হ.ধ	হ.ধ.
খুলনা	৯২,২১৪	৫৭.৮	৭০.০	হ.ধ.	হ.ধ.	হ.ধ.
মোট	**১,০৭২,৬৭৯**	**৭১%**	**৮৪.০**	**৮৭.৬**	**৬০.২**	**৫৩.৩**

* *ন্যাশনাল স্যানিটেশন সেক্রেটারিয়েট, ডিপিএইচই, স্ট্যাটাস রিপোর্ট, জুন ২০০৯*
** *৬টি সিটি কর্পোরেশনের কভারেজ গড়*

ওয়াসাগুলোর জন্য অংশীদারিত্বমূলক কাঠামো চুক্তি

ওয়াসাগুলোকে সুদক্ষ সংস্থায় উন্নীত করতে সরকার সেগুলোকে উচ্চ-অগ্রাধিকারভুক্ত গণ্য করে এবং এজন্য উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে তিনটি ওয়াসার জন্য একটি অংশীদারিত্বমূলক কাঠামো চুক্তিতে[১৬] (partnership framework agreement) উপণীত হয়েছে। চুক্তিটির উদ্দেশ্য হলো পুনর্গঠন সমস্যাগুলো সমাধান করা এবং পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, ড্রেইনেজ ও বর্জ্য পানি অপসারণ সেবা উন্নত ও সম্প্রসারিত করা। কাঠামো চুক্তির অধীন কৌশলসমূহ হলোঃ ১) সুশাসন ও সাংগঠনিক উন্নয়ন, ২) আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, ও ৩) সেবা প্রদানের সামগ্রিক ব্যবস্থার উন্নতিবিধান ও সম্প্রসারণ। কৌশলগুলোর সমর্থনে একটি নীতি কাঠামোও (policy matrix) প্রণীত হয়েছে, যার মাধ্যমে মূল কার্যক্রম, পুনর্গঠন লক্ষ্য নির্ধারণ, চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের মাইলফলক নির্ধারণ এবং সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের তরফ থেকে বিনিয়োগ বিষয়ে একটি ঐকমত্য সৃষ্টি হয়। চুক্তির ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রকৌশল নকশা প্রণয়ন, সামর্থ্য বৃদ্ধি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সমীক্ষা উদ্যোগ এবং অবকাঠামো পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণে বিনিয়োগসহ অনেক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

২.৪.৩ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর পরিস্থিতি

পানি সরবরাহ

ছয়টি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে ওয়াসা কাজ করে তিনটিতে এবং অন্য তিনটি নগরী হলো রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট। ওয়াসাভুক্ত তিনটি নগরীর ন্যায় অন্যান্য নগরীতেও ভূ-গর্ভস্থ পানিই হলো খাবার পানির প্রধান উৎস এবং সেখানে ভবিষ্যতে ভূ- পৃষ্ঠস্থ পানিই হতে যাচ্ছে অন্যতম প্রধান উৎস। সিটি কর্পোরেশন তিনটির বিদ্যমান পরিস্থিতি সারণি ২.৭-এ বর্ণিত আছে। পাইপবাহিত পানি সরবরাহ কভারেজ রাজশাহীতে ৭৩ শতাংশ, কিন্তু সিলেট ও বরিশালে তা বেশ কম - প্রত্যেকটিতে মাত্র ৪০ শতাংশ। তিনটি সিটি কর্পোরেশনেই দৈনিক পানি সরবরাহ করা হয় ১২ ঘণ্টার

[১৬]বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের (এডিবি, ডানিডা, জাপান সরকার, কোরীয় সরকার ও বিশ্বব্যাংক) মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ওয়াসার জন্য অংশীদারিত্বমূলক কাঠামো চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে ২০০৭ সনে এবং খুলনা ওয়াসাকে সম্পৃক্ত করতে ২০০৯ সনে চুক্তিটি সংশোধিত হয়েছে।

মত। পাইপবাহিত সরবরাহ পদ্ধতির পাশাপাশি রাজশাহী ও বরিশালে যথাক্রমে ৬,৫০০ ও ১,৭০০ হস্তচালিত নলকূপ রয়েছে। উপযোগী পানিস্তরের অনুপস্থিতিতে সিলেট নগরীতে হস্তচালিত নলকূপের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

সারণি ২.৭: তিনটি সিটি কর্পোরেশনের পানি সরবরাহ পরিস্থিতি

সিটি কর্পোরেশন	প্রাক্কলিত জনসংখ্যা, ২০০৯ সন (মিলিয়ন)	দৈনিক পানি উৎপাদন (ঘনমিটার)	ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎস (উৎপাদন নলকুপ সংখ্যা)	ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির উৎস (ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সংখ্যা)	পাইপ লাইন (কিমি)	গৃহস্থালী সংযোগ (সংখ্যা)	সরবরাহ ঘণ্টা	পাইপবাহিত সরবরাহের মাধ্যমে উন্নত কভারেজ (%)	পাইপবাহিত ও পয়েন্ট-সোর্স এর মাধ্যমে মৌলিক কভারেজ (%)
রাজশাহী	০.৬১	৭৫,১৯০	৪৯	১	৫১২	২৬,০০০	১২	৭৩	৮৪
সিলেট	০.৪২	১৬,৮৯০	১৮	১	১৪৫	৯,৮৯২	১২	৪০	৬৯
বরিশাল	০.৩০	১০,৭২১	১৮	-	১৬৫	৯,৮৫২	১২	৪০	৪৫
মোট	**১.৩৩**	**১০২,৮০১**	**৮৫**	**২**	**৮২২**	**৪৫,৭৪৪**	**১২**	**৬১**	**৭৫**

সূত্র: সিটি কর্পোরেশনসমূহের স্ট্যাটাস রিপোর্ট, জুন ২০০৯

সর্বমোট ৩০৮টি পৌরসভার মধ্যে ১০২টি পৌরসভায় পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে এবং বাঁকী ৫৮টিতে বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। যেসকল পৌরসভায় পাইপবাহিত পানি সরবরাহ নাই সেখানে হস্তচালিত নলকূপ ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ৩১টি বৃহত্তর পৌরসভার প্রত্যেকটিতে জনসংখ্যা এক মিলিয়নেরও বেশি এবং মাঝারী ও ক্ষুদ্র পৌরসভাগুলোর জনসংখ্যা গড়ে ৩০,০০০ কিম্বা তার কিছু বেশি। পাইপবাহিত পানি সরবরাহভুক্ত পৌরসভাগুলোর একটি চিত্র সারণি ২.৮-এ প্রদর্শিত হয়েছে।

পৌরসভাগুলোর পাইপবাহিত পানি সরবরাহ পদ্ধতি সীমিত জনসংখ্যাকে (৪০ শতাংশ) কভার করে, যার অধিকাংশই বসবাস করে শহরের কেন্দ্রস্থলে। তবে কভারেজের বিষয়টি পৌরসভা থেকে পৌরসভাতে ভিন্ন হয়ে থাকে, এর মাত্রা প্রায় শুন্য থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। দৈনিক সরবরাহ ঘণ্টা ২ থেকে ১২ এবং গড় পানি সরবরাহের পরিমাণ মাথাপিছু দৈনিক ৭৫ লিটার। প্রাক্কলিত প্রায় ৪০ শতাংশ হিসাব বহির্ভুত পানি বাদ দিলে পাইপবাহিত সরবরাহ ব্যবস্থা থেকে পৌরবাসীর পানি প্রাপ্তির নেট পরিমাণ দাঁড়ায় মাথাপিছু দৈনিক ৪৫ লিটারে। অপরদিকে, অপর্যাপ্ত সংযোগ ও সরবরাহ লাইনের কারণে অনেক পৌরসভায় বিদ্যমান পানি সরবরাহ পদ্ধতির পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার সম্ভব হয় না।

যেসমস্ত এলাকায় পাইপবাহিত সরবরাহ নেই সেখানকার মানুষ হস্তচালিত নলকূপ ব্যবহার করে। যেমনটা আগে বলা হয়েছে, এমনকি পানির লাইন-সংযুক্ত অনেক বাসাবাড়িতেও নলকূপ ব্যবহৃত হয়। কেননা লাইনে অনিয়মিত সরবরাহ থাকার ফলে গ্রহিতা ব্যবস্থাটির ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারে না। দেশের সকল পৌরসভায় প্রায় ১৫২,০০৭টি হস্তচালিত নলকূপ রয়েছে। পাইপবাহিত ও নলকূপ উভয়ের মাধ্যমে সরবরাহ কভারেজের হিসাব করলে এর পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৮৫ শতাংশে।

সারণি ২.৮: পৌরসভাসমূহে পাইপবাহিত পানি সরবরাহ পরিস্থিতি

বিষয়	**পরিমাণ**
পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা-সংযুক্ত পৌরসভার সংখ্যা	১০২
২০০৯ সনে ১০২ টি পৌরসভার মোট জনসংখ্যা	৭.৯৩ মিলিয়ন
মোট উৎপাদিত পানি	২৩৮,৫৪২ ঘনমিটার/ প্রতিদিন
মোট হস্তচালিত নলকূপের সংখ্যা	১৫২,০৭৭
মোট গৃহসংযোগের সংখ্যা	১৭৫,৫৩২

রাস্তায় স্থাপিত মোট গণকলের (স্ট্রিট হাইড্রেন্ট) সংখ্যা	৩,৩৫৫
গড় সরবরাহ ঘন্টা	২-১২ ঘন্টা
পাইপবাহিত পানি সরবরাহভুক্ত জনসংখ্যার হার	৪০%
পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ও হস্তচালিত নলকূপের কভারেজভুক্ত জনসংখ্যার হার	৮৫%

সূত্র: ডিপিএইচই স্ট্যাটাস রিপোর্ট, জুন ২০০৯

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটছে মূলত এড-হক ভিত্তিতে, যার অধিকাংশই উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে অর্থসহায়তা প্রাপ্তির ওপর নির্ভরশীল। সম্প্রতি ডিপিএইচই সিটি কর্পোরেশনসহ কিছু বড় ও ১৪৮টি ক্ষুদ্র পৌরসভায় (যেখানে পাইপবাহিত সরবরাহ নেই) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা অন্তর্ভুক্তির জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরিতে সহযোগিতা দিচ্ছে। বাঁকী পৌরসভাগুলোর মাস্টার প্ল্যান তৈরিরও প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে, যাতে সকল স্থানে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাব্যবস্থা একটি সুসমন্বিত উপায়ে বাস্তবায়িত হতে পারে।

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়না। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দরকার নৈমিত্তিক পদ্ধতি পরিদর্শন, লিক বা ছিদ্র অন্বেষণ ও সেগুলোর দ্রুত সংস্কার, পাইপলাইনের ফিটিংস ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির সংরক্ষণ ও প্রয়োজনীয় পুনঃস্থাপন, পাইপলাইনের নিয়মিত ফ্লাশিং (পানিতে আয়রণ ও লবণাক্ততা থাকলে এটি বেশি দরকার) এবং উৎপাদন নলকূপের পুনঃসংযোজন। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে পদ্ধতির খুব দ্রুত অবক্ষয় ঘটে এবং অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, নির্মাণ বা সংস্কার কাজ শেষ করার তিন থেকে চার বছরের মাথায় এগুলোর অধিকাংশই অকার্যকর হয়ে বা ভেঙ্গে পড়ে। দেখা যায়, অনেক উৎপাদন নলকূপ অচল রয়েছে ও পাইপলাইনে ক্রমাগত ছিদ্র হচ্ছে। সাধারণত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলো ব্লিচিং পাউডার বা ক্লোরিন দিয়ে সরবরাহকৃত পানি (ভূ-গর্ভস্থ) সংক্রমণমুক্ত করে না।

দিনের মাত্র কয়েকঘন্টা সময় পানি সরবরাহ করা হয়, এর অর্থ হলো পানি সরবরাহ না থাকলে পাইপলাইনে কোন চাপ থাকে না এবং এর ফলে ভূ-পৃষ্ঠস্থ এমনকি ড্রেইন ও স্যুয়ারেজ বা গর্ত পায়খানা ও সেপটিক ট্যাংকের ময়লা পানি ও পয়ঃবর্জ্য পাইপলাইনের ছিদ্র দিয়ে ঢুকে পড়ে এবং সরবারহকৃত পানিকে দূষিত করে। এমতাবস্থায় সরবরাহকৃত পানির মান অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ। সকল পর্যায়ে গ্রাহকসেবা কার্যক্রমও অনুপস্থিত, যাহোক, কিছু পৌরসভাতে গৃহীত প্রকল্পের মাধ্যমে এসকল সমস্যা ও গ্রাহকদের অভিযোগ গ্রহণ ও সমাধানের একটি পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে এবং এবিষয়ে পৌরসভা কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

সঠিক চাহিদা ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতি বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থাগুলো পরিচালনার প্রধান সমস্যা। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা (সামান্য কিছু পৌরসভা ব্যতীত) পর্যায়ে পানি সরবরাহে মিটারব্যবস্থা নাই। ফলে, সরবরাহকৃত পানির ব্যবহার মূল্যের ভিত্তিতে না হয়ে সরবরাহ-লভ্যতার ভিত্তিতে গণ্য। বাড়িতে পানির সংযোগে ট্যাপ বা কল না থাকা অথবা সেগুলো বন্ধ না থাকার ফলে ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রচুর পরিমাণ পানির অপচয় হয় এবং সরবরাহ সময়ে অবিরত পানি পড়তে থাকে। এমতাবস্থায় সরবরাহ সময় ও পাইপলাইনে চাপ বাড়ানো হলে ব্যবহারকারী পর্যায়ে ও ছিদ্র বা লিকেজের মাধ্যমে পানির অপচয় আরো বাড়বে। পানির যথাযথ সংরক্ষণের জন্য প্রণোদনা (incentives) কিম্বা অপব্যবহার বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহারের জন্য শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা নেই। তদ্রুপ, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সুবিধা ব্যবহারের জন্যও কোনরকম প্রণোদনা বা শাস্তির ব্যবস্থা অনুপস্থিত।

স্যানিটেশন

ঢাকা ব্যতীত দেশের অন্য কোন নগরী বা পৌরসভাতে স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা নেই। সেখানে শুধুমাত্র অন-সাইট স্যানিটেশন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোতে স্যানিটেশন কভারেজের বিদ্যমান চিত্র সারণি ২.৯-তে উপস্থাপিত হলো।

সারণি ২.৯: সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের স্যানিটেশন পরিস্থিতি

এলাকা	২০০৩ সনের ভিত্তিমূল পরিস্থিতি		স্যানিটেশন কভারেজের শতকরা হার (স্যানিটেশন সেক্রেটারিয়েট ২০০৯* অনুযায়ী)	স্যানিটেশন কভারেজের শতকরা হার (এমআইসিএস ২০০৯ সূত্রে হিসাবকৃত তথ্য)**		
	মোট খানার সংখ্যা	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী খানার শতকরা হার		বাংলাদেশ মৌলিক মানদণ্ড	বাংলাদেশ উন্নত মানদণ্ড	জেএমপি মানদণ্ড
রাজশাহী	৬৩,৯০৯	৭৭.৭	৯৭.৫	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
বরিশাল	৩৬,৭৬৩	৬১.১	৮৪.৬	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
সিলেট	৪৩,০৭৩	৪৭.১	৮৯.৮	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
তিনটি সিটি কর্পোরেশন মোট	**১৪৩,৭৪৫**	**৬৪.৫**	**৯১.৯**	**৮৭.৬**	**৬০.২**	**৫৩.৫**
সকল পৌরসভা মোট	**১,৮৫১,৩৩৭**	**৫৩.১**	**৯১.২**	**৮৫.৮**	**৫৭.৫**	**৫৪.৭**

* *ন্যাশনাল স্যানিটেশন সেক্রেটারিয়েট, ডিপিএইচই, স্ট্যাটাস রিপোর্ট, জুন ২০০৯*

** *ছয়টি সিটি কর্পোরেশনের গড়*

পৌরসভা ও জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে নিম্ন-আয়ভুক্ত জনগোষ্ঠীতে কিছু জলাবদ্ধ গর্ত পায়খানা বিতরণ করা হয়। নগর এলাকায় গর্ত পায়খানা ও সেপটিক ট্যাংকের পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশন এবং নিরাপদ অপসারণ একটি উদ্বেগজনক পরিবেশগত সমস্যা। বিদ্যমান নগর স্যানিটেশন কভারেজ গ্রামীণ এলাকার সাথে তুলনীয় হলেও উচ্চ ঘনবসতির কারণে এর নেতিবাচক প্রভাব উদ্বেগজনক। নগর এলাকায় ভবিষ্যতে অধিকতর জনবসতি এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব বাড়তে থাকলে বিশেষ করে বস্তি এলাকায় পরিবেশগত অবস্থার আরো অবনতি হবে।

২.৪.৪ নগর ড্রেইনেজ ব্যবস্থা

ভূমিকা

বিস্তৃত সমতলভূমির দেশ হওয়াতে বাংলাদেশে ড্রেইনেজ ব্যবস্থাও একটি সহজাত (inherent) সমস্যা। দ্রুত নগরায়নের সাথে সাথে বর্ধনশীল স্থাপনা গড়ে ওঠা এলাকাগুলোর কারণেও পানির প্রাকৃতিক প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। বাসাবাড়ির (রান্নাবান্না, গোসল ও ধোয়ামোছায়) ব্যবহৃত নোংরা পানি নিঃসরণের পরিমাণও নগরায়নের সাথে সমান গতিতে বাড়ছে। পয়ঃপানি ও বদ্ধ বৃষ্টির পানি নোংরা, সংক্রমণযুক্ত ও তা অনেক রকমের পরিবেশগত ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি বহন করে; যা পরিবেশবান্ধব উপায়েই অপসারিত হওয়া দরকার। পয়ঃপানি (sullage water) সরাসরি পয়ঃবর্জ্যের চেয়ে কম দূষিত হওয়ায় তা সচরাচর রাস্তার ধারে মুক্ত নর্দমায় জমা হতে দেওয়া হয় এবং তৎপরে তা নদী, খাল বা নিকটস্থ মুক্তস্থানে পতিত হয়। কেবলমাত্র ঢাকা নগরীতেই ভূ-গর্ভস্থ বৃষ্টির পানির ড্রেইনেজ পদ্ধতি রয়েছে এবং অন্যান্য শহরে মুক্ত নর্দমা বা ড্রেইনেজ ব্যবহৃত হয়।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

বিস্তৃত সমতলভূমির দেশ হওয়াতে বর্ষা মৌসুমে ভারী বৃষ্টিপাতের ঘনত্বের ফলে শহর ও নগর এলাকা প্রায়শঃই বন্যাকবলিত বা জলমগ্ন হয়। দেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ২,৫৪০ মিলিমিটার, যার ৮০ শতাংশ হয়ে থাকে মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বর্ষা মৌসুমে। নদীগুলোর পানিবহনের ক্ষমতা পলিস্তরের কারণে কমে যাচ্ছে, যার ফলে বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকায় মারাত্মক ড্রেইনেজ জট সৃষ্টি করছে। নগর এলাকায় ড্রেইনেজ পদ্ধতি নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং নগর উন্নয়নের গতির সাথে তাল মিলিয়ে এর সম্প্রসারণ সম্ভব হচ্ছে না। সমস্যাটি আরো প্রকট

আকার ধারণ করছে অনেকস্থানে প্রাকৃতিক খাল ভরাট করে অথবা খালের স্বাভাবিক প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে বাড়িঘর ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের কারণে। অধিকন্তু, যথাযথ পরিচালনা ও সংরক্ষণ এবং সিটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাস্তার ময়লা-আবর্জনা ড্রেনে ফেলার কারণে বিদ্যমান ড্রেইনেজ ব্যবস্থার পূর্ণ-সুবিধাও কাজে লাগানো যাচ্ছে না। এর সাথে যুক্ত হচ্ছে সাধারণ জনগণ কর্তৃক গৃহস্থালীর আবর্জনা ও অন্যান্য বর্জ্য যত্রতত্র অপসারণের সমস্যা।

২.৪.৫ নগর উপখাতের জন্য কর্ম-নির্দেশনা

নগর উপখাতের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্ম-নির্দেশনাসমূহ পালন করা হবে। নির্দেশনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: ক) সকল ধরণের নগর এলাকার জন্য সাধারণ কর্ম-নির্দেশনা; খ) ওয়াসাভুক্ত নগরীগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট কর্ম-নির্দেশনা; ও গ) সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট কর্ম-নির্দেশনা।

ক) সাধারণ কর্ম-নির্দেশনা

পদ্ধতি পুনর্বাসন ও উন্নতকরণ: বর্তমানে পাইপলাইনে অনেক ছিদ্র বা লিকেজ এবং যন্ত্রপাতি নষ্ট বা ব্যবহার অনুপযোগী, যার ফলে হিসাব-বহির্ভুত পানি ও পরিচালনা অদক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে পদ্ধতি পরিচালনা ও সংরক্ষণের ওপর বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক গৃহীত সাম্প্রতিক উদ্যোগটি পুনঃবাস্তবায়িত (replicated) হওয়া দরকার। বাল্ক পানির মিটার স্থাপন ও বিদ্যমান স্যুয়ারেজ ও ড্রেইনেজ ব্যবস্থার পুনর্বাসনসহ জোন-ব্যবস্থাপনা বণ্টন পদ্ধতি প্রবর্তণেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সকল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্ম-দক্ষতা মূল্যায়ন পদ্ধতি (benchmarking) প্রবর্তণের মাধ্যমে পরিচালনা ও সংরক্ষণের গুরুত্ব বাড়ানো যেতে পারে এবং এ থেকে একই রকম ভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণের সূযোগ তৈরি হতে পারে।

পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজ বৃদ্ধিকরণ: এগুলোর জন্য পরিশোধন প্ল্যান্ট ও উৎপাদন নলকূপ স্থাপন এবং পাইপ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা দরকার। সকল ধরণের পানির সংযোগে ও উৎসে অর্থাৎ উৎপাদন নলকূপ, পরিশোধন প্ল্যান্ট ও পাইপ নেটওয়ার্কের অন্যান্য কৌশলগত স্থানে মিটার স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। স্যুয়ার লাইন সম্প্রসারণ ও বর্জ্য-পানি শোধনাগারের উন্নয়ন সাধনও বিশেষ প্রয়োজন। যেসমস্ত স্থানে স্বল্পতম সময়ে স্যুয়ার লাইন নির্মাণ করা সম্ভব নয়, সেসকল স্থানে যথোপযুক্ত অনসাইট স্যানিটেশন পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে পারে। তবে এগুলোর সাথে অবশ্যই সেপটিক ট্যাংক ও গর্ত পায়খানা থেকে সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের বিকেন্দ্রীকৃত প্ল্যান্ট-এর মত নিরাপদ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও অপসারণ পদ্ধতি যুক্ত থাকতে হবে। ড্রেইনেজ কভারেজের সম্প্রসারণও অতি প্রয়োজনীয়। এধরণের সেবাব্যবস্থার সম্প্রসারণে নিম্ন-আয়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর চাহিদাকে বিশেষ বিবেচনায় নিতে হবে।

রাজস্ব আদায় দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ: দক্ষ রাজস্ব আদায়ের জন্য সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় আউটসোর্সিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে, যাদেরকে অনাদায়ী দেনার দায়ে গৃহস্থালীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

গ্রাহকসেবার উন্নয়ন: পৌরসভাগুলোতে গ্রাহকসেবা ও সম্পর্ক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। এব্যাপারে শহর পর্যায়ের সমন্বয় পরিষদের (TLCC) মত নাগরিক ফোরাম খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এমন একটি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, যেখান থেকে গ্রাহকগণ 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' পাবেন, যেমন: সেবা সম্পর্কিত অভিযোগ লিপিবদ্ধকরণ, সেগুলোর বিপরীতে গৃহীত উদ্যোগ, বিল ও নতুন সংযোগ সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান ইত্যাদি।

অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয়সাধণ: পরস্পর-সম্পর্কিত সংস্থাসমূহ, যেমন: পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) এবং পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO) ইত্যাদির মধ্যে ড্রেইনেজ ব্যবস্থাসহ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সমস্যা, উদাহরণস্বরূপ: দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বন্যা প্রতিরোধ ও নদী খনন বিষয়ে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ: পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতির পরিকল্পনায় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ড্রেইনে বর্জ্য না ফেলতে জনগণকে সচেতন করতে গণশিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

খ) ওয়াসা নির্দিষ্ট

পানির নতুন উৎস আবিষ্কার: স্থানীয়ভাবে পানির চাহিদা মেটাতে বড় বড় তিনটি নগরীর আশপাশে পানির উৎসের ও ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতার ঘাটতি শেষ সীমায় পৌঁচেছে। এখন পানির নতুন উৎস হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি অথবা দূরবর্তী স্থান থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানি সংগ্রহ করে সরবরাহ করা ভিন্ন বিকল্প পথ নাই। উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চ বিনিয়োগ দরকার। বৃষ্টির পানি ব্যবহারের সম্ভাবনাটিও সে কারণে ভেবে দেখা যেতে পারে।

ওয়াসাসমূহের জন্য সম্পাদিত অংশীদারিত্বমূলক কাঠামো চুক্তির (partnership framework agreement) বাস্তবায়ন: চুক্তিটির যথাযথ বাস্তবায়ন অগ্রাধিকারভুক্ত করতে হবে। একই চুক্তি কাঠামোর অধীনে ওয়াসাভুক্ত নগরীগুলোতে একটি আংশিক-সোয়াপ গৃহীত হতে পারে।

গ) সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা নির্দিষ্ট

সেবার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ: পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলো তাদের এখতিয়ারভুক্ত এলাকার জন্য একটি সেবার মান সংক্রান্ত চুক্তিতে উপণীত হতে পারে। এটি করতে হলে পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন ও তাদের পানি সরবরাহ শাখার মধ্যে একটি পরিস্কার কর্তৃত্ব বিভাজন করতে হবে। একই উদ্দেশ্যে সিটি কর্পোরেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়াসার সাথে আরো গভীর কর্ম-সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন হবে। সকল ক্ষেত্রেই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিশ্চিত হতে হবে যে, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রদত্ত সেবার নিরাপত্তা (safety) ও আস্থাশীলতার (reliability) জন্য সর্বদা দায়বদ্ধ বা জবাবদিহি করতে প্রস্তুত থাকবে।

চাহিদা ব্যবস্থাপনার অনুশীলন: এটি করতে হবে প্রথমেই সকল সংযোগের জন্য পানির মিটার স্থাপনের মাধ্যমে এবং তৎপরে গৃহের অভ্যন্তরে পানির অপচয়রোধ ও এর যথাযথ সংরক্ষণের মাধ্যমে।

সংযোগসংখ্যা বৃদ্ধিকরণ: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নীতিমালার নিরিখে অল্পসংখ্যক সেবার সংযোগ সবসময়ই হতাশাজনক। অনেক পৌরসভায় বিদ্যমান উৎপাদন নলকূপগুলোর পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার করা যাচ্ছে না। একটি সরবরাহ পদ্ধতির আর্থিক উপযোগিতা নিশ্চিত করতে হলে সংযোগ সংখ্যা বাড়াতে হবে, সাথে ভাল সেবা দিতে হবে, সংযোগ নিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং যেখানেই দরকার পাইপলাইন সম্প্রসারণ করতে হবে।

মূল পরিকল্পনা (master plan) প্রণয়ন: সেইসব পৌরসভার জন্য মূল-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে যাদের এরকম কোন পরিকল্পনাই নাই। এরপর অন্যান্য সংস্থা যেমন: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (UDD) ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), যারা বৃহত্তর নগর পরিকল্পনার কাজ করে থাকে, তাদের সাথে পৌরসভার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পরিকল্পনার সমন্বয় করতে হবে।

২.৫ গ্রামীণ উপখাত

২.৫.১ গ্রামীণ সেবাদান ব্যবস্থা

গ্রামীণ এলাকার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানের জন্য চালু রয়েছে তিনটি বৃহত্তর সেবাদান পদ্ধতি। এগুলো নিম্নরূপ:

সরকারি খাতের পদ্ধতি: সরকারি সংস্থাসমূহ, প্রধানত ডিপিএইচই, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। পদ্ধতি স্থাপনের জন্য তারা বেসরকারি ঠিকাদার নিয়োগ করে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো (ইউনিয়ন পরিষদ) তাদের এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে প্রাপ্ত ব্লক বরাদ্দ থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীতে বিনামূল্যে স্যানিটারি পায়খানার উপকরণ বিতরণ করে।

এনজিও খাতের পদ্ধতি: তারা নিজেরাই "সেবা প্রদানকারীর" ভূমিকায় অবতীর্ণ, অর্থাৎ জনগোষ্ঠীর সাথে নিরিড় পরামর্শ করে তারা প্রকল্প বা স্কীম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে। এধরণের প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হয় জনগোষ্ঠী নিজেরাই করে অথবা কাজটি করতে এনজিওরা বেসরকারি ঠিকাদার নিয়োগ করে।

বেসরকারি খাতের পদ্ধতি: ব্যক্তিগত বসতবাড়ি বা ক্রেতাগণ (নলকূপ ও স্যানিটেশন উপকরণ) বাজার থেকে সরাসরি কিনে এবং নিজেদের উদ্যোগেই স্থাপন করে। পন্থাটি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণিত আছে।

২.৫.২ গ্রামীণ পানি সরবরাহ পরিস্থিতি

বাংলাদেশের গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ভূ-গর্ভস্থ উৎস-নির্ভর। উৎসটি প্যাথোজেন বা ব্যাকটেরিয়া দূষণমুক্ত এবং আবাসিক ব্যবহারের জন্য উৎসটির পানি সাধারণত পরিশোধনের দরকার হয় না। খরচ, গুণগত মান ও প্রাপ্যতার দিক দিয়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি খাবার পানি হিসেবে সর্বাধিক পছন্দের উৎস বিবেচিত। নরম পাললিক মাটিতে সহজেই কূপ খনন করা যায় বলে দেশের সর্বত্র লক্ষ লক্ষ হস্তচালিত নলকূপ স্থাপিত হয়েছে।

দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের নলকূপ প্রযুক্তি নিম্নরূপ:

ক) ৬নং হস্তচালিত পাম্পসহ **অগভীর নলকূপ** হলো অতি-সাধারণ প্রযুক্তি এবং এটি উচ্চ পানির স্তর এলাকায় ব্যবহৃত হয়, যেখানে ভূমি থেকে ৬ মিটার অভ্যন্তরে পানি পাওয়া যায়। প্রযুক্তিটির দাম কম, নলকূপ-প্রতি প্রায় ২,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকা।

খ) **ডিপসেট পাম্প** (DSP) নলকূপ (সাধারণভাবে তারা বা তারা ডেভহেড নামে পরিচিত) ভূমি থেকে ৬ মিটারের বেশি গভীর পানিস্তর এলাকায় ব্যবহৃত হয়। নলকূপ প্রযুক্তিটি সর্বোচ্চ ৪০-৫০ মিটার গভীর স্তর থেকেও পানি উত্তোলনে সক্ষম। ডিপসেট নলকূপের খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি, নলকূপ-প্রতি প্রায় ২৫,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকা; এবং

গ) **গভীর নলকূপ** সাধারণত ১০০ মিটারেরও বেশি গভীর পানিস্তর থেকে পানি উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এর দাম অনেক বেশি, নলকূপ-প্রতি প্রায় ৪০,০০০ থেকে ৬০,০০০ টাকা।

যেসকল স্থানে উপযুক্ত ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর নাই, সেখানে অন্যান্য ধরণের গৃহস্থালী বা জনগোষ্ঠীভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়, যা সাধারণভাবে বিকল্প প্রযুক্তি নামে অভিহিত; কেননা সেগুলো জনপ্রিয় নলকূপ প্রযুক্তির বিকল্প হিসেবে গণ্য। বিকল্প প্রযুক্তির মধ্যে আছে: পিএসএফ, কূয়া ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি। লবণাক্ত উপকূলীয় এলাকার কিছু কিছু পকেটে অগভীর স্তর থেকে মাটিকণার মাধ্যমে পরিশোধিত (infiltrated) বৃষ্টির পানি সংগ্রহের জন্য শ্যালো শ্রাউডেড টিউবওয়েল (SST) ও ভেরি শ্যালো শ্রাউডেড টিউবওয়েল (VSST) ব্যবহৃত হয়। এসকল নলকূপ ও বিকল্প প্রযুক্তিগুলোকে একত্রে পানির উৎস (water point) অভিহিত করা হয়, কেননা এগুলো কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান বা পয়েন্ট থেকে গৃহস্থালী বা জনগোষ্ঠীতে পানি সরবরাহের কাজে ব্যবহৃত হয়।

গ্রামীণ পাইপবাহিত পানি সরবরাহ পদ্ধতি একটি নতুন প্রযুক্তি এবং এটি দেশের আর্সেনিক সংক্রমিত ও অন্যান্য সম্ভাবনাময় এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশ মূলত একটি সমতলভূমীয় ব-দ্বীপ, এর একমাত্র ব্যতিক্রম হলো পাহাড়ি এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত পার্বত্য চট্টগ্রাম। এলাকাটি দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় অংশে অবস্থিত। এখানকার পানি-ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং প্রায়ই তা এলাকাভেদে পরিবর্তিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে অগভীর, ডিপসেট নলকূপ ও কূয়ার মত অন্যান্য প্রযুক্তিও ব্যবহৃত হয়। ঝর্ণার পানি সুলভ হলে এখানে ইনফিলট্রেশন গ্যালারি (IFG) পদ্ধতিরও ব্যবহার দেখা যায়।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্ন (অনুচ্ছেদ ৩.১২-তে পুনরায় আলোচিত)।

বাংলাদেশের গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিম্নবর্ণিত তিনটি বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন:

- **আর্সেনিক সংক্রমণ:** এ শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশে পানি সরবরাহে প্রায় সার্বজনীন কভারেজ (৯০ শতাংশের অধিক) অর্জিত হয়েছিল বলে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু একই সময়ে দেখা যায় যে দেশের প্রায় ১৯ শতাংশ হস্তচালিত নলকূপের পানি আর্সেনিক সংক্রমিত। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আর্সেনিক সংক্রান্ত সমস্যাগুলো অনুচ্ছেদ ৩.৫-এ বিস্তারিত বর্ণিত আছে;

- **ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া:** দেশের অনেকস্থানে, সুনির্দিষ্টভাবে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর অত্যধিক মাত্রায় নেমে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ হলো কৃষিজমিতে সেচের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার। পানির স্তর নেমে যাওয়ার ফলে ঐ সকল এলাকায় অগভীর নলকূপে আর পানি পাওয়া যাচ্ছে না, ফলস্বরূপ বর্তমান অগভীর নলকূপ-নির্ভর গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়ার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা অনুচ্ছেদ ৩.৩-এ বর্ণিত আছে; এবং

- **দুর্গম** (hard-to-reach) **এলাকা:** দেশের দুর্গম এলাকাগুলোতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানের একটি ব্যাপক শুন্যতা বিরাজমান। এগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো।

দুর্গম এলাকা

বাংলাদেশ সমতল পাললিক ভূমির একটি দেশ এবং সাধারণত পানি সরবরাহের জন্য দেশটিতে ভূ-গর্ভস্থ পানির বিপুল ভাণ্ডার বিদ্যমান। যাহোক, ভূ-প্রাকৃতিক ও পানি-ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ যেমন: ঘন ঘন পানিতে তলিয়ে যাওয়া, পাহাড়ি এলাকা ও উপযোগী পানির উৎসের অলভ্যতা ইত্যাদির কারণে দেশের কিছু অঞ্চল দুর্গম এলাকায় পরিণত, যেখানে সহজে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদান সম্ভব নয়। বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে নারী, শিশু ও শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য কঠিন পরিস্থিতি তৈরি করে। সারণি ২.১০-এ দেশের বিভিন্ন ধরণের দুর্গম এলাকা[১৭] ও সেখানকার ইউনিয়ন সংখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে যে, মোট ইউনিয়নের প্রায় অর্ধেক এলাকাকে দুর্গম এলাকা হিসেবে গণ্য করা যায়। বিভিন্ন ধরনের দুর্গম এলাকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে উপস্থাপিত হয়েছে।

সারণি ২.১০: দুর্গম এলাকাভুক্ত ইউনিয়নের সংখ্যা

দুর্গম এলাকার ধরণ	আংশিক বা সম্পূর্ণ দুর্গম এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন সংখ্যা		
	মোট	পানি সরবরাহ সম্পর্কিত	স্যানিটেশন সম্পর্কিত
চরাঞ্চল	৭২	৭২	৭২
বিল এলাকা	৩০০	৩০০	৩০০
হাওর এলাকা	১৫৬	১৫৬	১৫৬
ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল ও দূরবর্তী দ্বীপসমূহ	১০৭	-	১০৭

[১৭] বিশ্বব্যাংকের পানি ও স্যানিটেশন কর্মসূচি কর্তৃক প্রকাশিত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার দিক থেকে বাংলাদেশের দুর্গম এলাকাসমূহের মানচিত্র (খসড়া), ২০১০ থেকে অধিকাংশ তথ্য গৃহীত। সমস্যাটির প্রভাবকে এলাকাভিত্তিক ভিন্নভাবে উপস্থাপনের স্বার্থে সামান্য কিছু তথ্য অন্য সূত্রের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে।

পাহাড়ি (পার্বত্য চট্টগ্রামসহ) অঞ্চল	৫১	৫১	৫১
বিচ্ছিন্ন এলাকাসমূহ	৫	৫	৫
পানি-দুষ্প্রাপ্য এলাকাসমূহ	১০০	১০০	-
মোটঃ	**৭৯১**	**৬৮৪**	**৬৯১**

চরাঞ্চল হলো নদী-দ্বীপ। অনুমান করা হয় যে প্রায় ৫ মিলিয়ন মানুষ চরাঞ্চলে বসবাস করে। চরাঞ্চলের মানুষ ও সেখানকার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন স্থাপনাসমূহ প্রায় সার্বক্ষণিকভাবেই বন্যা ও নদীভাঙ্গনের ঝুঁকি বহন করে।

বিল ও হাওর এলাকা মূলত পানিতে ভাসমান (swampy) ভূমি। বাংলাদেশের বিস্তৃত বন্যাকবলিত সমতল ভূমিতে বিভিন্ন আকারের হাজারো বিল রয়েছে। অধিকাংশ বৃহৎ বিলগুলোতে সারাবছর জলাবদ্ধতা থাকে। ঐসকল এলাকায় কিছু আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসহ ৫ মিলিয়নেরও অধিক মানুষ বসবাস করে। বিল এলাকার কাঁদামাটি ও আঠালো মাটি প্রচলিত গর্ত পায়খানা স্থাপনের ও ব্যবহারের জন্য মোটেই উপযোগী নয়, কেননা এখানকার মাটির পানি-শোষণ ক্ষমতা নাই বললেই চলে। বন্যা-প্লাবিত হওয়া ছাড়াও, এখানকার অধিকাংশ হস্তচালিত নলকূপ অত্যন্ত অগভীর (৩০-৬০ ফুট) থেকে অগভীর (৮০-১২০ ফুট) স্তরে স্থাপিত এবং নিকটস্থ গর্ত পায়খানা বা অন্যান্য উৎস থেকে দূষণ প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা নেই।

উপকূলীয় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ও দ্বীপসমূহ সমুদ্রের নিকটবর্তী এবং স্বাভাবিকভাবেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এলাকাটির অধিকাংশই গভীর নলকূপের উপর নির্ভরশীল। এখানকার মাটি মোটামুটিভাবে পানি-শোধনে সক্ষম এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের ফলে প্রায়ই ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ভূমিতলের পর্যায়ে উঠে আসে। এর ফলে গর্ত পায়খানাগুলো উপচে পড়ে।

পাহাড়ি এলাকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত, মূলত চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলায় অবস্থিত। এসকল এলাকার অসমতল ভূমির কারণে নলকূপ প্রযুক্তি সর্বত্রই উপযোগী নয়। পানির স্বল্প-লভ্যতার কারণে স্যানিটেশন ব্যবস্থাতেও দেখা যায় সমস্যা।

বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলোর অধিকাংশই ভারতীয় সীমানার মধ্যস্থিত বাংলাদেশি অঞ্চল, যাকে ছিটমহল বলা হয়। এসকল এলাকায় অভিগম্যতা-সংকটের কারণে সেবা প্রদান সম্ভব হয় না এবং দেশের উন্নয়ন মূলধারা থেকে তারা প্রায় বিচ্ছিন্ন-ই থেকে যায়।

পানি দুষ্প্রাপ্য এলাকাসমূহ সেগুলোই, যেখানে উপযোগী পানির উৎস অনুপস্থিত, হোক তা ভূ-গর্ভস্থ অথবা ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি। এসকল এলাকার অধিকাংশই সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও খুলনা জেলার উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় অবস্থিত। এখানকার অগভীর ও গভীর ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরসমূহ লবণাক্ত। নদীর পানিও একইসাথে দুষ্প্রাপ্য ও লবণাক্ত। পঞ্চগড়, সিলেট (জৈন্তাপুর) ও চট্টগ্রাম (সীতাকুণ্ড) জেলার কিছু কিছু এলাকাতেও পাথুরে মাটি ও অন্যান্য কারণে উপযোগী ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎস পাওয়া দুষ্কর। এসব এলাকার আশপাশেও ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির উৎস সহজপ্রাপ্য নয়।

২.৫.৩ গ্রামীণ পানি সরবরাহ কভারেজ

হস্তচালিত নলকূপের অধিকাংশই সরকারি খাত অর্থাৎ ডিপিএইচই, বেসরকারি ব্যক্তি ও এনজিওর উদ্যোগে স্থাপিত। সরকারিভাবে স্থাপিত পানির উৎসের ধরণ ও সংখ্যা সারণি ২.১১-এ উপস্থাপিত হয়েছে।

সারণি ২.১১: সরকারি পানির উৎস সংখ্যা

পানি সরবরাহ প্রযুক্তির ধরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নলকূপ:		
অগভীর নলকূপ	৮৬৭,৭১৫	৬৫.৬
ডিপ-সেট নলকূপ	১৮২,০১০	১৩.৮
গভীর নলকূপ	২৩৭,১০৪	১৭.৯
বিকল্প প্রযুক্তিসমূহ:		
এসএসটি/ভিএসএসটি	১১,৫১৯	০.৯
পাত কূয়া	২০,০৪৯	১.৫
বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি	৮৩০	০.১
পিএসফ/ইনফিলট্রেশন গ্যালারি	৪,১১১	০.৩
মোট ঃ	**১,৩২৩,৩৪০**	**১০০.০**

সূত্র: ডিপিএইচই স্ট্যাটাস রিপোর্ট, জুন ২০০৯

দেশে সর্বমোট সরকারি পানির উৎসের সংখ্যা প্রায় ১.৩ মিলিয়ন, এর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই অগভীর নলকূপ। ব্যবহারকারীদের নিজ উদ্যোগে স্থাপিত বেসরকারি নলকূপের সংখ্যা সরকারি নলকূপের সংখ্যা থেকে অনেক বেশি (বিস্তারিত অধ্যায় ৩-এ পিপিপি শিরোণামে আলোচিত)। বেসরকারি অগভীর নলকূপের সংখ্যা বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য না থাকলেও অনুমান করা হয় যে এর সংখ্যা সরকারি নলকূপের সংখ্যার প্রায় আট গুণ। বেসরকারি ডিপসেট ও গভীর নলকূপের অনুমিত সংখ্যা সরকারি পানির উৎসের প্রায় ১০ শতাংশ। এনজিও কর্তৃক সরবরাহকৃত পানির উৎস সংখ্যা সরকারি উৎসের ১০-২০ শতাংশ। প্রাক্কলন অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে সর্বমোট প্রায় ৮ মিলিয়ন অগভীর নলকূপ ও অন্যান্য ধরণের ৫০,০০০ পানির উৎস রয়েছে।

যেহেতু দেশের মোট পানির উৎসের প্রকৃত সংখ্যা নথিবদ্ধ নাই, সেক্ষেত্রে গ্রামীণ পানি সরবরাহ কভারেজ কেবলমাত্র অনুমানের ভিত্তিতেই বলা যেতে পারে। ইউনিসেফ কর্তৃক সম্পাদিত সাম্প্রতিক জরিপের (এমআইসিএস ২০০৯) ফলাফল অনুযায়ী প্রায় ৯৭.৪ শতাংশ গ্রামীণ জনসাধারণের উন্নত পানির উৎসে অভিগম্যতা রয়েছে (আর্সেনিক সংক্রমিত পানির উৎস সমন্বয় না করে) এবং প্রকৃতপক্ষে ৮৩.৮ শতাংশ গ্রামীণ জনসাধারণের নিরাপদ পানির উৎসে অভিগম্যতা আছে (আর্সেনিক সংক্রমিত পানির উৎস সমন্বয় করে)। তবে জরিপটিতে পানির উৎস ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যার ভিত্তিতে সেবার মানদণ্ড (অভিগম্যতা) বিবেচিত হয়নি।

গ্রামীণ পানি সরবরাহ কভারেজ নিরূপণের উদ্দেশ্যে দেশের সমগ্র অঞ্চলকে পানি-ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও সেসব এলাকার সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রযুক্তির ধরণের ভিত্তিতে কয়েকটি ক্যাটেগরিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এলাকাগুলো নিম্নরূপ:

- উচ্চ পানির স্তর এলাকা;
- নিম্ন পানির স্তর এলাকা;
- উপকূলীয় গভীর স্তরবিশিষ্ট এলাকা;
- আর্সেনিক সংক্রমিত এলাকা;
- দুর্গম এলাকা; এবং
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল।

এসকল ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটেগরির এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। সেখানে বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় এবং এলাকাভেদে কভারেজের ভিন্নতা রয়েছে। সর্বমোট পানির উৎস বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্যের অনুপস্থিতিতে কভারেজের পর্যায় প্রাক্কলনে বিভিন্ন রকম পদ্ধতি ও উৎসের সাহায্য নেওয়া হয়। তদানুযায়ী গ্রামীণ পানি সরবরাহ কভারেজের চিত্র সারণি ২.১২-তে উপস্থাপিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, উচ্চ পানিস্তর এলাকা ও উপকূলীয় গভীর

স্তরবিশিষ্ট এলাকা ব্যতীরেকে অন্যান্য এলাকার কভারেজ নিম্ন পর্যায়ের। মৌলিক মানদণ্ড অনুযায়ী (প্রতি ১০০ জনের জন্য একটি পানির উৎস) দেশের বর্তমান গ্রামীণ পানি সরবরাহ কভারেজ প্রায় ৭১ শতাংশ এবং উন্নত মানদণ্ড অনুযায়ী (প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি পানির উৎস) তা ৫১ শতাংশ।

সারণি ২.১২: গ্রামীণ পানি সরবরাহ কভারেজ

গ্রামীণ এলাকার ক্যাটেগরি	ক্যাটেগরিতে গ্রামীণ জনসংখ্যার হার	ক্যাটেগরিতে কভারেজের শতকরা হার		জাতীয় কভারেজের শতকরা হার	
		বাংলাদেশ মৌলিক মানদণ্ড* অনুযায়ী	বাংলাদেশ উন্নত মানদণ্ড* অনুযায়ী	বাংলাদেশ মৌলিক মানদণ্ড* অনুযায়ী	বাংলাদেশ উন্নত মানদণ্ড* অনুযায়ী
পানির উচ্চ-স্তরভুক্ত এলাকা	৩০	৯৮	৯৭	২৯.৪	২৯.১
পানির নিম্ন-স্তরভুক্ত এলাকা	২৭	৬৪	৩২	১৭.৩	৮.৬
উপকূলীয় গভীর পানির স্তরভুক্ত এলাকা	১৫	৯৫	৫৪	১৪.৩	৮.১
আর্সেনিক সংক্রমিত এলাকা	১৯	৩৬	১৮	৬.৯	৩.৪
দুর্গম এলাকা	৮	২৪	১২	১.৯	১.০
পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা	১	৬৬	৩৩	০.৭	০.৩
গ্রামীণ মোট:	**১০০**			**৭০.৫**	**৫০.৬**

* *মৌলিক মানদণ্ড প্রতি ১০০ জনে একটি পানির উৎসকে বিবেচনা করে*

** *জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা ১৯৯৮ অনুযায়ী উন্নত মানদণ্ড প্রতি ৫০ জনে একটি পানির উৎসকে বিবেচনা করে। সূত্র: এসডিপি প্রাক্কলন*

২.৫.৪ গ্রামীণ স্যানিটেশন পরিস্থিতি

সারণি ২.১৩-তে উপস্থাপন করা হয়েছে গ্রামীণ স্যানিটেশন পরিস্থিতির চিত্র। বার্ষিক প্রায় ১ শতাংশের মত অত্যন্ত ধীরগতির প্রবৃদ্ধির তুলনায় ২০০৯ সনের হিসাব অনুযায়ী গ্রামীণ স্যানিটেশনে বেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয় এবং কভারেজ ৭৯ শতাংশে (মৌলিক স্যানিটেশন) উন্নীত হয়। এ সাফল্যের কৃতিত্ব এনজিও এবং অন্যান্য সহযোগীদের সাথে সরকারের অংশীদারিত্ব এবং জনগোষ্ঠী-নেতৃত্বে সার্বিক স্যানিটেশন (সিএলটিএস) পন্থারই প্রাপ্য। আবার উন্নত স্যানিটেশন বা স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের দিক বিবেচনা করলে কভারেজ তুলনামূলকভাবে কমে আসে, যথাক্রমে ৫৪% ও ৫০%।

সারণি ২.১৩: গ্রামীণ এলাকায় স্যানিটেশন পরিস্থিতি

এলাকা	২০০৩ সনের ভিত্তিমূল পরিস্থিতি		২০০৯ সনের স্যানিটেশন কভারেজের শতকরা হার (%)		
	মোট খানার সংখ্যা	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী খানার শতকরা হার (%)	বাংলাদেশ মৌলিক মানদণ্ড	বাংলাদেশ উন্নত মানদণ্ড	জেএমপি মানদণ্ড
গ্রামীণ	১৮,৩২৬,৩৩২	২৮.৮	৭৮.৯	৪৯.৯	৫৪.৩

বাংলাদেশে অর্জিত স্যানিটেশন সাফল্যের কৃতিত্ব অনেকটাই জনগোষ্ঠী-নেতৃত্বে সার্বিক স্যানিটেশন বা সিএলটিএস পন্থাকে দিতে হয়। পন্থাটি যৌথভাবে সরকার ও এনজিও কর্তৃক গৃহীত (বক্স ২.২ দেখুন)।

বক্স ২.২: জনগোষ্ঠী-নেতৃত্বে সার্বিক স্যানিটেশন (community-led total sanitation)

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী-নেতৃত্বে সার্বিক স্যানিটেশন পন্থাটি নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত:

- *উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ নয় বা কোন উন্মুক্ত বা ঝুলন্ত পায়খানার ব্যবহার নয়*
- *মলত্যাগের পর ও খাবার আগে কার্যকর হাত-ধোয়া*
- *খাবার ও পানির পাত্র সর্বদা ঢেকে রাখা*
- *ইতিবাচক ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস, যেমন: দাঁত মাজা ও নখ কাটা/পরিস্কার করা*
- *পায়খানা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা*
- *পায়খানা ব্যবহারের সময় স্যান্ডেল ব্যবহার করা*
- *বাড়ির আঙ্গিনা ও রাস্তার ধার পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা*
- *একটি নির্দিষ্ট জায়গা যেমন, গর্তে আবর্জনা ফেলা*
- *সকল গৃহস্থালী প্রয়োজনে নিরাপদ পানি ব্যবহার*
- *পানির উৎস পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা/বর্জ্য-পানি ড্রেইন বা একটি নির্দিষ্ট স্থানে অপসারণ*

সূত্র:অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা, ড. চার্লস জ্যাকসন ও এ.জে. মিনহাজউদ্দিন আহমেদ কর্তৃক সম্পাদিত দি কোস্টাল বেল্ট প্রজেক্ট, জুন ২০০৯ থেকে উদ্ধৃত।

উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের অভ্যাস পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ ও তাদেরকে কাজে সম্পৃক্ত করতে সিএলটিএস একটি উদ্ভাবনীমূলক পন্থা। সিএলটিএস-এর মূলকথা হলো শুধুমাত্র পায়খানা উপকরণ সরবরাহ করেই এর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় না, নিশ্চিত করা যায় না উন্নত স্যানিটেশন কিংবা স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ। স্যানিটেশনের জন্য পূর্বেকার পন্থাগুলোতে উন্নত প্রাথমিক মানদণ্ড অর্জনের সুপারিশ করা হতো এবং প্রণোদনা হিসেবে ভর্তুকি ব্যবস্থা রাখা হতো। তথাপিও, এর ফলে সকলেই তা গ্রহণ করতো না, সমস্যা দেখা দিত সরবরাহকৃত পায়খানার দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বশীলতা নিয়ে এবং দেখা যেত এর আংশিক ব্যবহার। পন্থাগুলোর মাধ্যমে তৈরি হয় ভর্তুকি-নির্ভরশীলতার সংস্কৃতি। উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ ও মল-মুখের মাধ্যমে রোগ সংক্রমণের প্রবণতা চলতেই থাকে।

পুরনো পন্থার তুলনায়, সিএলটিএস ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয় আচরণগত পরিবর্তনের ওপর জোর দেয়। এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় হার্ডওয়ার উপকরণের বদলে জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার মত প্রকৃত ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে বিনিয়োগ, এবং একটি ব্যক্তিবাড়িতে পায়খানা স্থাপনা থেকে অগ্রাধিকার সরিয়ে উন্মুক্ত মলত্যাগ-মুক্ত গ্রামের দিকে আলোকপাত করা হয়।

ওয়াটার এইড বাংলাদেশের কারিগরী সহায়তায় ২০০০ সনে বাংলাদেশে সিএলটিএস পন্থাটির প্রাথমিক উদ্যোক্তা ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) নামের একটি এনজিও। বর্তমানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এনজিওরা পন্থাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে। সিএলটিএস পন্থার ব্যবহার দেশের গণ্ডি পেরিয়ে এখন বিদেশেও; বর্তমানে যেটি এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় ২০টিরও বেশি দেশে অনুসৃত হচ্ছে।

সূত্রসমূহ:সাসেক্স ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস্, যুক্তরাজ্য।
http://www.communityledtotalsanitation.org/page/clts-approach; ওয়াটার এইড, যুক্তরাজ্য।

সিএলটিএস প্রক্রিয়ায়, প্রাথমিক পর্যায়ের 'প্রজ্জ্বলন বা ইগনিশন (ignition)' ও নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত বা স্যানিটারি অভ্যাস শুরুর অব্যবহিত পরে, পরিবারগুলো উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা স্থাপন ও ব্যবহারের মাধ্যমে "স্যানিটেশন সোপানের" উচ্চ সিড়িতে আরোহন শুরু করে (বক্স ২.৩)।

বক্স ২.৩: স্যানিটেশন সোপান (sanitation ladder)

স্যানিটেশন সোপান কথাটির মাধ্যমে ব্যবহৃত প্রযুক্তির ও গৃহীত সেবার স্তরের ক্রমোন্নতিকে বুঝানো হয়েছে। স্যানিটেশন হতে পারে গর্ত পায়খানার মত স্বল্পব্যয়ী ও সাধারণ অথবা সেপটিক ট্যাংক বা স্যুয়ারেজসহ ফ্লাশ টয়লেটের মত ব্যয়বহুল। সোপানের যত উপরে ওঠা যাবে, সেখানে জনগণ ও পরিবেশের জন্য ততোধিক সুফল পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রেক্ষিতে স্যানিটেশন সোপানের একটি ধারাবাহিক রেখচিত্র নিচে উপস্থাপিত হলো। সোপানের উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণে একজন গ্রাহক এটির কোন একটি বা ততোধিক ধাপ এড়িয়েও যেতে পারে।

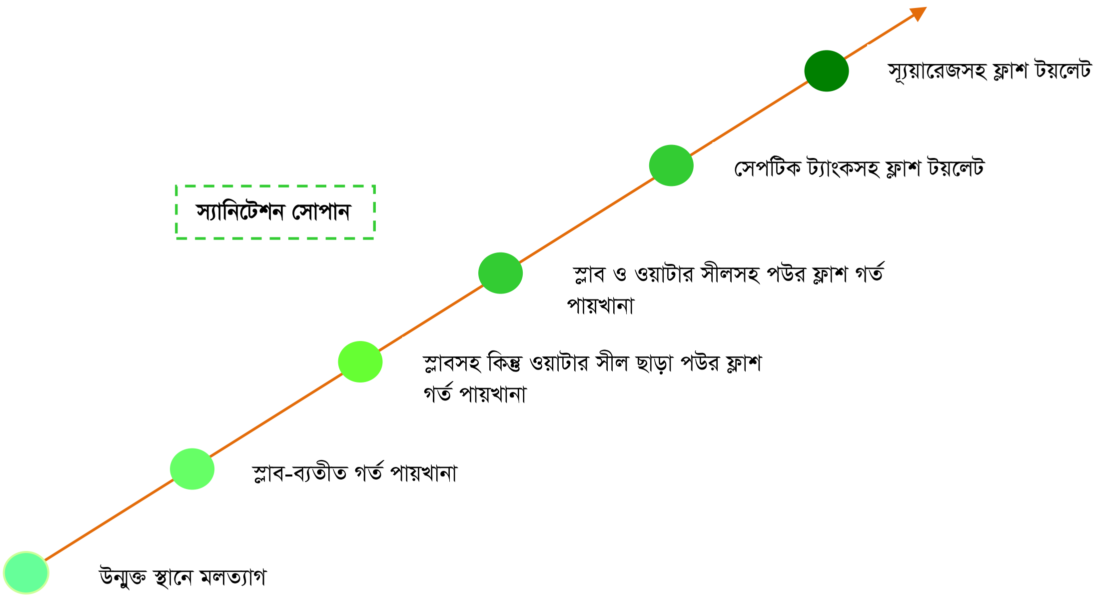

চিত্র ২.৩-তে গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন স্যানিটেশন অভ্যাস উপস্থাপিত হয়েছে। যদিও দেশের একটি বিরাট সংখ্যক (৭৯%) জনগোষ্ঠী মৌলিক স্যানিটেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে, কিছু মানুষ (১৪%) এখনও অস্বাস্থ্যকর পায়খানা ব্যবহার করে এবং এমনকি (৭%) উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগে অভ্যস্ত। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার মধ্যে আছে লিড বা ফ্ল্যাপসহ জলাবদ্ধ গর্ত পায়খানা (৬২%), বায়ু নির্গমণ ব্যবস্থাসহ উন্নত গর্ত (ভিআইপি) ও কম্পোস্টিং পায়খানা (৪%) এবং মৌলিক স্যানিটেশনের অন্তর্ভুক্ত সেপটিক ট্যাংকসহ ফ্লাশ পায়খানা (৭৬%)। যাহোক, এখনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিবারে (২৪%) কেবলমাত্র স্লাবসহ গর্ত পায়খানা রয়েছে; এধরণের পায়খানা রোগ-সংক্রমণের সম্ভাব্য পথগুলো বন্ধ করতে মোটেই কার্যকরী নয়। যার অর্থ হলো, বাংলাদেশের গ্রামীণ স্যানিটেশন সামগ্রিকভাবে এখনও স্যানিটেশন সোপানের প্রাথমিক ধাপেই অবস্থান করছে।

পায়খানার স্থায়িত্বশীল ব্যবহার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশে ব্যবহৃত পায়খানার অধিকাংশই গর্ত পায়খানা এবং একবার গর্তটি ভরে গেলে আরেকটি গর্তের প্রয়োজন হয়। পায়খানার সাথে প্রতিস্থাপন করতে হয় স্লাবটিও। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, একবার গর্তটি ভরে গেলে ঐ পায়খানাটি আর ব্যবহার করা যায় না, এমতাবস্থায় অনেকের মধ্যেই উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের মত পুরোনো অভ্যাসে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। একটি মৌলিক পায়খানার ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যার সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, শতকরা ৭১ ভাগ পায়খানাই একক পরিবার কর্তৃক ব্যবহৃত; যেখানে ১৫ ভাগ পায়খানা ব্যবহৃত হয় দ্বৈত পরিবার এবং বাঁকী ১৪ ভাগ পায়খানা ব্যবহৃত হয় তিন বা ততোধিক পরিবারের দ্বারা। গর্ত পায়খানাগুলো সাধারণত একক পরিবার কর্তৃক ব্যবহারোপযোগী করে তৈরি এবং সে কারণেই ভাগে ব্যবহারের বিষয়টি দীর্ঘমেয়াদে কারিগরী ও সামাজিকভাবে যথোপযুক্ত নয়।

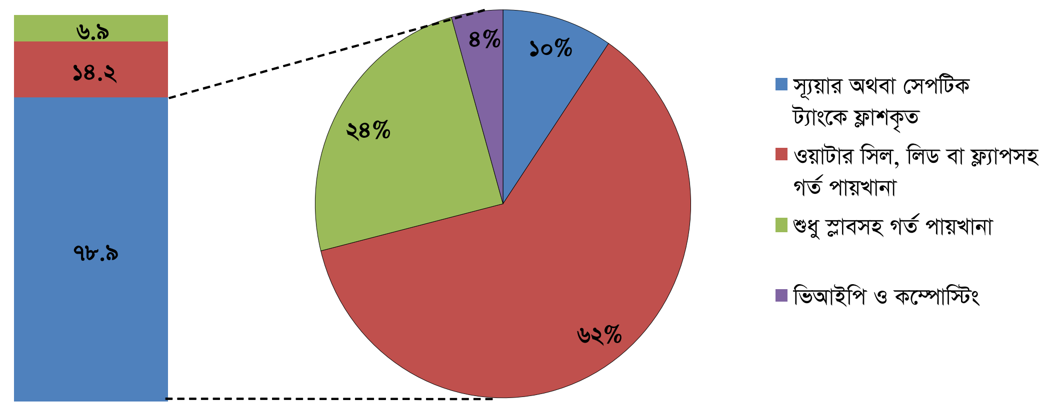

চিত্র ২.৩: গ্রামীণ এলাকায় স্যানিটেশন অনুশীলন

অন্যদিকে দারিদ্র্য স্যানিটেশন প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাধাস্বরূপ। যেসকল পরিবার ভাগে পায়খানা ব্যবহার করে, উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগে অভ্যস্ত অথবা অস্বাস্থ্যকর পায়খানা ব্যবহার করে, তাদের অধিকাংশই দরিদ্র। তাই ১০০ ভাগ স্যানিটেশন অর্জন করতে চাইলে দরিদ্র মানুষের প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনায় নেওয়া জরুরি।

২.৫.৫ গ্রামীণ উপখাতের জন্য কর্ম-নির্দেশনা

নিম্নবর্ণিত কর্ম-নির্দেশনাসমূহ অনুসৃত হবে: ক) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য সামগ্রিক, খ) পানি সরবরাহ নির্দিষ্ট, ও গ) স্যানিটেশন নির্দিষ্ট।

ক) সামগ্রিক (general)

দারিদ্র্য বিমোচন: পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানে দারিদ্র্য একটি সাধারণ সমস্যা। দরিদ্রদের জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্যানিটেশনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বরাদ্দ দেওয়া হলেও পানি সরবরাহের জন্য তা দেওয়া হয় না। এজন্য একটি বিশেষ অর্থায়ন পদ্ধতি চালু অথবা বিদ্যমান পদ্ধতিকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এখানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সমন্বয় সাধণ: কিছু কিছু পর্যায়ে, বিশেষ করে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর অধীন, সামান্য হলেও সরকারি সংস্থা ও এনজিওদের মাঝে একটি সমন্বয় প্রক্রিয়া বিদ্যমান। তবে বেসরকারি খাত যারা গ্রামীণ এলাকায় বৃহত্তর একটি ভূমিকা পালন করে থাকে, তাদের বেলায় সমন্বয় খুবই দুর্বল। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকেই স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের যাবতীয় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সমন্বয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

অখণ্ড বা সমন্বিত *(integrated)* ***পন্থা:*** পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদান এবং বিভিন্ন ধরণের তথ্য-শিক্ষা-যোগাযোগ (IEC) কার্যক্রমে সরকারি প্রকল্পগুলো ও এনজিও কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অনুসৃত হয়। আবার বিভিন্ন বিষয় যেমন: জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার, স্যানিটেশন উন্নয়ন, পদ্ধতি পরিচালনা ও সংরক্ষণ ও পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন আইইসি প্যাকেজ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমের জন্য বাস্তবায়ন নির্দেশিকাসহ একটি অখণ্ড (সমন্বিত) তথ্য-শিক্ষা-যোগাযোগ কার্যক্রম প্রণয়ন করা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ ৩.৭-এ স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার বিষয়ের সাথে বিস্তারিত বর্ণিত)।

খ) পানি সরবরাহ

গ্রামীণ পানি সরবরাহের ঘাটতি বিষয়ে বিশেষ নজর প্রদান: গ্রামীণ পানি সরবরাহ কভারেজ বাংলাদেশের মৌলিক মানদণ্ড অনুযায়ী ৭১ শতাংশ ও উন্নত মানদণ্ড অনুযায়ী ৫১ শতাংশ। উপর্যুক্ত তথ্য অনুসারে গ্রামীণ পানি সরবরাহে সার্বজনিন কভারেজ অর্জনে এখনও একটি বড় ঘাটতি বিদ্যমান, যার প্রধান দুটি কারণ হলো: ১) বিশালায়তন এলাকায় কভারেজ অর্জনে একই ধরণের সমস্যা, যেমন: আর্সেনিক সংক্রমিত এলাকা (আরও দেখুন অনুচ্ছেদ ৩.৫) এবং যে সমস্ত এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে (আরও দেখুন অনুচ্ছেদ ৩.৩); এবং ২) অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তনের এলাকাগুলোর স্থানীয় চরিত্রের সমস্যা, যেমন: দুর্গম এলাকা (বিষয়টি আগেই বর্ণিত)। বর্ণিত দুই ধরণের এলাকার নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে দুটি ভিন্ন পন্থা অবলম্বণ করা দরকার। এক্ষেত্রে বিশালায়তন এলাকার জন্য 'ব্ল্যাংকেট ধরণের' পন্থা উপযোগী হতে পারে, অপরদিকে ক্ষুদ্রায়তন এলাকার বৈচিত্র্যপূর্ণ সমস্যা সমাধানে "টেইলর-মেড" পন্থা উপযোগী হতে পারে।

বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিতকরণ: গ্রামীণ পানি সরবরাহ একটি উত্তরণ প্রক্রিয়ায় (transition path) রয়েছে, যখন দেশের একটি বৃহৎ অংশে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিম্নগামী হওয়ায় এলাকাটি অগভীর থেকে ডিপসেট নলকূপ ব্যবহারের দিকে ধাবিত হচ্ছে। গ্রামীণ পাইপবাহিত পানি সরবরাহ একটি উদীয়মান প্রযুক্তি (emerging technology)। অগভীর নলকূপ-নির্ভর গ্রামীণ পানি সরবরাহে উচ্চ কভারেজ অর্জনে বেসরকারি খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। সেকারণেই সেক্টরের ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসতে সমর্থন প্রদান ও উৎসাহিত করা দরকার (আরও দেখুন পিপিপি বিষয়ে অনুচ্ছেদ ৩.৯)। স্থানীয়ভাবে পানিস্তরের বৈশিষ্ট্য ও গুণগত মান এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ও এমন দরকারি তথ্য সকলের জন্য সহজলভ্য করতে ডিপিএইচই ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো যথাযথ উদ্যোগ নিতে পারে।

গ) স্যানিটেশন

স্যানিটেশন সোপানের উচ্চস্তরে আরোহণ: বাংলাদেশ বর্তমানে স্যানিটেশন সোপানের প্রাথমিক দু'একটি ধাপ অতিক্রম করছে। এখনই সময় সোপানের উপরের দিকে আরোহণ করার। এটি করতে হবে অস্বাস্থ্যকর ও কেবলমাত্র স্লাবযুক্ত (জলাবদ্ধ সীল, লিড বা ফ্ল্যাপ ছাড়া) পায়খানাকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানায় রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান স্যানিটেশন প্রযুক্তির উন্নয়নে অধিকতর দৃষ্টি প্রদানের মাধ্যমে। যুগপৎভাবে, এখনও চলতে থাকা উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের অভ্যাসটি বন্ধ করতে হবে এবং উন্নত প্রযুক্তি যেমন: সেপটিক ট্যাংক ও দুই গর্তবিশিষ্ট পায়খানার ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে।

দুর্গম এলাকার জন্য স্যানিটেশন: দুর্গম এলাকার জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন একটি আলোচিত সমস্যা, যেখানে স্যানিটেশন কভারেজ অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের। এজন্য ব্যাপকভিত্তিক কর্মসূচি এবং গবেষণা ও উন্নয়ন (আরএ্যান্ডডি) উদ্যোগ গ্রহণ অতি জরুরি (গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন অনুচ্ছেদ ৩.১১)।

অধ্যায় ৩

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের থিম্যাটিক বিষয়সমূহ

এই অধ্যায়ে বিধৃত আছে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর-নির্দিষ্ট ও পরস্পর-সম্পর্কিত (cross-cutting) কিছু থিম্যাটিক বিষয়, যেগুলো থিম্যাটিক গ্রুপের অবদান ও তৎপরে পরামর্শকবৃন্দের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে। থিম্যাটিক গ্রুপ কর্তৃক প্রণীত বাদবাঁকী বিষয়গুলো অন্য অধ্যায়ে উপস্থাপিত ও আলোচিত হয়েছে। অধ্যায়ে সংযুক্ত বিষয়গুলোর একটি রূপরেখা শুরুতেই দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মূল সমস্যার বিশ্লেষণ ও সেগুলোর সমাধানে সম্ভাব্য কর্ম-নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত আছে।

৩.১ ভূমিকা

এই অধ্যায়ের পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে নিম্নবর্ণিত থিম্যাটিক বিষয়সমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম পাঁচটি বিষয় পানিসম্পদ ও পানির গুণগত মান সম্পর্কিত এবং পরবর্তী পাঁচটি বিষয় পরস্পর-সম্পর্কিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়টি এর ভিন্ন প্রশাসনিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বিশেষ বিবেচিত।

১) ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি;
২) ভূ-গর্ভস্থ পানি;
৩) পানির গুণগত মান (water quality);
৪) আর্সেনিক নিরসন (arsenic mitigation);
৫) পানি-নিরাপত্তা পরিকল্পনা (water safety plan);
৬) স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার (hygiene promotion);
৭) নাজুক জনগোষ্ঠী (vulnerable groups);
৮) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি);
৯) পরিবেশ সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা;
১০) গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D); এবং
১১) পার্বত্য চট্টগ্রাম (CHT)।

৩.২ ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি

৩.২.১ পানি সম্পদ

পৃথিবীর সমগ্র পানিসম্পদের আয়তন প্রায় ৩২৬ মিলিয়ন ঘনমাইলের সমান, যার প্রতি ঘনমাইলে রয়েছে ১ ট্রিলিয়ন গ্যালন পানি। সমগ্র লভ্য পানির মাত্র ২.৫ শতাংশ সুপেয় এবং বাঁকী ৯৭.৫ শতাংশ লবণাক্ত। সুপেয় পানিসম্পদের

আবার প্রায় ৬৯ শতাংশই জমাট বরফে আবদ্ধ; ৩০ শতাংশ ভূ-গর্ভস্থ পানি এবং মাত্র ০.২৭ শতাংশ রয়েছে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে[১৮]।

সরবরাহযোগ্য পানিসম্পদ মোট দুটি ক্যাটেগরিতে বিভক্ত:

- ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি; এবং
- ভূ-গর্ভস্থ পানি।

ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ পানিতাত্ত্বিক (hydrological) চক্রের মাধ্যমে পরস্পর-সংযুক্ত। পানিতাত্ত্বিক চক্র হলো একটি প্রক্রিয়া, যেটি সুর্যের শক্তিতে বলীয়ান, যা পানিকে সাগর, আকাশ ও ভূমির মধ্যে অবিরত প্রবাহমান রাখে (বক্স ৩.১ দেখুন)।

বক্স ৩.১: পানিতাত্ত্বিক চক্র

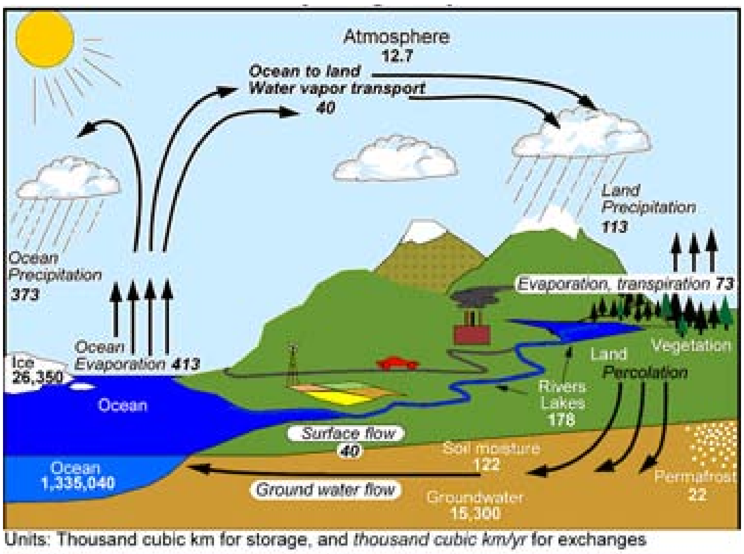

পানিতাত্ত্বিক চক্রকে একটি জৈবিক (physical) প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে পানির প্রবাহ চলমান থাকে। এর জটিল প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত আছে পৃথিবীর উপরিভাগের বা চারপাশের বাষ্পীয় স্তর (envelop), যাকে বলা হয় আবহাওয়ামণ্ডল। এটি তৈরি হয় ভূ-পৃষ্ঠের জলাধার যেমন: সাগর, হিমবাহ ও লেক, এবং একইসাথে (অথবা বেশ ধীরগতিতে) ভূ-গর্ভস্থ মাটি ও পাথরের স্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জলপ্রবাহের মাধ্যমে। পরবর্তীতে এই পানি-ই পুনরায় বায়ুমণ্ডলে প্রত্যাবর্তীত হয়।

সূত্র:
http://www.times.ucar.edu.highlights/fy06/dia.html

ভূ-গর্ভস্থ পানি হলো পানি সরবরাহে সর্বাধিক ব্যবহৃত উৎস, যা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে পরবর্তী অনুচ্ছেদে। এ অনুচ্ছেদে উপস্থাপিত হয়েছে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি ও পানি সরবরাহে এর ব্যবহার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। সাথে স্থান পেয়েছে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির প্রেক্ষিতেই বৃষ্টির পানি বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা ।

বাংলাদেশে ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি পরস্পর-সম্পর্কিত। এখানে অনেক নদীর জলপ্রবাহের অধিকাংশই ভূ-গর্ভস্থ পানি থেকে উৎসরিত। অন্যত্র ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর পুনঃভরাটের প্রধান উৎসই হলো ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলধারা। সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ পানি ভূ-পৃষ্ঠস্থ উৎসের দিকে প্রবাহিত হয় এবং বর্ষা মৌসুমে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি ভূ-গর্ভে সঞ্চারিত হয়।

৩.২.২ ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি

বাংলাদেশের নদীগুলো যেন দেশের ও দেশের মানুষের জীবনাদর্শেরই প্রতিচ্ছবি। দেশে মোট নদীর সংখ্যা প্রায় ৭০০ এবং এগুলো সাধারণত দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। বড় নদীগুলো চাষাবাদে পানি সরবরাহের প্রধান উৎস এবং বাণিজ্যিক

[১৮] http://www.ehow.com/about_5127497_types-water-resources.html

পরিবহনের প্রধান নৌপথ হিসেবে ব্যবহৃত। দেশে আমিষের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে মৎসসম্পদ এখান থেকেই আহরিত। বর্ষা মৌসুমে নদীতে বন্যার ফলে জনগণের দুর্ভোগ বাড়ে এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করে, কিন্তু এর ফলে জমাট নতুন পলিমাটিতে নদীর তলদেশ অতিরিক্ত ভরাট হলেও জমির উর্বরতা বাড়ায়। নদীগুলো বর্ষাকালের অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হতেও সাহায্য করে। অতঃপর বৃহৎ নদীপ্রবাহ একাধারে দেশের প্রধান সম্পদ ও ঝুঁকি সৃষ্টিকারীও বটে।

চারটি প্রধান নদী অববাহিকার মধ্যে ব-দ্বীপ এলাকায় বাংলাদেশের অবস্থান। অববাহিকাগুলো হলো: গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, মেঘনা ও তিস্তা। চারটি নদী অববাহিকার এই শক্তিশালী নেটওয়ার্কটি প্রায় ১.৫ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার এলাকাবিশিষ্ট বাংলাদেশের সমতলীয় নিচু এলাকা দিয়ে প্রবাহিত (**চিত্র ৩.১**)। এই নদী ও তাদের শাখা নদীগুলো থেকে ভরা মওসুমে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৫ মিলিয়ন ঘনফুট পানি বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত (discharge) হয়। নদীগুলোতে বার্ষিক তলানী/পলি জমার প্রাক্কলিত পরিমাণ ১.৫ থেকে ২.৪ বিলিয়ন টনের মধ্যে। বাংলাদেশে সর্বমোট প্রায় ২৪,০০০ কিলোমিটার নদী, জলপ্রবাহ (streams) ও খাল (canals) রয়েছে।

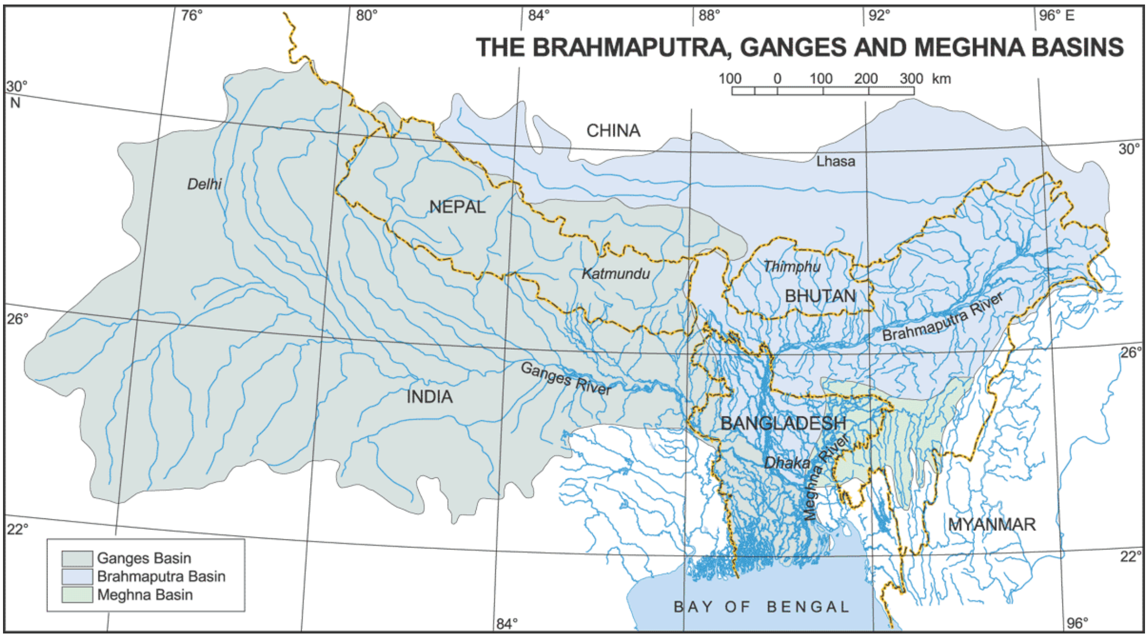

চিত্র ৩.১: বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদী ও সেগুলোর জলনিকাশ এলাকা

বাংলাদেশের ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো: বড় বড় নদীর নেটওয়ার্ক, বর্ষা ঋতুতে পানিতে তলিয়ে যায় এমন বিশাল প্লাবন এলাকা, লেক, কর্দম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবনমিত পিরিচাকার বিল-সদৃশ এক হাজারেরও বেশি হাওর-বাওর, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মরা নদীর অবশিষ্ট বাঁকানো শীর্ণধারাসমূহ। এসকল প্রাকৃতিক জলাধারের পাশাপাশি দেশের প্রতিটি গ্রামেই বিভিন্ন আকারের পুকুর রয়েছে। অনুমিত পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১,২৮৮,২২২ (বিবিএস ২০০৭)। দেশের সমগ্র জলাশয়ের আয়তন ১২,০০০ বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি, যা বাংলাদেশের ভূমি এলাকার মোট আয়তনের প্রায় ৮ শতাংশ (সারণি ৩.১)।

সারণি ৩.১: বাংলাদেশের বৃহত্তর জলাশয়

জলাশয়ের ধরণ	পানি এলাকা (বর্গ-কিলোমিটার)
প্রধান নদীসমূহ (পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা)	২,১৭৪
অন্যান্য নদী ও খালসমূহ	২,৬২৬
মৃত নদী ও অবনমিত পিরিচাকার লেকসমূহ	২২৫
বিল/হাওর/অন্যান্য প্রাকৃতিক জলাধার	১,৫৪০
নদীমোহনা (এসতুয়ারি)	৫,৫১৮

মোট ঃ	১২,০৮২

সূত্র: স্পেস রিসার্স এ্যান্ড রিমুভ সেন্সিং অর্গানাইজেশন (স্পারসো রিপোর্ট, ১৯৮৪)

বাংলাদেশ পানির প্রাকৃতিক আধারভূমি হিসেবে পরিচিত। বর্ষাকালে এখানে অত্যধিক পানির সমাহার ঘটে, কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাবে খরাভাব তৈরি হয়। এই দুটি মারাত্মক অবস্থা দেশের সার্বিক পানিসম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

নিম্ন অববাহিকার একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানিসম্পদের (পানি সরবরাহসহ) দক্ষ ব্যবহার পরিকল্পনায় অনেকগুলো স্থিতিমাপ (parameters) বিবেচনা করতে হবে। এগুলোর মধ্যে আছে: ১) বিভিন্ন মৌসুমে অতিরিক্ত ও অত্যল্প পানির প্রাপ্যতা এবং এর অনিয়মিত সংঘটন (eratic occurance), ২) পাললিক নদীসমূহের একটি জটিল নেটওয়ার্ক কর্তৃক প্রচুর পরিমাণ বার্ষিক পলি অবমুক্তকরণ ও তলানী জমা এবং যার ফলে ব্যাপক নদীভাঙ্গন, ৩) উজান থেকে পানি প্রত্যাহারের কারণে আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধি, পরিবেশ, প্রতিবেশ ও মৎস আবাসস্থলের ওপর সৃষ্ট মারাত্মক প্রভাব, ৪) নদীভরাট হওয়ার ফলে অভ্যন্তরীণ নদী পরিবহন ব্যবস্থায় সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা, ৫) গৃহস্থালীতে ব্যবহার্য পানির চাহিদা বৃদ্ধি, এবং ৬) উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি।

সরবরাহের জন্য ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার

দেশে ৯০ শতাংশেরও বেশি খাবার পানির উৎস ভূ-গর্ভস্থ পানি। ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির জন্য যেমন সবসময়ই পরিশোধন প্রয়োজন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিশোধন প্রয়োজন হয় না। ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি কৃষিকাজ, শিল্পকারখানা, গৃহস্থালী ও পৌর কর্মকাণ্ড থেকে দূষিত হয়। বর্ষাকালে এই পানিতে অতি উচ্চ-মাত্রার কাদামাটির উপাদান থাকে। শুষ্ক মৌসুমে বদ্ধ জলাশয় যেমন: পুকুরে উচ্চমাত্রায় জীবাণুর (ব্যাকটেরিয়া-আলগি) বৃদ্ধি ঘটে। উপরন্তু, পানির অস্বাস্থ্যকর ব্যবহার ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির মানকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অস্বাস্থ্যকর ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট দূষণের একটি নির্দেশক হলো পানিতে ফিকাল কলিফর্মের উপস্থিতি, যার পরিমাণ অধিকাংশ ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানিতে প্রতি ১০০ মিলিলিটারে ৫০০ থেকে ১০০০ পর্যন্ত পাওয়া যায়। ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানিকে খাবার পানির উপযোগী করতে ব্যাপক ও ব্যয়বহুল পরিশোধন প্রক্রিয়ার দরকার হয়।

ঢাকা ও চট্টগ্রামের মত বৃহৎ নগরী এবং চাঁদপুর ও বান্দরবানের মত কিছু কিছু মাঝারী শহরে ভূ-গর্ভস্থ পানির পাশাপাশি নদীর পানিও ব্যবহৃত হচ্ছে, বিশেষ করে যেসমস্ত এলাকায় একটিমাত্র উৎসে এলাকার মোট চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। একেবারেই অন্য কোন উপযোগী উৎস না থাকায় গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও পিরোজপুরের মত শহরগুলোতে শুধুমাত্র নদীর পানি-ই ব্যবহৃত হয়। রাঙামাটিতে ব্যবহৃত হচ্ছে কেবলমাত্র লেকের পানি। দ্রুত নগরায়ণ ও পানির চাহিদা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার। উদাহরণস্বরূপ, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশালের মত বড় বড় নগরীতে বিদ্যমান ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎস ব্যবহারের অতিরিক্ত হিসেবে শহর-সংলগ্ন নদী থেকে পানি সংগ্রহ ও পরিশোধন করত: সরবরাহ করতে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি শোধনাগার তৈরি করা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, ক্রমবর্ধমান নগর জনসংখ্যার কারণে ভবিষ্যতে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার আরও বাড়বে।

গ্রামীণ এলাকার কিছু কিছু অংশে, যেমন: উপকূলীয় এলাকা, যেখানে উপযোগী পানিস্তর পাওয়া যায় না, সেখানে পুকুরের পানি পরিশোধন করতে পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (PSF) ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক সংক্রমণ থাকায় দেশের আরও অনেক স্থানে ব্যবহার করা হচ্ছে পিএসএফ-এর মত বিকল্প প্রযুক্তি।

নগর এলাকায় ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি ব্যবহারে রয়েছে অনেক সীমাবদ্ধতা। দেশের অনেক স্থানে সারাবছর ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি পাওয়া যায় না, যেখান থেকে তা খাবার পানি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। আবার ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ এবং পরিচালনা ও সংরক্ষণ ব্যয়ও ভূ-গর্ভস্থ পানিভিত্তিক সরবরাহ পদ্ধতি থেকে অনেক বেশি। উপকূলীয় জেলাগুলোতে লবণাক্ততা আরেকটি বড় সমস্যা। বড় নগরীগুলোর ভিতরে ও আশপাশের শিল্পকারখানার দূষণও একটি বড় উদ্বেগের কারণ (বিস্তারিত দেখুন পরিবেশ বিষয়ক অনুচ্ছেদ ৩.১০)। গ্রামীণ

এলাকায় এমন পুকুর পাওয়াই দুষ্কর যেগুলো মৎস চাষ, গোসল ও ধোয়ামোছার মত দূষণকারী কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত। অধিকন্তু, পুকুরের পানিতে টক্সিন[১৯] জাতীয় উপাদানের উপস্থিতিও প্রতিবেদনে প্রকাশ পাচ্ছে।

বৃষ্টির পানি

ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির আরেকটি উৎস হলো বৃষ্টি। বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের প্রচুর তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এই তারতম্য কেবলমাত্র ঋতু থেকে ঋতুতেই নয়, বরং অঞ্চলভেদেও দেখা যায়। দেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত পশ্চিমাঞ্চলে ১,৪০০ মিলিমিটার থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় ৫,০০০ মিলিমিটারের মধ্যে ওঠা-নামা করে। এছাড়াও বৃষ্টিপাত ব্যাপক মৌসুমী তারতম্যের বৈশিষ্ট্য বহন করে। বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় ৯০ ভাগই ঘটে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে।

কোন কোন গ্রামীণ এলাকায়, যেখানে কোনরকম ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির উৎস পাওয়া যায় না, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতিতে (RHS) বৃষ্টির পানি ব্যবহৃত হচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ পানির কৃত্রিম পুনঃভরাট (বৃষ্টির পানির সাহায্যে) একটি সম্ভাবনাময় দিক এবং এটি ওয়াসা কর্তৃক পরীক্ষামূলকভাবে (pilot) ঢাকা নগরীতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩.২.৩ ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির সমস্যা ও সুপারিশ

- কৃষিতে ব্যবহার্য পানি-নির্ভরতা ভূ-গর্ভস্থ পানি থেকে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানিতে সরিয়ে নেওয়ার চর্চাকে এগিয়ে নেওয়া। এটি কৃষিতে ব্যবহার্য পানিকে ভূ-পৃষ্ঠস্থ উৎস থেকে এবং তৎপরিবর্তে খাবার পানিকে অধিকতর ভূ-গর্ভস্থ গভীর স্তর থেকে সংগ্রহের নিরাপদ চর্চাকে শক্তিশালী করবে;

- যখন দুই বা ততোধিক আর্সেনিক নিরসন প্রযুক্তি কারিগরীভাবে উপযোগী বিবেচিত, তখন ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির উৎসকে অগ্রাধিকার প্রদান। এক্ষেত্রে যেসকল সম্ভাব্যতা বিবেচনা করতে হবে, তা হলো: (১) পানির রাসায়নিক ও জৈবিক নিরাপত্তা; (২) ব্যয়; (৩) সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা; এবং (৪) পানির উৎসটির পার্থিব বা সময়ানুগ নির্ভরযোগ্যতা;

- ভবিষ্যতে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি ব্যবহারের বর্ধিত চাহিদার প্রেক্ষিতে, সুনির্দিষ্টভাবে বড় নগরীগুলোতে, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি ব্যবহারের বিদ্যমান চাহিদা সাবধানতার সাথে বিবেচনা করতে হবে। কেননা মৌসুমী তারতম্য, উজান থেকে সম্ভাব্য পানি প্রত্যাহার ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির লভ্যতায় হেরফের হতে পারে;

- ঢাকা নগরী ও বরেন্দ্রভূমির মত স্থানে যেখানে পানির দুষ্প্রাপ্যতা বিদ্যমান, সেসমস্ত এলাকায় ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির (বা বৃষ্টির পানির) সাহায্যে ভূ-গর্ভস্থ পানির কৃত্রিম পুনঃভরাট (artificial recharge) বিবেচিত হতে পারে। সাথে সাথে এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে, আশুলিয়া ও মিরপুরের মত ঢাকা নগরীর আশপাশের নিচুস্থান ও অন্যান্য শহরের কাছাকাছি জলাময় এলাকাগুলোকে ভূমি-ভরাট থেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে; এবং

- মৎসচাষ ও গৃহস্থালীর উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবহারের ফলে খাবার পানি সরবরাহের উৎস হিসেবে গ্রামীণ এলাকায় পুকুরের লভ্যতা একটি বড় সমস্যা। পানির দুষ্প্রাপ্য এলাকায় বিকল্প উৎস হিসেবে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহারকেও উৎসাহিত করতে হবে।

---

[১৯] অকারেন্স অব সায়ানো-ব্যাকটেরিয়াল টক্সিন (মাইক্রোসিসটিনস্) ইন সারফেস ওয়াটার অব রুরাল বাংলাদেশ - পাইলট সমীক্ষা প্রতিবেদন, মে ২০০৪। মানবিক পরিবেশের জন্য পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, জেনেভা।

৩.৩ ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা

৩.৩.১ ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ বিষয়ক প্রেক্ষিত গবেষণা

জাতীয় পানিসম্পদ পরিকল্পনার ফেজ-১ প্রণয়নকালে আবহাওয়া পরিকল্পনা সংস্থা বা MPO (বর্তমানে যেটি পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা বা WARPO) কর্তৃক ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদের প্রথম একটি পদ্ধতিগত যাচাই সম্পন্ন হয় এবং ১৯৯০ সনে ফেজ-২ তে সেটি আপডেট করা হয়। কৃষিজমিতে সেচব্যবস্থা (irrigation) উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরসমূহের ক্রমাঙ্ক নির্ণয়ের (calibrating) মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদের পুনঃযাচাই সম্পন্ন হয় জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NWMP) প্রণয়নের সময়। তৎপরে আঞ্চলিক পর্যায়ে আর কোন পরিমাণগত যাচাই সম্পন্ন হয়নি, কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে যেমন খুলনায় কিছু সমীক্ষা[২০] সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যেমন: ডানিডা[২১] ও জাইকা[২২] সমর্থনে পৌরসভা পর্যায়ের পানি সরবরাহ প্রকল্পের অধীনে বেশকিছু সমীক্ষা সম্পন্ন ও বাস্তবায়ন করছে ডিপিএইচই।

উপরোক্ত কর্মগুলোর মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জটিল সমস্যা চিহ্নিতকরণের ও সেগুলো সমাধানের জন্য যথাযথ কৌশল প্রণয়নের একটি শক্তিশালী বিশ্লেষণী ভিত্তি তৈরি হয়েছে। এসডিপিতে এসকল সমীক্ষার পর্যালোচনা ও তা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের প্রতিফলন ঘটেছে।

সম্প্রতি ডিপিএইচই কর্তৃক দেশব্যাপী ১৪৮ পৌরসভায় ম্যাথামেটিক্যাল মডেলিংসহ সেখানকার ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ নিরূপণের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে, এবং পলিসি সাপোর্ট ইউনিটের (PSU) সাথে যৌথভাবে একটি জাতীয় ভূ-গর্ভস্থ পানির তথ্যভাণ্ডার (database) তৈরির কাজ চলছে, যার সাথে যুক্ত থাকছে পানির ভূ-তাত্ত্বিক ও রাসায়নিক বিশ্লেষণের সফট্ওয়ার।

৩.৩.২ বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানি

ভূ-গর্ভস্থ পানির চতুর্থ স্তর (কুয়াটারনারি) থেকে সদ্যঘনীভূত পলিস্তর (recent sediments) পর্যন্ত লভ্য পানিই বাংলাদেশের গৃহস্থালী, শিল্পকারখানা ও সেচের পানির প্রধান উৎস। অগভীর পাললিক স্তরগুলো বৃষ্টিপাত ও বন্যার মাধ্যমে পুনঃভরাট হয় এবং ঢাকা নগরীর মত এলাকা ব্যতিরেকে প্রায় সর্বত্রই প্রতিবছর শুন্যস্থানপূরণ সম্পন্ন হয়। ঢাকা নগরী ও এর আশপাশের এলাকায় এটি না হওয়ার কারণ একাধারে বর্ধিতহারে পানি উত্তোলন ও এর ফলে ধারাবাহিকভাবে পানিস্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। অধিকতর গভীর পানিস্তর পুনঃভরাটের বিষয়টি যাচাই করা কঠিন। পানিস্তর পদ্ধতিটি তিনভাগে বিভক্ত:

১) একটি উপরি বা মূলস্তর, যা প্রায় ১৫০[২৩] মিটার পর্যন্ত সম্প্রসারিত। উৎসটিকে অত্র প্রতিবেদনে অগভীর পানির স্তর গণ্য করা হয়েছে।

---

[২০] ”খুলনা নগরীর ভিতরে ও আশপাশে ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ও পানি-ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান সম্পর্কিত পৌরসেবা প্রকল্প” শিরোণামে প্রকল্পের অধীন ২০০৫ সনে বিআরজিএম, এএনটিইএ ও এআরএমকোর সহযোগিতায় এলজিইডি কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষা।

[২১] ”চৌমুহনী ও লক্ষীপুর পৌরসভায় ডিপিএইচই-ডানিডা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প”এর অধীনে এনএ্যান্ডআর/আরএ্যান্ডএইচ ও এ্যাকূয়া কনসালটেন্টস্ এর যৌথ উদ্যোগে ১৯৯২ সনে সম্পাদিত সমীক্ষা।
(বাংলাদেশের পাঁচটি পৃথক উপকূলীয় জেলায় বাস্তবায়িত ”পাঁচ-শহর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন গ্রুপ (ডিপিএইচই-ডানিডা, ২০০১)” প্রকল্পেও ডানিডার সহায়তা গৃহীত হয়। পাঁচ-শহর প্রকল্পটি পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেণী জেলাতে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটির মাধ্যমে বর্ণিত পাঁচটি জেলাশহর ও এগুলির আওতায় আরও পাঁচটি পৌরসভায় কভারেজ সম্পন্ন হয়।)

[২২] জাইকা (২০০২) কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষা: ”বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় আর্সেনিক সংক্রমিত এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে গভীর স্তরগুলোর ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ উন্নয়ন”। সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলো হলো: যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ।

[২৩] ১৫০ মিটার পরিমাণটি একটি প্রয়োজনীয় নির্দেশক, কিন্তু এর কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবহারযোগ্যতা নেই, যদিও এটি সর্বশেষ গ্লেসিয়াস ম্যাক্সিমাম হতে পুঞ্জিভূত আনুমানিক স্তরসীমা এবং আর্সেনিক সংক্রমণের সম্ভাব্য গভীরতা সীমা বিবেচিত। যাহোক, পুরাতন ও আর্সেনিকমুক্ত স্তর সচরাচর অগভীরতম স্তরেই হয়ে থাকে।

২) একটি গভীর স্তর, যা ১৫০ মিটার থেকে প্রায় ৩৫০ মিটার পর্যন্ত ব্যাপৃত; এবং
৩) একটি অতি গভীর বা নিম্নস্তর, যা ৩৫০ মিটারেরও বেশি গভীরে ব্যাপৃত, যেমনঃ ১,৬০০ মিটার পর্যন্তও যেতে পারে। স্তরটি সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়।

ব্যাবহারিক পরিভাষার চ্যুতি বা ভিন্নতার কারণে অনেক সময়ই পানিস্তর ও নলকূপের সংজ্ঞাগুলো যথেষ্ট দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উদ্রেক করে।

৩.৩.৩ ভূ-গর্ভস্থ পানির লভ্যতা

অগভীর পানির স্তর

অগভীর পানির স্তরে সম্ভাব্য পুনঃভরাট, বিভিন্ন ধরণের চাহিদা (পানি সরবরাহ, পরিবেশ ও কৃষি) এবং বিভিন্ন পানি-ভূতাত্ত্বিক অঞ্চলের জন্য এর অবশিষ্ট সম্পর্কে ২০২৫ সন পর্যন্ত প্রাক্কলন সম্পন্ন হয়েছে। সেগুলোর সার-সংক্ষেপ নিচের সারণি ৩.২ তে উপস্থাপিত।

সারণি ৩.২: ব্যবহারযোগ্য পুনঃভরাট ও ভূ-গর্ভস্থ পানির চাহিদা

অঞ্চল	সার্বিক এলাকা (কেএইচএ)	ব্যবহারযোগ্য (১) পুনঃভরাট, ইউএস, (মিলিয়ন-ঘনমিটার)	ভূ-গর্ভস্থ পানির চাহিদা, জিডি (মিলিয়ন-ঘনমিটার) (২)				অবশিষ্টঃ ইউআর-জিডি (মিলিয়ন-ঘনমিটার, %)
			পানি সরবরাহ	পরিবেশ	কৃষি	মোট	
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল	৩,০১৬	১২,১০০	৫৩৯	১২৯০	৯৫৪৮	১১,৩৭৭	+ ৭২৩ (৬%)
উত্তর-পূর্বাঞ্চল			২২২	১৭০	১৩৫৭	১,৭৪৯	১৭,০৬৬ (৭৪%)
উত্তর-কেন্দ্রিয় অঞ্চল	৩,৫৬৯	২৩,১০০	৫৬৬	৬৩৭	৩০৮২	৪,২৮৫	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল	৩,০০৭	৯,৮০০	২৩২	১৪৯	১১৫৮	১,৫৮৪	৮,২১৬ (৮৪%)
দক্ষিণ-কেন্দ্রিয় অঞ্চল	১,৪২৬	৩,৫০০	১৭৯	৮৮	৬৫২	৯১৯	২,৫৮১ (৭৪%)
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল	২৫৬২	৫,৬০০	২৮৯	৬২০	৪১৯৬	৫,১০৫	৪৯৫ (৯%)
পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ি	-		১৮১	-	-	১৮১	
মোট (মিলিয়ন-ঘনমিটার)	১৩,৫৮০	৫৪,১০০	২,২০৮	২,৯৯৯	১৯,৯৯৩	২৫,২০০	২৮,৯০০
(%)			(৮.৮%)	(১১.৯%)	(৭৯.৩%)	(১০০%)	(৫৩%)

টীকা: (১) জাতীয় পানি পরিকল্পনা-২ কর্তৃক সম্পদ যাচাই; (২) জাতীয় পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা (NWMP) কর্তৃক ভূ-গর্ভস্থ পানির চাহিদা প্রাক্কলন

খাবার পানি সরবরাহের জন্য মাত্র ৯ শতাংশ ভূ-গর্ভস্থ পানির দরকার হয়, পরিবেশের জন্য ১২ শতাংশ এবং কৃষির জন্য দরকার হয় ৭৯ শতাংশ। পানিসম্পদের প্রাপ্যতা থেকে বুঝা যায়, পানির গুণগতমান বিবেচনায় না নিলে খাবার পানি সরবরাহের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে তেমন কোন আঞ্চলিক সমস্যা থাকার কথা নয়। তদুপরি, উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্ত বরাবর এবং বিশেষ করে উঁচু বরেন্দ্রভূমি এলাকায় স্তর পুনঃভরাট একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত উত্তোলনের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর নিচে নেমে যাওয়া ঢাকা নগরী ও এর আশপাশের এলাকার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সমস্যা।

গভীর পানির স্তর

মূলত লবণাক্ততা এড়াতেই উপকূলীয় এলাকায় গভীর (১৫০-৩৫০ মিটার গভীরতায়) নলকূপের ব্যবহার। জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, মাত্র ১ শতাংশ গভীর নলকূপের পানিতে আর্সেনিক সংক্রমণের মাত্রা ৫০ পিপিবি'র বেশি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এটি মাত্রাতিরিক্ত নয়। তখন থেকেই এলাকাটিতে উচ্চহারে গভীর নলকূপের ব্যবহার শুরু। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও কেন্দ্রীয় এলাকার বৃহৎ একটি অংশ জুড়ে অগভীর নলকূপের পানিতে আর্সেনিক সংক্রমণের সমাধান হিসেবেও বর্ধিতহারে গভীর নলকূপের ব্যবহার শুরু হয়েছে। একারণেই গভীর পানিস্তর ক্রমান্বয়ে খাবার পানি সরবরাহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়।

গভীর পানিস্তর (উত্তোলন) উন্নয়নও আর্সেনিক ও লবণাক্ততা অনুপ্রবেশের আশংকায় বাধাগ্রস্ত। স্তরটিতে স্থানীয়ভাবে বোরোন, আয়রণ ও ম্যাঙ্গানিজের মাত্রারিক্তি উপস্থিতি লক্ষণীয়। এমতাবস্থায় ভূ-গর্ভস্থ পানির গভীর স্তর কতখানি নবায়নযোগ্য তা নিরূপণ করা একটি তর্কসাধ্য বিষয়, কিন্তু এটি নিশ্চিত যে স্তরটি থেকে ভাল মানের প্রচুর পরিমাণ পানি আরও বহুবছর ধরে সরবরাহ করা সম্ভব। বিষয়টি খুলনার গভীর কূপক্ষেত্র থেকে প্রমাণিত (প্রদর্শিত), যেখান থেকে গত ৪৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে পানি উত্তোলন করা হচ্ছে অথচ স্তরটিতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ কিম্বা আর্সেনিক দূষণের প্রমান পাওয়া যায়নি (ব্যুরো ডি রিসার্সেস জিওলজিকুয়েস এট মিনারেস, বিআরজিএম, ফ্রান্স, ২০০৫)। তবে গভীর স্তরের অনিশ্চয়তাটি আসে ভূ-গর্ভস্থ পানির মান ও পরিমাণ পরিবীক্ষণের প্রক্রিয়া-পদ্ধতির সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির কারণে।

বিআরজিএম (২০০৫) সমীক্ষাটি সম্ভবত গভীর পানিস্তর বিষয়ে দেশের একমাত্র উন্নত মডেলিং সমীক্ষা। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে আগামী ২৫ বছর সময়মেয়াদে খুলনায় সুলভ্য পরিচ্ছন্ন পানির পরিমাণে একটি বড় ধরণের ধস নামবে। যদিও পরিস্থিতি পরিবর্তনের এই অনুমিত সময়সীমাটি তর্কাতীত নয়, তথাপিও মডেল স্থিতিমাপ বিষয়ে অনুমিত অনিশ্চয়তা ও প্রদত্ত পরিবর্তনের দিক-নির্দেশনা (declining) অবধারিত। নীতিমালাটি দেশের পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিকল্পনায় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। কাজটি করতে হলে একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি থাকা অত্যাবশ্যক, যেটি পানিস্তরের যে কোন পরিবর্তন বিষয়ে আগাম সংকেত দেবে। অধিকন্তু, ডিপিএইচইচ তথ্যমতে সিলেট, বরিশাল ও খুলনার মত স্থানে পরিপূর্ণ স্তরের (artisan aquifer) পিয়েজোমেট্রিক চাপ ইতোমধ্যে কমেছে; যার অর্থ হলো স্তর পুনঃভরাটের হার কমে যাওয়া। এটিও উদ্বেগের বিষয় যে, কৃষিজমিতে সেচের জন্য একটি উপযুক্ত গভীর পানির স্তর আবিস্কারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটি অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। যদি ভূ-গর্ভস্থ গভীর পানির স্তর কৃষিতে সেচের জন্য বিবেচিত হয়, তবে খাবার পানির অমূল্য সম্পদ নিশ্চিতভাবেই দুস্প্রাপ্য হবে।

যখন বেসিনাল স্কেল মডেল[২৪](উদাহরণস্বরূপ, খুলনা সমীক্ষা) একটি কার্যকর প্রেক্ষিত উপস্থাপন করে, সেগুলো সার্বিক সাধারণীকরণ (gross generalization), যা এককভাবে কোন শহরে পানি সরবরাহ পরিকল্পনার জন্য যথেষ্ট নয়। স্বল্পমেয়াদে (ধরা যাক, ৫ বছর) একটি যুক্তিযুক্ত তাত্ত্বিক মডেল (sound conceptual model) উদ্ভাবন এবং এর ভিত্তিতে বাস্তবায়ন, প্রগতিশীল সংস্কার (progressively upgraded) ও নেটওয়ার্ক মনিটরিং অগ্রাধিকার পেতে পারে। একটি যুক্তিযুক্ত মডেল ভিন্ন কেবলমাত্র সংখ্যাতাত্ত্বিক (numerical) মডেল সামান্যই সুফল ও আস্থা বয়ে আনতে পারে। যখন সম্পদ সমীক্ষাগুলো এগিয়ে চলছে, তখন নগর এলাকার গভীর কূপক্ষেত্র থেকে পানি উত্তোলন ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন নলকূপ ও নিকটস্থ লবণাক্ত বা আর্সেনিক সংক্রমিত ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের মাঝখানে পর্যবেক্ষণ কূপ স্থাপন ও তা পরিবীক্ষণের একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করা দরকার।

অগ্রাধিকারযোগ্য আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নগর পানি সরবরাহ পদ্ধতিতে উচ্চমাত্রায় পানি হারানোর ক্ষতি (water losses)। দৃশ্যত যেসব স্থানে ভূ-গর্ভস্থ গভীর পানিস্তরের অনবায়নযোগ্য উৎস ব্যবহৃত হচ্ছে, সেখানে ক্ষতিটি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অধিকতর প্রচেষ্টা নিতে হবে। ঢাকার মত অবস্থা না হলে,

[২৪] তাত্ত্বিক (conceptual) ও সংখ্যাতাত্ত্বিক (numerical) উভয় মডেল।

যেখানে পাইপলাইনের ছিদ্রের মাধ্যমে পানি উত্তোলিত স্তরে কার্যকরভাবে ফেরৎ যায় (যেটি দক্ষতার সমস্যা বিবেচিত), উপকূলীয় শহরগুলোতে সেখানে ছিদ্রের মাধ্যমে বেড়িয়ে যাওয়া পানি প্রকৃতপক্ষে চিরতরেই হারিয়ে যায়।

৩.৩.৪ পানির স্তর অবনমন ও গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রযুক্তি

মাত্র দুই দশক আগে, যখন কৃষিজমিতে সেচের জন্য ততটা উল্লেখযোগ্য হারে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন হতো না, তখন প্রায় সারাদেশেই (কেবলমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত) ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর সাকশন-মোড পাম্পের (<৬ মিটার) উত্তোলন সামর্থ্যের মধ্যেই ছিল। এধরণের পাম্প ৬নং হস্তচালিত অগভীর নলকূপ নামেই সাধারণ্যে পরিচিত। তখন থেকেই কৃষিজমিতে সেচের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে এবং ফলস্বরূপ ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পর্যায়ক্রমে নিচে নেমে যায়। এর ফলে অনেক অগভীর নলকূপ হয়ে পড়ে অকার্যকর। সমাধানস্বরূপ প্রবর্তিত হয় ফোর্স-লিফট্ ধরণের হস্তচালিত নলকূপ (প্রাথমিক অবস্থায় তারা নলকূপ নামে পরিচিত)। এরপরও ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমাগত নামতে থাকলে আরও বিভিন্ন ধরণের নলকূপের (সুপার তারা ও তারা ডেভহেড) ব্যবহার শুরু হয়, যেগুলো অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তর (>২০ মিটার) থেকেও পানি উত্তোলনে সক্ষম। নতুন ধরণের নলকূপগুলো ৬নং অগভীর নলকূপের চেয়ে অনেক ব্যয়বহুল।

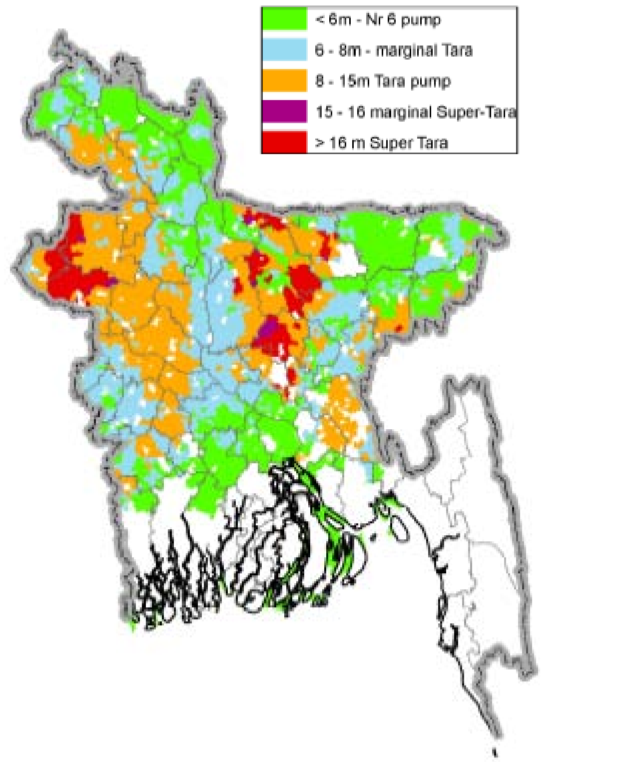

চিত্র ৩.২: ডিপিএইচই কর্তৃক নিরূপিত (২০০৯ সন) বাংলাদেশের নিম্নতম পানিস্তর গভীরতা

পানির স্তর নিচে যাওয়ার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক হয় গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য, যা মূলত বহুদিন ধরেই হস্তচালিত নলকূপ-নির্ভর। পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে উৎপাদন নলকূপগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হচ্ছে যাতে সেগুলো নিম্নতম গভীরতা থেকেও পানি উত্তোলন করতে পারে এবং তারপরও দেখা যাচ্ছে যে বিদ্যমান সেচ নলকূপের কারণে পানির স্তরের নিম্নগামীতা এসকল উৎপাদন নলকূপকে প্রভাবিত করছে। ঢাকার ঘটনাটি ভিন্ন; এখানে পানি সরবরাহের জন্য অতিরিক্ত উত্তোলনের ফলে পানিস্তরের দ্রুত অবনমন (কূপগুলোর আশপাশেই পানির স্তর নিম্নগামী) ঘটছে।

ডিপিএইচই নিরূপিত (২০০৯) বাংলাদেশের নিম্নতম ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরসমূহ চিত্র ৩.২তে প্রদর্শিত আছে। বর্তমানে দেশের একটি বৃহৎ অংশজুড়ে অগভীর এবং এমনকি তারা নলকূপগুলোও পর্যাপ্ত পানি উত্তোলন করতে পারছে না। বিশেষ করে পরিস্থিতিটি খারাপ হচ্ছে শুষ্ক মৌসুমে। নতুন ধরণের নলকূপে আরও নিম্ন-গভীরতার হাউজিং পাইপ ব্যবহার শুরু করেছে ডিপিএইচই। উদ্দেশ্য হলো ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তরসমূহের পুনঃঅবনমন রোধ করা।

সেচের জন্য উত্তোলিত পানির কারণে পানিস্তর নেমে যাওয়া বরেন্দ্রভূমির মত বহু এলাকার খাবার পানি ব্যবহারকারীদের জন্য উদ্বেগের বিষয়। ভবিষ্যতে এধরণের বিতর্কিত পানি ব্যবহারে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এটি একটি অন্যতম কারণ।

৩.৩.৫ পরিমাণগত লভ্যতার প্রভাবকসমূহ

পানিস্তর ব্যতীরেকে প্রাকৃতিক গ্যাসের কারণেও পানি উত্তোলন বাধাগ্রস্ত হয়, যা সাকশন পাম্পের পানি উত্তোলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং নিমজ্জনযোগ্য (submergible) পাম্পের অবক্ষয়কে (corrotion) ত্বড়ান্বিত করে।

পাবনা ও নাটোর (চলনবিল এলাকা), সিলেট ও যশোর জেলা, এবং যমুনা নদীতীরবর্তী এলাকার (যেমন মানিকগঞ্জ) নির্দিষ্ট কিছু স্থানে বিদ্যমান বোল্ডার ও গ্রাভেল স্তর গভীরতম কূপ খননকে বাধাগ্রস্ত করে। এধরণের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার একটি উপায় হতে পারে যথাযথ পাওয়ার রিগের ব্যবহার।

৩.৩.৬ নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

নীতিমালা

ভূ-গর্ভস্থ পানি উন্নয়ন, এর ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থা যুক্ত। উভয় পানিসম্পদ এবং নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে পর্যাপ্ত জাতীয় নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের কার্যকর ব্যবহার, সুরক্ষা ও স্থায়িত্বশীলতার নিশ্চিয়তাবিধানে কোন সমন্বিত কৌশল প্রণীত হয়নি। এ বিষয়ে অর্জিত অগ্রগতির অধিকাংশই এডহক ও চাহিদাভিত্তিক।

প্রতিষ্ঠানসমূহ

ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত প্রধান সংস্থাগুলোর একটি তালিকা সারণি ৩.৩-এ উপস্থাপিত হয়েছে। তালিকাটির সাথে বেসরকারি খাতের সহযোগীদেরকেও ফার্মার ও হাউজহোল্ডার হিসেবে যুক্ত করা দরকার। এরা ভূ-গর্ভস্থ পানির বৃহত্তম উত্তোলক হলেও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত নয়।

সারণি ৩.৩ঃ ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় যুক্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ

মন্ত্রণালয়	**অধিদপ্তর**	
	মুখ্য ভূমিকা	গৌণ ভূমিকা
পানিসম্পদ	ওয়ারপো, বিডব্লিউডিবি	
স্থানীয় সরকার	ডিপিএইচই, ওয়াসাসমূহ	এলজিআই, এলজিইডি, আরডিএ
কৃষি	বিএডিসি, বিএমডিএ	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)
পরিবেশ		পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই)
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি		বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (বিএইসি)
জ্বালানী ও খনিজসম্পদ		জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ (জিএসবি)
বেসরকারি খাত		ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম), সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস) সিইজিআইএস, কনসাল্টিং ফার্মস্

জিএসবি: জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ

ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত কর্মকাণ্ডকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারেঃ ১) পরিবীক্ষণ; ২) যাচাই বা এ্যাসেসমেন্ট; ৩) সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ; ৪) পানিসম্পদ উন্নয়ন; এবং ৫) গবেষণা ও উন্নয়ন। মুখ্য সংস্থাগুলোর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ভূমিকা বিষয়ে সুপারিশসহ যাচাইকৃত বর্তমান ভূমিকা সারণি ৩.৪-তে বর্ণিত আছে। এগুলো পুণরায় নিচে আলোচিত হয়েছে। বিগত দুই দশকে কিছু কিছু সংস্থার ভূমিকায় নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে। উল্লেখ করার মত সংস্থা হলো বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং অপেক্ষাকৃত কম পরিবর্তনসহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডব্লিউডিবি), যাদের কৃষিজমিতে সেচব্যবস্থা স্থাপনে পূর্বে বৃহত্তর ভূমিকা ছিল কিন্তু বর্তমানে কার্যত কোন ভূমিকা-ই নেই। আরও উল্লেখ্য যে, ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনে বেসরকারি খাতের কর্মকাণ্ড অর্থবহ উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করার মত কোন সংস্থা[২৫] বর্তমানে নেই।

[২৫] সম্ভাব্য অথবা আংশিক নিয়ন্ত্রণকারী, ঢাকা ওয়াসা ব্যতিরেকে

সারণি ৩.৪: ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা বা উন্নয়নে সম্পৃক্ত সরকারি সংস্থার বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যত কর্মকাণ্ড

কর্মকাণ্ড (functions)	ওয়ারপো		বিডব্লিউডিবি		ডিপিএইচই		ওয়াসাসমূহ		বিএডিসি		বিএমডিএ		জিএসবি		এলজিআই	
	বর্তমান	ভবিষ্যত	বর্তমান	ভবিষ্যত	বর্তমান	ভবিষ্যত	বর্তমান	ভবিষ্যত	বর্তমান	ভবিষ্যত	বর্তমান	ভবিষ্যত	বর্তমান	ভবিষ্যত	বর্তমান	ভবিষ্যত
পরিবীক্ষণ (monitoring)	X	X	X	X	X	X	?			X	X	X		X		X
যাচাই (assessment)	X	X	?	X	X	X	X	?	?	X	?Y	X	?		X	
পানিসম্পদ উন্নয়ন (development)			Y	X	X	X	X				X	X				
সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ (protection and regulation)	?	X		X		X	X					?				X
গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D)	?	X	?	X	X	X				X	X	X		X		
ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ জ্ঞান	*	***	**	***	*	***	0	*	*	**	*	**	*	**		*

টীকা

X : বর্তমান অথবা ভবিষ্যত কর্মকাণ্ড
Y : ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড
? : কিছু অথবা সম্ভাব্য কর্মকাণ্ড

ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ জ্ঞান (বর্তমান/ভবিষ্যত)
'***' - শক্তিশালী; '**' - মাঝারি সামর্থ্য; '*' - দুর্বল; '0' – অসমর্থ্য বা কোন সামর্থ্যই নেই।

সারণি ৩.৪-এ বিভিন্ন অধিদপ্তরের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান সম্পর্কিত একটি যাচাইও যুক্ত আছে। তদানুযায়ী, কোন অধিদপ্তরই বর্তমানে শক্তিশালী সামর্থ্যের অধিকারী নয় এবং অধিকাংশই দুর্বল শ্রেণীভুক্ত। যাহোক, শক্তিশালী স্কোর বা মান ওয়ারপো, বিডব্লিউডিবি ও ডিপিএইচই'র জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত। অধিকাংশ সংস্থার নিম্ন-স্কোর প্রাপ্তির প্রধান কারণ হলো স্টাফিং বা কর্মী পদায়ন। মুখ্য সংস্থাগুলোর কোনটাতেই পর্যাপ্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ পেশাজীবী হয় স্থায়ীভাবে না হয় চুক্তিতে অথবা পরামর্শক হিসেবেও নাই। এটিই সম্ভবত কার্যকর ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা অর্জনের সর্বাপেক্ষা বড় বাঁধা।

৩.৩.৭ বর্তমানে অসম্পাদিত ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

বর্তমানে ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অনেক কার্যক্রম হয় অসম্পাদিত অথবা সেগুলো করা হলেও তা অপর্যাপ্ত বা যথোপযুক্ত প্রচেষ্টা গৃহীত হচ্ছে না। এগুলোর অন্তর্ভুক্ত আছে:

- গভীর পানিস্তরের অনুসন্ধান, যাচাই ও পরিবীক্ষণ;
- আর্সেনিক অনুসন্ধান, যাচাই, পরিবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
- পানির উত্তোলন পরিবীক্ষণ;
- ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণগত মান সুরক্ষা এবং দূষিত মাটি ও ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিশোধন;
- ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাশয় ও পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল জলাভূমির (ecologically sensitive wetlands) সম্প্রসারণ (augmentation);
- ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের লাইসেন্সিং পদ্ধতি প্রবর্তন;
- কূপ খননের লাইসেন্সিং ব্যবস্থা;
- ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়ার নেতিবাচক প্রভাব কমিয়ে আনতে কৃত্রিম পুনঃভরাট (artificial recharge);
- সাব-সারফেস ড্যাম তৈরির মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের (groundwater reservoirs) সংখ্যা বৃদ্ধি;
- বিদ্যমান ও পরিকল্পিত অভ্যাসের স্থায়িত্বশীলতা যাচাই; এবং
- প্রয়োজনীয় আইনি কর্ম-কাঠামো (legislative framework) তৈরি।

৩.৩.৮ ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য সুপারিশমালা

ভূ-গর্ভস্থ পানির সীমাবদ্ধ উপযোগিতা ও একটি সমন্বিত কৌশলের অনুপস্থিতির ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সামর্থ্য-সংকট দেখা দিচ্ছে এবং ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় অনেক কাজ অসম্পন্ন থাকছে (নিচে দেখুন)। এ থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় জরুরি আমূল প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন ও পদ্ধতিগত উন্নতিবিধানের (upgradation) তাগিদ সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে থাকছে:

- খসড়া পানি আইনে ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার সমস্যাগুলো অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (বিষয়টি নীতিমালা, কৌশল ও প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণিত আছে) প্রতিষ্ঠা; এবং

- সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলোর সামর্থ্য বৃদ্ধি। এর মধ্যে থাকবে ওয়ারপো, ডিপিএইচই, ওয়াসা ও বিডব্লিউডিবি'র মত সেক্টর সংস্থাগুলোতে ভূ-গর্ভস্থ পানি পেশাজীবীর স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক পদ সৃষ্টি (নীতিমালা, কৌশল ও প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে)।

৩.৪ পানির গুণগত মান

৩.৪.১ পানির গুণাগুণ মানদণ্ড ও নির্দেশিকা (guideline)

খাবার পানি বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন ১৯৯৩ এর ভিত্তিতে প্রণীত বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর আলোকে বাংলাদেশের খাবার পানির গুণাগুণ মানদণ্ড নির্ধারিত ও ১৯৯৭ সনে প্রকাশিত। মানদণ্ডের তালিকায় ৫৫ টি ভৌত (physical), রাসায়নিক (chemical) ও অনুজীবিক (microbiological) স্থিতিমাপ (parameter) সংযুক্ত। কিছু কিছু মানদণ্ড বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইনে প্রদত্ত পরিমাপ (value) থেকে ভিন্ন এবং এর কারণ সবসময় পরিস্কার নয়। যেসব বাংলাদেশ মানদণ্ডের পরিমাপ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইনে প্রদত্ত স্থিতিমাপ থেকে ভিন্ন, সেগুলোর তুলনা ও মন্তব্য সংযুক্তি ৫-এ উপস্থাপিত হয়েছে।

৩.৪.২ পানির গুণাগুণ পরিস্থিতি

১৯৯৮-৯৯ সনে সম্পন্ন জাতীয় পানি-রাসায়নিক জরিপে (hydro-chemical survey) ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ মূল্যায়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা ব্যতীত সমগ্র দেশের জন্য একটি ভিত্তিমাপ (baseline) প্রণীত হয়েছে। অতিরিক্ত হিসেবে সম্পন্ন হয়েছে প্রাকৃতিক পানির গুণাগুণ ও এ্যানথ্রোপোজেনিক দূষণ বিষয়ে বেশ কিছু স্থানীয় ও আঞ্চলিক সমীক্ষা।

জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব এবং নান্দনিক (aesthetic) ও ভৌগলিক বিস্তার বিবেচনায় পানির গুণগত স্থিতিমাপগুলোকে নিম্নোক্তরূপে বিভক্ত করা যেতে পারে (সারণি ৩.৫)।

সারণি ৩.৫: পানির গুণগত মানের স্থিতিমাপসমূহের ধরণ

পানির গুণগত মানের স্থিতিমাপসমূহের ধরণ	**স্থিতিমাপসমূহ** (parameter)
সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক স্থিতিমাপ এবং যা বিস্তৃতভাবে প্রযোজ্য	*আর্সেনিক, আয়রণ, ম্যাঙ্গানিজ ও লবণাক্ততা*
প্রাকৃতিক স্থিতিমাপসমূহ, যেগুলো স্থানীয়ভাবে প্রযোজ্য অথবা অল্প-বিস্তৃত সমস্যা হিসেবে বিবেচিত	*ব্যারিয়াম, বোরোন, ইউরেনিয়াম, নাইট্রেট ও এ্যামোনিয়াম*
এ্যানথ্রোপোজেনিক স্থিতিমাপসমূহ: এসকল স্থিতিমাপের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ যথাযথ পরিবীক্ষণ ও সম্ভাব্য সমস্যার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে কমিয়ে আনা যায়	*মাইক্রোবায়োলজিক্যাল, এগ্রোকেমিক্যাল ও শিল্পকারখানার দূষণ*
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত স্বাস্থ্যসংক্রান্ত স্থিতিমাপসমূহ, কিন্তু এগুলো বাংলাদেশে ঘটার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে (প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন)	*মারকারি, টিন, রেডিওএকটিভিটি, র‍্যাডন ও সিলভার*

আর্সেনিক: দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের ওপর আর্সেনিকের স্বাস্থ্যগত প্রভাব এতটাই মারাত্মক প্রতিভাত যে, আর্সেনিক নিরসনে সেক্টরের কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান অত্যাবশ্যক। কার্যক্রমগুলো পরিস্কারভাবে দুই ধরণের: ১) সংক্রমিত পানির উৎস থেকে ঝুঁকি অপসারণ, এবং ২) ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বিদ্যমান নিরাপদ ও নতুন পানির উৎস সুরক্ষা। আর্সেনিক বিষয়ে উচ্চ অগ্রাধিকারমূলক মনোযোগ প্রদানের বিবেচনায় এটি পরবর্তী অনুচ্ছেদে পৃথকভাবে আলোচিত।

আয়রণ ও ম্যাঙ্গানিজ: এগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ের অগ্রাধিকারভুক্ত। 'ভাল' পানি পাওয়ার নান্দনিক দিক (aesthetic aspects) ও স্বাস্থ্যভিত্তিক বিষয়গুলোর যৌথ প্রয়োজনীয়তা থেকে অগ্রাধিকারটি চিহ্নিত, সুনির্দিষ্টভাবে পানিতে ম্যাঙ্গানিজের উপস্থিতি লিটারপ্রতি ০.৪ মিলিগ্রামের বেশি হলে। গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত নলকূপের তুলনায় নগর ও পাইপবাহিত গ্রামীণ পানি সরবরাহের জন্য এই লক্ষ্যটি অর্জনের একটি জোড়ালো চাহিদা অনুভূত হবে, বিশেষ করে যেখানে পানির নান্দনিক দিকগুলো গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকবে।

লবণাক্ততা: উপকূলীয় এলাকার বিস্তৃত অগভীর পানির স্তরসমূহ আগাগোড়া লবণাক্ত। দেশের অভ্যন্তরে বিশেষ করে কুমিল্লা ও চাঁদপুর জেলার পকেট অঞ্চলগুলোর পানিতেও লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

অণুজীবিক সংক্রমণ (microbiological contamination)**:** এটি দেশের সকল পানি সরবরাহ পদ্ধতির জন্যই একটি বড় দুশ্চিন্তার কারণ। অরক্ষিত ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির উৎসে এধরণের সংক্রমণ ঘটে মানুষ ও জীব-জন্তুর পয়ঃবর্জ্যের মাধ্যমে। অগভীর ভূ-গর্ভস্থ পানিও গর্ত পায়খানা ও ভূতলে গচ্ছিত কঠিন বর্জ্য থেকে নিঃসরিত ময়লা পানি দ্বারা সংক্রমিত হয়। পানি সরবরাহ কার্যক্রম ও গৃহস্থালীতে ব্যবহার, উভয় পর্যায়েই ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা ও সংরক্ষণ এবং পানির অস্বাস্থ্যসম্মত ব্যবহার পুনঃসংক্রমণ ঘটায়। বিভিন্ন ধরণের পানির উৎস (উদারহরণস্বরূপ নলকূপ, কূয়া ও পিএসএফ) ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীতে এধরণের সংক্রমণ সাধারণ ঘটনা। বিষয়টি পানি-নিরাপত্তা পরিকল্পনা (water safety plan) বিষয়ক পরের অনুচ্ছেদটিতে পৃথকভাবে আলোচিত।

সঠিকভাবে জাতীয় খাবার পানির মানদণ্ড নির্ধারণ অতি গুরুত্বপূর্ণ। মানদণ্ড সঠিকভাবে নির্ধারিত না হলে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হবে না এবং এক্ষেত্রে বিনিয়োগ ভুলভাবে পরিচালিত ও ভ্রান্তভাবে অগ্রাধিকারভুক্ত হবে। পুনরায়, এসকল মানদণ্ড হলো দক্ষতার মাপকাঠি (performance criteria), যার মাধ্যমে সরকার খাবার পানি সরবরাহকারীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করবে। অতঃপর, জাতীয়ভাবে একটি পানির মান পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। মানদণ্ড পর্যালোচনার জন্য পরিবীক্ষণ অত্যাবশ্যক, পর্যাপ্ত পরিবীক্ষণ ব্যতীরেকে মানদণ্ড পরিবর্তীত হতে পারে না।

৩.৪.৩ পানির মান পরিবীক্ষণ

পানির মান পরিবীক্ষণ জনগোষ্ঠীতে নিরাপদ পানি সরবরাহের একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। পানির মান সার্ভিলেন্স কাজে বাংলাদেশের সামর্থ্যও সীমিত। ডিপিএইচ, পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE) ও বিএসটিআই পানির মান সার্ভিলেন্সের জন্য দায়বদ্ধ; যাহোক, গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যমান বিপুলসংখ্যক পানির উৎস পরিবীক্ষণ কাজের প্রয়োজনীয়তার তুলনায় জনশক্তি ও অন্যান্য উপকরণের দিক থেকে তাদের সামর্থ্যও পর্যাপ্ত নয়। ডিপিএইচই একটি 'ওয়াটার কোয়ালিটি সার্ভিলেন্স প্রটোকল' তৈরি করেছে, যেখানে বর্ণিত আছে পানি পরীক্ষার স্থিতিমাপ ও পদ্ধতি এবং একটি আদর্শ অবস্থায় নমুনা সংগ্রহের সময়ান্তর (frequency)। কিন্তু লক্ষ লক্ষ পানির উৎস পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে বিদ্যমান পানি পরীক্ষা সুবিধার সীমিত সামর্থ্যের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে প্রটোকলটি পুনঃপর্যালোচিত হওয়া এবং পরীক্ষার স্থিতিমাপ সংখ্যা ও সময়ান্তর কমিয়ে আনা দরকার। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, পানি পরীক্ষার দায়িত্ব যতটা সম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করা প্রয়োজন।

আদর্শগতভাবে, একটি দেশের পানির মান পরিবীক্ষণ তিনটি পর্যায়ে হওয়া দরকার, যা সারণি ৩.৬-এ উপস্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে ১ম ও ২য় পর্যায়ে কিছু পরিবীক্ষণ হচ্ছে, তবে ৩য় পর্যায়ে পরিবীক্ষণের জন্য তেমন কোন কার্যক্রম বা নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা নাই। পরিবীক্ষণ পর্যায়-১ অনুসারে পানির মান নিশ্চিতকরণে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বাধ্যতামূলক ভূমিকা নির্ধারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই পর্যায়ের পানির মানেই গ্রহিতাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি নিহিত।

৩.৪.৪ পানির মান বিষয়ক সুপারিশমালা

খাবার পানির মানসংক্রান্ত সুপারিশমালা নিম্নরূপঃ

- বাংলাদেশের খাবার পানির মানদণ্ড, বা অন্ততপক্ষে যে মানদণ্ডগুলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইনে বর্ণিত মানদণ্ড থেকে ভিন্ন এবং যেগুলোর গাইডলাইন থাকলেও মানদণ্ড উল্লেখ নেই, সেগুলোর পুনঃপর্যালোচনা ও সংশোধনের জোড়ালো সুপারিশ করা হচ্ছে। পুনঃপর্যালোচনা ও সংশোধনের সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ বিবেচনা রাখতে হবে:

    - মানবদেহে লিটারপ্রতি ৫০ মাইক্রোগ্রাম (৫০ μg/l) আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে একটি গবেষণার সমর্থনে একটি পর্যায়ভুক্ত সময়মেয়াদে (on a phased timescale) আর্সেনিক মানদণ্ড লিটারপ্রতি ১০ মাইক্রোগ্রামে (১০ μg/l) নামিয়ে আনা;

- o স্বাস্থ্যগত ও নান্দনিক বিবেচনাগুলোর মধ্যে পার্থক্যকরণ (differentiating), বিশেষ করে ম্যাঙ্গানিজের জন্য;
- o খাবার পানি (স্বাস্থ্যগত) ও পরিবেশগত মানদণ্ডের (উদারহরণস্বরূপ, এ্যামোনিয়া) মধ্যে পার্থক্যকরণ।

- বর্তমান প্রটোকলটির পুনঃপর্যালোচনাসাপেক্ষে একটি ব্যাপকভিত্তিক (comprehensive) পানির মান পরীক্ষা (water quality testing protocol) প্রটোকল প্রণয়ন;

- সার্ভিলেন্সসহ পানির মান পরিবীক্ষণের একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা এবং সেখানে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা ও দায়দায়িত্বের বিশদ বর্ণনা প্রদান। এখানে পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্থানীয় সরকারকে নিয়ন্ত্রণ ও নিজ নিজ অধিভুক্ত এলাকায় পানির মান নিশ্চিতকরণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। এটি করতে হলে স্থানীয়ভাবে পানির মান পরিবীক্ষণকে জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (MIS) সাথে সমন্বিত করতে হবে; এবং

- পানির মান পরীক্ষার অবকাঠামোগত ও পরীক্ষাগার সুবিধার সম্প্রসারণ।

সারণি ৩.৬: পানির মান পরিবীক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়/স্তর

পরিবীক্ষণ পর্যায়/স্তর	কর্মকাণ্ড	বাস্তবায়নের দায়িত্ব	মন্তব্য
পর্যায় ১	একটি নির্দিষ্ট খাবার পানি সরবরাহ পদ্ধতির জন্য পানির মান পরীক্ষার স্থিতিমাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষনের অংশ হিসেবে পানি সরবরাহকারীর জন্য এটি একটি নিয়মিত কাজ।	নগর এলাকায় সকল ওয়াসা এবং পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট পানি সরবরাহ শাখা। গ্রামীণ এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ, জনগোষ্ঠী ও ব্যক্তিগত খানাবাড়ি।	সরকার, স্থানীয় সরকার বা এনজিও প্রদত্ত গ্রামীণ পানি সরবরাহ পদ্ধতিগুলোর পরিচালনা ও সংরক্ষণ দায়িত্ব জনগোষ্ঠীর উপর অর্পিত বা হস্তান্তরিত।
পর্যায় ২	সরকার কর্তৃক তার নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতাবলে বিভিন্ন সরবরাহকারী/উৎপাদনকারী/কর্তৃপক্ষ/মালিকের মাধ্যমে সরবরাহকৃত পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ।	এগুলি সাধারণত খাবার পানির মান বিষয়ে তৃতীয় পক্ষ সার্ভিলেন্স হিসেবে গণ্য। জটিল প্রেক্ষিতে দায়িত্বটি কোন বিশেষায়িত সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা অথবা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে অর্পন করা যেতে পারে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন নির্ধারিত হবে, যার মাধ্যমে কাজটি সম্পাদিত হবে।
পর্যায় ৩	যে কোন পানির উৎসে (ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ) সরকার কর্তৃক তার নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ হিসেবে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত জাতীয় সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পানির মান বিষয়ে পরিবীক্ষণ প্রবণতা/পরিবর্তন (যেমন: নির্দিষ্ট কোন একটি স্থিতিমাপের কেন্দ্রিভবনে হ্রাস বা বৃদ্ধি এবং নতুন ক্ষতিকারক জৈব, অজৈব ও অন্যান্য বস্তুর যোগ)।	এরকম রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাভুক্ত পরিবীক্ষণ কার্যক্রমকে জাতীয় পানিসম্পদের গুণগত মান সার্ভিলেন্স (water quality surveillance of national water resources) অভিহিত করা যায়।	সরকার প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন নির্দিষ্ট করবে।

সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (২০১০) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা বিষয়ে অভ্যন্তরীণ দলিল/নথি।

৩.৫ আর্সেনিক নিরসন

৩.৫.১ সংক্রমণ পরিস্থিতি

ডিপিএইচই কর্তৃক গৃহীত বাংলাদেশ আর্সেনিক মিটিগেশন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (BAMWSP) ২০০৪[২৬] এর অধীনে ২০০০-৩ সনে দেশের ২৭২টি উপজেলার সকল নলকূপ (প্রায় ৫ মিলিয়ন) চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে প্রতিভাত হয় যে, দেশের প্রায় ২৯ শতাংশ হস্তচালিত নলকূপ বাংলাদেশ মানদণ্ডের (৫০ পিপিবি) অতিরিক্ত মাত্রায় আর্সেনিক সংক্রমিত। ডিপিএইচই/ইউনিসেফের পরবর্তী জরিপটি (২০০৩)[২৭] অতিরিক্ত ১৯২ উপজেলার ০.১৬ মিলিয়ন নলকূপের জন্য সম্পন্ন হয়, যেখানে দেখা যায় যে ৩ শতাংশ নলকূপ আর্সেনিক সংক্রমিত। আর্সেনিক সংক্রমিত নয় বিবেচিত বাঁকী উপজেলাগুলোসহ দেশে সর্বমোট আর্সেনিক সংক্রমিত হস্তচালিত নলকূপের পরিমাণ ১৯ শতাংশ। অগভীর স্তর (১৫০ মিটারের নিচে) ও গভীর স্তরে (১৫০ মিটারের উপরে) নলকূপে আর্সেনিক সংক্রমণের প্রবণতা চিত্র ৩.৩-এ প্রদর্শিত হয়েছে।

ডিপিএইচই/বামওয়াসপ (২০০৪) প্রাক্কলন অনুযায়ী দেশে ৫০ পিপিবি'র বেশি আর্সেনিক সংক্রমণযুক্ত খাবার পানির ঝুঁকি বহনকারী জনসংখ্যা প্রায় ২০.২ মিলিয়ন। এ থেকে আরও দেখা যায় যে, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক যেসমস্ত অঞ্চলে বসবাস করে সেখানকার শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি পানির উৎস আর্সেনিক সংক্রমিত। সর্বশেষ সংশোধিত প্রাক্কলনটি পাওয়া যায় এমআইসিএস ২০০৯ শীর্ষক জরিপ (survey) থেকে। যেখানে দেখা যায়, দেশের ১২.৬ শতাংশ মানুষ এখনও ৫০ পিপিবি'র বেশি আর্সেনিক সংক্রমিত পানি পান করছে। এই সংখ্যার ৩.১ শতাংশ আবার ২০০ পিপিবি'র বেশি আর্সেনিক সংক্রমতি পানি পান করে, যা স্বাস্থ্যের জন্য বিরাট হুমকিস্বরূপ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী ১০ পিপিবিকে গ্রহণযোগ্য সীমা বিবেচনায় নিলে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৩.১ শতাংশে। স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তর সম্পাদিত ২০০৯ সনের জরিপের মাধ্যমে সনাক্ত দেশে সরকারিভাবে স্বীকৃত আর্সেনিক (arsenicosis) রোগীর সংখ্যা প্রায় ৩৭,০০০।

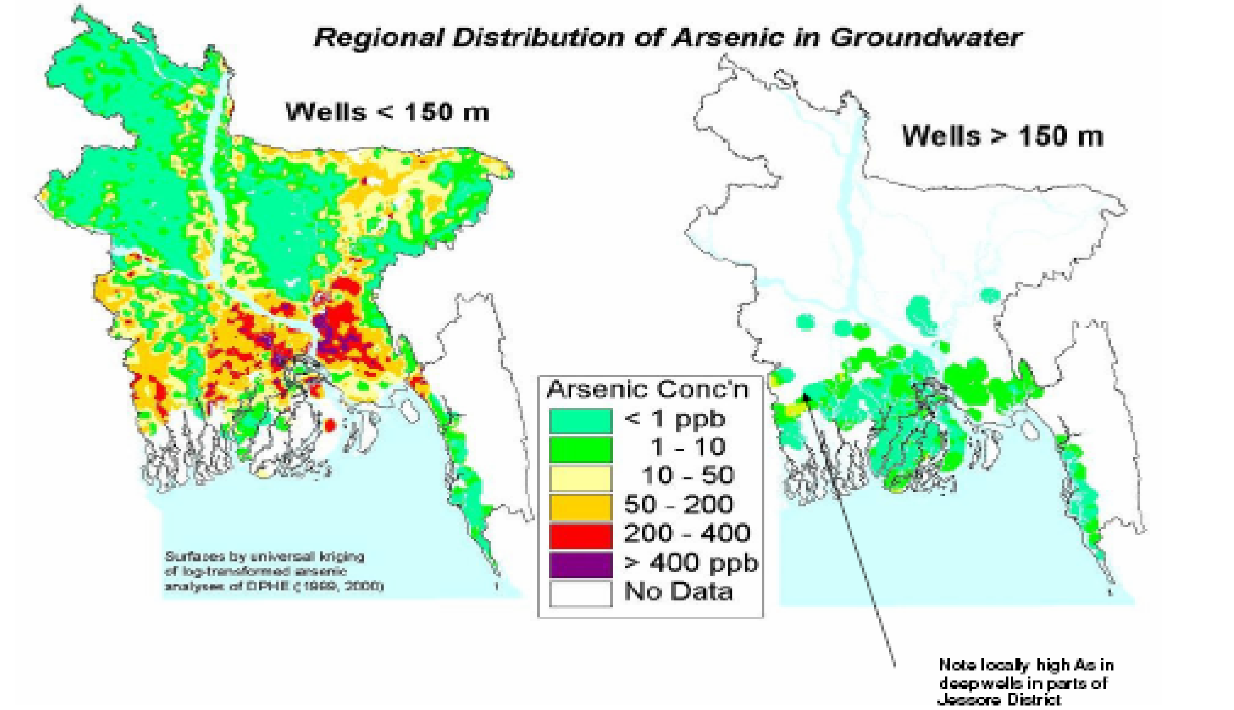

চিত্র ৩.৩: ১৫০ মিটার পর্যন্ত (বামদিকের চিত্র) ও ১৫০ মিটারের অধিক (ডানদিকের চিত্র) গভীরতায় স্থাপিত নলকূপে আর্সেনিকের বিন্যাস/বন্টন

[২৬] বাংলাদেশ আর্সেনিক মিটিগেশন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট।
[২৭] গ্রামীণ এলাকায় পানি সরবরাহ, পরিবেশগত স্যানিটেশন ও হাইজিন।

বিকল্প খাবার পানির উৎস হিসেবে সরকার, এনজিও ও একক পরিবার কর্তৃক আর্সেনিকমুক্ত পানির জন্য গভীর নলকূপ ও অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। একটি নীতি পরামর্শমূলক টীকা (policy advisory note) ২০০৭-এ প্রাক্কলিত হয়েছে যে, প্রায় ১৪ শতাংশ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কোন না কোন একটি আর্সেনিক-নিরাপদ প্রযুক্তিতে অভিগম্যতা আছে।

দেশের ৩০১টি উপজেলার ৩,১৩২টি আর্সেনিক সংক্রমিত ইউনিয়নের নিরসন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (এলজিডি/ডিপিএইচই/জাইকা, ২০০৯) থেকে দেখা যায় যে, ইতোমধ্যে স্থাপিত নিরাপদ পানির উৎস সংখ্যা ও জরুরি ভিত্তিতে নিরাপদ পানির উৎস দরকার এমন এলাকাগুলোর মধ্যে বিস্তর ঘাটতি বা শুন্যতা (gap) রয়েছে। আর্সেনিক সংক্রমণ ও আর্সেনিক রোগীর সংখ্যা বিষয়ে সার-সংক্ষেপ যথাক্রমে সারণি ৩.৭ ও ৩.৮ এ উপস্থাপিত হয়েছে।

সারণি ৩.৭: বিভিন্ন আর্সেনিক সংক্রমিত ও নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজভুক্ত এলাকার অধীন ইউনিয়ন সংখ্যা

সরকারি নিরাপদ পানির কভারেজ	আর্সেনিক সংক্রমিত নলকূপের শতকরা হার					
	<২০%	২০ - ৪০%	৪০ - ৬০%	৬০ - ৮০%	>৮০%	মোট
<২০%	১৪৩	৩৫	৫১	৬৭	১৮৮	৪৮৪
২০ - ৪০%	১১৫	৭৫	৮৬	৯৪	১৪৫	৫১৫
৪০ - ৬০%	৪৪৯	১৪০	৮৯	৬৮	৭৬	৮২২
৬০ - ৮০%	৫০৭	১২০	৩৭	৫৭	৩১	৭৫২
৮০ - ১০০%	২১৩	৪৬	২১	১৪	১২	৩০৬
>১০০%	১৪৯	৩২	২২	২৫	১৩	২৪১
কোন তথ্য নেই	৯	১	১	০	১	১২
মোট	**১,৫৮৫**	**৪৪৯**	**৩০৭**	**৩২৫**	**৪৬৬**	**৩,১৩২**

সারণি ৩.৮: বিভিন্ন আর্সেনিক সংক্রমিত ও নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজভুক্ত এলাকার অধীন চিহ্নিত আর্সেনিকোসিস রোগীর সংখ্যা

সরকারি নিরাপদ পানির কভারেজ	আর্সেনিক সংক্রমিত নলকূপের শতকরা হার					
	<২০%	২০ - ৪০%	৪০ - ৬০%	৬০ - ৮০%	>৮০%	মোট
<২০%	১৮৯	২২৩	৩৭০	৫৩৫	৭,২০৪	৮,৫২১
২০ - ৪০%	৪২৮	৬৬৬	৯৩৫	১,০৩৪	৮,৮৮৮	১১,৯৫১
৪০ - ৬০%	১,৮৮৫	১,৮৯০	১,২১৩	৭৯২	১,৭০৮	৭,৪৮৮
৬০ - ৮০%	১,৬৮২	১,০৪৯	৬৩১	১,৩৪৮	৫০৯	৫,২১৯
৮০ - ১০০%	৭৭০	৪৯০	১৪৮	২১৪	২৪৫	১,৮৬৭
>১০০%	৪১৮	৬৭৪	৪৮৩	২৭৪	১১৮	১,৯৬৭
কোন তথ্য নেই	১৮	৮	০	০	০	২৬
মোট	**৫,৩৯০**	**৫,০০০**	**৩,৭৮০**	**৪,১৯৭**	**১৮,৬৭২**	**৩৭,০৩৯**

৩.৫.২ আর্সেনিক নিরসনমূলক কার্যক্রমের সমস্যা ও এ থেকে অর্জিত শিক্ষা

বিগত দশকজুড়ে আর্সেনিক চিহ্নিতকরণ ও নিরসনে সরকার, দাতাগোষ্ঠী ও এনজিও কর্তৃক অনেক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মধ্যে ২৭২ ইউনিয়নের প্রায় ৫ মিলিয়ন নলকূপে আর্সেনিক চিহ্নিতকরণের কাজটি ছিল সম্ভবত সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য অর্জন, কিন্তু আর্সেনিক নিরসনের বিষয়টি বিবেচনায় নিলে অর্জনটি প্রত্যাশার চেয়ে অনেক পিছিয়ে। এসকল কর্মসূচি থেকে অনেক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

- ’নিরাপদ পানি’র ধারণা ও ঝুঁকির বিকল্প অনুসন্ধানের বিষয়টি সময়ের ব্যপ্তিতে উদ্ভূত। অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি/পরিবার ইতোমধ্যে কাছাকাছি কোন নিরাপদ কূপ ব্যবহার শুরু করেছে অথবা তাদের সংক্রমিত নলকূপটি অপেক্ষাকৃত নিম্নতম গভীরতায় পুনঃস্থাপন করেছে, যে উৎসটি তারা নিরাপদ মনে করে থাকে;

- প্রায় ৮০ শতাংশেরও বেশি সরকারি ও এনজিও প্রকল্পগুলোর আর্সেনিক নিরসন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে কেবলমাত্র গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে। পুনঃনবায়নযোগ্যতা এবং লবণাক্ততা ও আর্সেনিকজনিত দীর্ঘমেয়াদি দূষণ ঝুঁকির দিক থেকে এসকল গভীর স্তর যথাযথভাবে যাচাইকৃত নয়। অদ্যাবধি সমাধানগুলো খুবই জনপ্রিয় ও ব্যয়-কার্যকর (cost-effective), কিন্তু এগুলোর কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য তেমন কোন উদ্যোগ গৃহীত হয়নি এবং ফলাফল ক্রমশঃ অবনিতর দিকে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই গভীর পানির স্তরটির জন্য আইনি সুরক্ষা দরকার, যাতে তার লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। যাহোক, আর্সেনিক নিরসনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় এখনও ভূ-গর্ভস্থ পানি আইন প্রণয়নে বা খসড়া পানি আইনের সংশোধনে কোন অগ্রগতি অর্জিত হয়নি;

- কূয়া ও পুকুরের পানি সচরাচর আর্সেনিক-দূষিত নয়, কিন্তু এরা অনুজীবিক ঝুঁকি[২৮] (microbiological risks) বহন করে। অতঃপর, এসকল প্রযুক্তিকে সম্ভাব্য দূষণ থেকে যথাযথ সুরক্ষা প্রদান ও সংরক্ষণ করা দরকার;

- আর্সেনিক মুক্তকরণ প্রযুক্তির বাজারজাতকরণ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে মূলত বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (BCSIR) মাধ্যমে। অদ্যাবধি, প্রতিষ্ঠানটি ছয়টি প্রযুক্তিকে (সনো, রিড-এফ, এ্যালকান, সিডকো, নীলিমা ও স্বদেশ) সাময়িক লাইসেন্স বা ছাড়পত্র প্রদান করেছে। এসকল প্রযুক্তির একটির মূল্যায়ন থেকে বলা হয়েছে, প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত আর্সেনিক শোষণের মিডিয়াগুলো প্রতিস্থাপনের সমস্যাটি রয়েই গেছে এবং এগুলোর বিপণন পরবর্তী কার্যকর ও স্থায়িত্বশীল সেবাব্যবস্থা[২৯] বিদ্যমান নেই;

- গ্রামীণ পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় একটি মিশ্র সাফল্য অর্জিত হয়েছে। অধিকাংশ পদ্ধতিতেই আর্সেনিকমুক্ত ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সামান্য কিছু পদ্ধতিতে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার দেখা যায়। ১২০ প্রকল্পের[৩০] (স্কিমের) একটি পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, দুর্বল পরিচালনা ও সংরক্ষণ এবং অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কারণে এর প্রায় অর্ধেকই কোন কাজ করে না।

- ডিপিএইচই'র পরীক্ষাগার সুবিধাদি অনেকখানি বেড়েছে, কিন্তু এর ব্যবহারিক সুফল এখনও পাওয়া যায়নি। প্রশিক্ষিত কর্মী না থাকা এক্ষেত্রে একটি বড় বাঁধা। ফিল্ড টেস্ট কিটস্ সমস্যার একটি সমাধান পাওয়া গেছে এবং এগুলো এখন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠী নিজেরাই পানি পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করছে। স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে ফিল্ড টেস্টিং পদ্ধতি ছড়িয়ে দিতে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আর্সেনিক পরীক্ষার ফিল্ড কিট প্রয়োজন। বর্তমানে ডিপিএইচই ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এধরণের একটি স্বল্পব্যয়ী আর্সেনিক পরীক্ষার কিট উদ্ভাবণে কাজ করে যাচ্ছে; এবং

- যদিও বিশাল তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা হয়েছে, এগুলোর (অর্থাৎ তথ্যের) ব্যবস্থাপনা ও বিনিময় পদ্ধতি খুবই দুর্বল। ন্যাশনাল আর্সেনিক মিটিগেশন ইনফরমেশন সেন্টার (NAMIC) BAMWSP কর্তৃক পরীক্ষিত ৫ মিলিয়ন নলকূপের একটি তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেছে, কিন্তু সেখানে অন্য কোন তথ্য সংগৃহীত হয়নি এবং অবধারিতভাবেই BAMWSP শেষ হওয়ার সাথে সাথেই NAMIC অধ্যায়েরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এই সময়টাতে আর্সেনিক পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (APSU) তথ্য বিনিময়ের ধারাটি এদের পরিসমাপ্তির সময়কাল ২০০৬ সন পর্যন্ত চালিয়ে গেছে। বর্তমানে ডিপিএইচই ও পিএসইউ কর্তৃক একটি ব্যাপকভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

---

[২৮] অনুজীবিক (microbial) ঝুঁকির জন্য আর্সেনিক বিকল্পায়ন (substituting) এর বিপদসমূহ আপসু (APSU) ও ITN-BUET, ২০০৫ কর্তৃক প্রণীত 'রিস্ক এসেসমেন্ট অব আর্সেনিক মিটিগেশন অপশনস্ (RAAMO)"তে বিধৃত আছে।

[২৯] ডেভকনসালটেন্টস্ লিমিটেড কর্তৃক (২০০৯) প্রস্তুতকৃত ডিপিএইচই ও ওসেটার জন্য প্রণীত "ফাইনাল ইভ্যালুয়েশন অব দি পাইলট প্রজেক্ট ফর দি ওয়াটার সেফটি প্ল্যানস্ ফর আর্সেনিক রিমুভাল টেকনোলজিস্"।

[৩০] ডিপিএইচই ও জাইকা (সেপ্টেম্বর ২০০৮) কর্তৃক সম্পাদিত "ইভ্যালুয়েশন অব দি পারফরমেন্স, ভিলেজ পাইপড্ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম (১২০ স্কিমস্)"।

স্বাস্থ্য খাতে রোগী সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা প্রদান এবং রোগতত্ত্ব (epidemiological) গবেষণার জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। দেশব্যাপী উল্লেখযোগ্য জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে জনস্বাস্থ্যের উপর আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে। কৃষি খাতে ঝুঁকির ধারণায় বিরাট একটি পরিবর্তন এসেছে। এ বিষয়ে সম্পাদিত হয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা, কিন্তু কৃষি সমস্যা নিরসনে তেমন কোন কার্যক্রম গৃহীত হয়নি। পানিসম্পদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়।

৩.৫.৩ আর্সেনিক নিরসনে সুপারিশমালা

আর্সেনিক নিরসনের সুপারিশমালা নিম্নরূপঃ

- সবচেয়ে স্বল্পব্যয়ী নিরসন পদ্ধতি হিসেবে নলকূপের পরীক্ষা (testing), চিহ্নিতকরণ (marking), ও অন্য প্রযুক্তিতে উত্তরণ (switching) প্রসারে স্থানীয় উদ্যোগের প্রতি সহযোগিতা প্রদান;
- আর্সেনিক নীতিমালা ২০০৪ এর অধীনে পানি সরবরাহের জন্য একটি পৃথক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরি এবং সমন্বয় বৃদ্ধিতে কার্যক্রম গ্রহণ। বিষয়টি অধ্যায় ৫-এ বিস্তারিত বর্ণিত আছে।
- সুনির্দিষ্ট এলাকার জন্য আলাদা-আলাদা অগ্রাধিকার নির্ধারণ। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে এলজিডি/ডিপিএইচই/জাইকা (২০১০) কর্তৃক চিহ্নিত অতি উচ্চমাত্রার আর্সেনিক সংক্রমিত ও নিরাপদ পানির অতি অল্প কভারেজভুক্ত ১৮৭টি এবং উচ্চমাত্রার আর্সেনিক সংক্রমিত ও নিরাপদ পানির স্বল্প কভারেজভুক্ত ২১৫টি ইউনিয়ন;
- অতি উচ্চমাত্রার আর্সেনিক সংক্রমিত কিন্তু নিরাপদ পানির স্বল্প কভারেজভুক্ত এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য এসডিপি'র প্রথম পর্যায়েই নিবেদিত (dedicated) আর্সেনিক নিরসন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- গভীর পানিস্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ। বিষয়টি ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ৩.৩ অনুচ্ছেদে আলোচিত;
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ যেমনঃ আর্সেনিক-সম্বলিত পয়ঃবর্জ্যের নিরাপদ অপসারণ এবং সাব-সারফেস (in-situ) আর্সেনিক অপসারণ (আরও দেখুন অনুচ্ছেদ ৩.১১) বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- একটি নির্দিষ্ট স্থানের জন্য উপযোগী পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য প্রাথমিক জরিপ[৩১] সম্পন্ন করা। বিভিন্ন ধরণের মাঠ পর্যায়ের জরিপ (উদাহরণস্বরূপ টেস্ট বোরিং, ওয়াটার কোয়ালিটি, ওয়াটার লেবেল) ও তথ্য বিশ্লেষণ প্রত্যেকটি আলাদা পদ্ধতির জন্য খুবই প্রয়োজন; এবং
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর (LGIs) মাধ্যমে জনগোষ্ঠী উন্নয়ন।

৩.৬ পানি-নিরাপত্তা পরিকল্পনা (water safety plan)

৩.৬.১ পানি নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উচ্চ কভারেজ জনস্বাস্থ্য ও জনগোষ্ঠীর সুস্থ-জীবনযাপনে খুব একটা প্রতিফলিত হচ্ছে না। অনিরাপদ পানির ব্যবহার অথবা অপর্যাপ্ত নিরাপদ পানি সরবরাহের কারণে মারাত্মকভাবে বাড়ছে রোগভোগের বোঝা। দেশে এখনও ডায়ারিয়া, আমাশয় ও নিউমোনিয়া শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ। প্রতিহাজারে (লাইভ বার্থ) প্রায় ৬২ জন পাঁচবছরের কম বয়সী শিশু প্রতিবছর মৃত্যুবরণ করছে (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২০০৬); শিশুরা বছরে গড়ে তিন থেকে চারবার ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে এবং একবার আক্রান্ত হলে সেটি গড়ে দুই থেকে তিনদিন ও এমনকি কখনও সেটি দুই সপ্তাহেরও বেশি স্থায়ী হচ্ছে। এর ফলে শিশুরা মারাত্মক পানিশুন্যতা ও পুষ্টিহীনতায় ভোগে এবং মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। দেশে গড়ে প্রতিহাজারে ১৮৮ জন বিভিন্নরকম অসুস্থতার শিকার হয়, যার অধিকাংশই অনিরাপদ পানি ও অপর্যাপ্ত স্যানিটেশনের কারণে সৃষ্ট। প্রায় ২০ মিলিয়ন মানুষ ০.০৫

[৩১] এলজিডি ও জাইকা (নভেম্বর ২০০৮) কর্তৃক প্রণীত চূড়ান্ত প্রতিবেদনঃ "সাসটেইনেবল আর্সেনিক মিটিগেশন আন্ডার ইন্ট্রিগেটেড লোকাল গভার্নমেন্ট সিস্টেম ইন যশোর"।

মাইক্রোগ্রাম/লিটারের অধিক এবং ৫০ মিলিয়ন মানুষ ০.০১ মাইক্রোগ্রাম/লিটারের অধিক আর্সেনিক সংক্রমিত পানি পান করছে।

ভূ-গর্ভস্থ পানি, যা দেশের নগর ও গ্রামীণ এলাকার ৯০ শতাংশেরও বেশি খাবার পানির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত, অনুজীবিকভাবে নিরাপদ বিবেচিত এবং যার ফলে পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ও হস্তচালিত নলকূপ অনুজীবিক দিক থেকে নিরাপদ পানি সরবরাহে সক্ষম। ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পানিকে নিরাপদ করতে পরিশোধন পদ্ধতির দরকার হয়। তথাপিও, অনেক পাইপবাহিত পানি সরবরাহ পদ্ধতি ও নলকূপের নমুনা পানি পরীক্ষা করে সেখানে অনুজীবিক সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। আইটিএন ও ডিএফআইডি পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, দেশের মোট অগভীর নলকূপের ২৯ শতাংশ এবং গভীর নলকূপের ৯ শতাংশ ব্যাকটেরিয়া দূষিত। এধরণের দূষণের মূল কারণ হলো নলকূপ ও সেগুলোর আশপাশের অপর্যাপ্ত বা ত্রুটিপূর্ণ সংরক্ষণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত আচরণের বেহাল দশা (রিস্ক এ্যাসেসমেন্ট অব আর্সেনিক মিটিগেশন অপশন, ২০০৫)। অধিকন্তু, নলকূপ অথবা পাইপবাহিত সরবরাহের বেলায় পানির সংযোগস্থল থেকে আহরিত নিরাপদ পানি সংগ্রহের, পরিবহনের ও বাড়িতে সংরক্ষণের সময় দূষিত হতে পারে।

উপর্যুক্ত সমস্যাগুলো একটি ব্যাপকভিত্তিক (holistic) পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে, যার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে জনগণ নিরাপদ পানি পান করছে এবং তা থেকে প্রত্যাশিত স্বাস্থ্য-সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

৩.৬.২ পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার ধারণা ও চর্চা

পানি-নিরাপত্তা পরিকল্পনা *যে কোন পানি সরবরাহ ব্যবস্থার প্রচলিত পরিচালনা ও সংরক্ষণ (O&M) ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন, কেননা এটি একটি বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উৎসরিত এবং তা পানির উৎস সুরক্ষা থেকে শুরু করে গৃহস্থালীতে পানির ব্যবহার পর্যন্ত চলমান পরিবীক্ষণ ও প্রতিরোধমূলক সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে খাবার পানির নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দেয় এবং স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারে গুরুত্ব প্রদান করে।*

পানি-নিরাপত্তা পরিকল্পনা (water safety plan) পানির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের একটি ব্যাপকভিত্তিক (holistic) ধারণা। বিষয়টিকে একটি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, যার মাধ্যমে খাবার পানির উৎস থেকে শুরু করে ব্যবহারের পর্যায় পর্যন্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। কাজটি করা হয় পানি সরবরাহ পদ্ধতির চলমান পরিবীক্ষণ ও প্রতিরোধমূলক সংরক্ষণের মাধ্যমে। পানি-নিরাপত্তা পরিকল্পনা পানি সরবরাহের বিভিন্ন পর্যায়ে নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়, যেমন: খাবার পানির উৎসে সংক্রমণ কমিয়ে আনা, পানি পরিশোধনের পর্যায়ে সংক্রমণ প্রতিরোধ বা কমিয়ে আনা, পানি সংগ্রহ ও বন্টন, যথাযথ পরিবহন ও গৃহস্থালীতে ব্যবহারের সময় সংক্রমণ প্রতিরোধ।

পানি-নিরাপত্তা পরিকল্পনা একটি কাঠামোর অধীনে কাজ করে, যাকে বলা হয় নিরাপদ খাবার পানির কাঠামো (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০০৪)। একটি স্বাস্থ্যভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্যভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পানি-নিরাপত্তা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও একটি সার্ভিলেন্স পদ্ধতির সমন্বয়ে কাঠামোটি গঠিত (বক্স ৩.২ দেখুন)।

বক্স ৩.২: নিরাপদ খাবার পানির কর্ম-কাঠামো

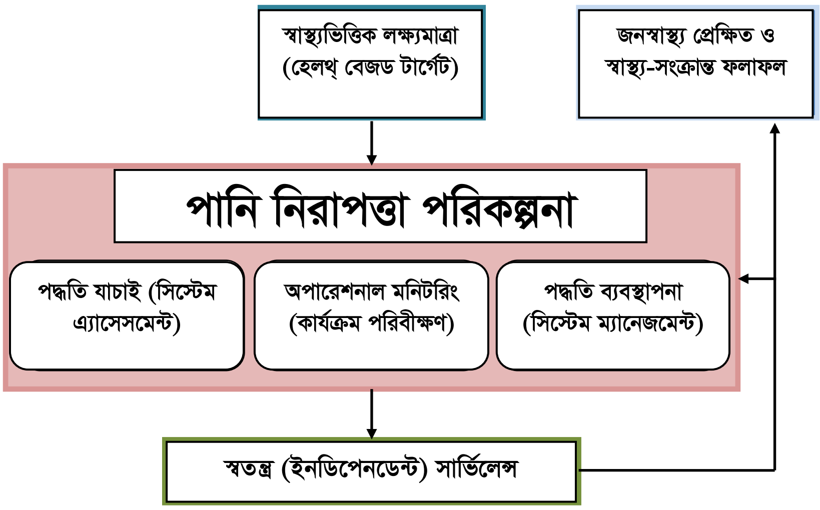

১. ***স্বাস্থ্যভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা:*** *স্বাস্থ্যভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রাসমূহ জনস্বাস্থ্যের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত। এখানে বিভিন্ন ধরণের লক্ষ্যমাত্রা থাকতে পারে, যেমন: রোগ-সংঘটনের মাত্রা হ্রাস (স্বাস্থ্য ফলাফল লক্ষ্যমাত্রা) অথবা পরিশোধন পদ্ধতির মাধ্যমে অনুজীবিক সংক্রমণ অপসারণ (পারফরমেন্স লক্ষ্যমাত্রা)।*

২. ***পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা:*** *পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার তিনটি মূল উপাদান নিম্নরূপ:*

- ***পদ্ধতি যাচাই:*** *খাবার পানির সরবরাহ চক্রটি (উৎস থেকে ব্যবহারের পর্যায় পর্যন্ত) সার্বিকভাবে স্বাস্থ্যভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মানের পানি সরবরাহ করতে পারে কী না, তা নির্ধারণ করা;*
- ***অপারেশনাল মনিটরিং:*** *একটি খাবার পানির পদ্ধতিতে আরোপিত নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যাবলী চিহ্নিতকরণ, যেগুলো একত্রে সরবরাহ পদ্ধতির চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম এবং যার মাধ্যমে স্বাস্থ্যভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করা যায়। চিহ্নিত প্রতিটি নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যাবলীর জন্য যথাযথ পরিবীক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করা জরুরি, যাতে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার কোন ত্রুটি দেখা দেওয়ার সাথে সাথেই তা চিহ্নিত করা ও সময়মত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়; এবং*
- ***ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা:*** *এর মাধ্যমে স্বাভাবিক পরিচালনার সময় অথবা অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতিতে গৃহীতব্য কার্যক্রম বর্ণনা করা হয় এবং পদ্ধতি যাচাই, পরিবীক্ষণ ও যোগাযোগ পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করা হয় এবং সমর্থনমূলক (supporting) কর্মসূচি যেমন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।*

৩. ***সার্ভিলেন্স:*** *এটি একটি স্বতন্ত্র* ***সার্ভিলেন্স****, যার মাধ্যমে পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার যথাযথ ও কার্যকর বাস্তবায়ন মূল্যায়ন (varify) করা হয়।*

এতদঞ্চলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ২০০৪ সনে পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসা একটি অগ্রগামী দেশ হলো বাংলাদেশ। বাংলাদেশে পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার অবতারণা হয় পানির গুণগত মান ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ২০০৫ সনে অনুষ্ঠিত একটি পরামর্শমূলক আলোচনা সভা ও কর্মশালায় উপস্থাপিত ধারণা ও পন্থার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে সকল সহযোগী সংস্থার মধ্যে একটি নির্দেশনামূলক কাঠামো (guiding framework) বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গ্রামীন পানি সরবরাহ, নগর পাইপবাহিত পানি সরবরাহ পদ্ধতি (ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎসভিত্তিক) ও আর্সেনিক অপসারণ প্রযুক্তিসমূহের জন্য প্রথম পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণীত হয়। এসকল মডেল উন্নয়নের পরপরই ২০০৫ থেকে ২০০৭ সন পর্যন্ত গৃহীত অনেকগুলো পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার মাঠ-পর্যায়ে পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন (field testing) সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রেক্ষিত বিবেচনায় গ্রামাঞ্চলের মানুষের ব্যবহার্য খুবই সাধারণ চিত্রসংবলিত উপকরণ তৈরি করা হয়। বিভিন্ন ধরণের সার্ভিলেন্স

উপকরণ (tools) যেমন: স্যানিটারি পরিদর্শন ও পানির মান পরিবীক্ষণ পদ্ধতি তৈরি ও এগুলোর পরীক্ষামূলক ব্যবহার করা হয় এতে।

ডিপিএইচই এবং অন্যান্য এনজিও কর্তৃক ৩২টি গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ও ৬টি নগর এলাকার ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার বাস্তব প্রয়োগযোগ্যতা পরীক্ষিত হয়। পরীক্ষামূলক এসকল প্রকল্পের ফলাফল ইতিবাচক এবং তা জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে বাস্তবায়নের (scaling-up) ভিত্তি রচনা করে। পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা বিষয়ে একটি পৃথক কার্যপত্রও (২০ নং) প্রণীত হয়েছে।

বর্তমানে পানি নিরাপত্তা কর্ম-কাঠামোর খসড়াটি স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর অধীন পিএসইউ কর্তৃক প্রণয়নাধীন আছে। কাজটির অধীনে কাঠামো উপাদানসমূহ যেমন: স্বাস্থ্যভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা, পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা এবং সার্ভিলেন্স প্রটোকল জাতীয় প্রেক্ষিতের আলোকে প্রণীত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত স্বাস্থ্যভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও সার্ভিলেন্স প্রটোকলের খসড়া তৈরির কাজ সংশ্লিষ্ট সেক্টর বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শমূলক আলোচনা সভার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। একটি সাধারণ (generic) পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা ও পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশিকা (guideline) প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত হওয়ার পথে। চূড়ান্তকরণ সাপেক্ষে প্রণীত কাঠামোটি জাতীয় ফোরামের সভায় উপস্থাপিত হবে।

৩.৬.৩ সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

জাতীয় পর্যায়ে পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সমস্যা ও চ্যালেঞ্জগুলো নিম্নরূপ:

- ব্যাপক কার্যক্রম। দেশে প্রায় ১০ মিলিয়ন নলকূপ, যার অধিকাংশই ব্যবহারকারী নিজেরাই স্থাপন করে। নগর এলাকার ৭টি মেট্রোপলিটান সিটি ও ৩০৮টি পৌরসভায়ও একই রকম চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান;
- জাতীয় পর্যায়ে পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার সম্প্রসারণে (scale-up) প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি আবশ্যক। বর্তমানে ব্যাপকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সেক্টরকে প্রশিক্ষিত করতে সীমিত সংখ্যক প্রশিক্ষক রয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় যথেষ্ট সংখ্যক পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, যার মাধ্যমে ব্যাপক সম্প্রসারণের জোড়ালো ভিত্তি রচিত হয়েছে কিন্তু এক্ষেত্রে নগর এলাকার অভিজ্ঞতা এখনো সীমিত;
- জাতীয় পর্যায়ের সহযোগী, সুনির্দিষ্টভাবে পৌর কর্তৃপক্ষের মাঝে পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার সুফল ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে;
- অগভীর নলকূপের পানিতে আর্সেনিক সংক্রমণরোধ আরেকটি চ্যালেঞ্জ। আর্সেনিক নিরসনের একটি উপায় হিসেবে বেশ কিছু বিকল্প প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে, যেগুলো আবার অনুজীবিক সংক্রমণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এর অর্থ হলো ঝুঁকিগুলো রাসায়নিক থেকে অনুজীবিক দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে কিন্তু বিমোচিত হচ্ছে না; এবং
- বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট জ্ঞান প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যেমন: একটি পায়খানা ও পানির উৎসের মাঝখানে নিরাপদ দুরত্ব বজায় রাখতে পায়খানার স্থানান্তর।

৩.৬.৪ পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার কর্ম-নির্দেশনা

বৃহত্তর পর্যায়ে পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য একটি সম্প্রসারণ কৌশল (scaling strategy) দরকার। এরকম একটি কৌশলপত্রের খসড়া ২০০৯ সনে প্রণীত হয়েছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায়। কৌশলপত্রটির মুখ্য বৈশিষ্ট্য হলো:

- **এ্যাডভোকেসি ও সচেতনতা বৃদ্ধি।** নীতি নির্ধারক পর্যায়ে যুক্তিসঙ্গত সচেতনতা বিরাজ করলেও এর সুফল বাস্তবায়ন পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। পৌরসভা মেয়র, কর্মকর্তা ও গ্রামীণ ব্যবহারকারীদের জন্য সাধারণ তথ্য-শিক্ষা-যোগাযোগ (IEC) উপকরণ, যেমন: বুকলেট তৈরির সুপারিশ করা হয়েছে। হস্তচালিত নলকূপ বিক্রেতাদেরকে পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা বিষয়ে তৈরি লিফলেট ক্রেতাদের মাঝে বিতরণে উৎসাহিত করা যেতে পারে। এও সুপারিশ করা হয়েছে যে, পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা ও পানির মান বিষয়ে গঠিত

থিম্যাটিক গ্রুপটি পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার প্রসারে ও সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হবে;

- **সেক্টর প্রতিষ্ঠানসমূহের সামর্থ্য বৃদ্ধি।** আইটিএন-বুয়েট কর্তৃক আয়োজিত পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সটি পুনরায় শক্তিশালী/সমৃদ্ধ করা যেতে পারে, যেখান থেকে সেক্টরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষক এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য মুখ্য প্রশিক্ষক পাওয়া যাবে। পরিবর্তে এসকল প্রতিষ্ঠান পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার ধারণা ও দক্ষতাকে ক্রমান্বয়ে তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেবে। সুপারিশ করা হয়েছে, মুখ্য প্রশিক্ষকদের নিয়ে এটি পুল তৈরি করার। পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার জন্য তৈরি পদ্ধতি ও উপকরণ, যেমন: সার্ভিলেন্স প্রটোকলকে আরও পরিশুদ্ধ করা হবে। পানি পরীক্ষাগারের সামর্থ্য ও আওতাকে এবং ফিল্ড টেস্টিং সুবিধাদি আরও বাড়ানো হবে। গ্রামীণ পানি সরবরাহের বেলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং নগর এলাকার জন্য জনগোষ্ঠী নিজেরাই সম্পৃক্ত হবে; এবং

- **ব্যাপকতা সৃষ্টি** (scaling-up) **ও মুলধারায় সম্পৃক্তকরণ** (mainstreaming)। ব্যাপকতা সৃষ্টির কৌশলে অন্তর্ভুক্ত থাকবে পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার অধিকতর প্রদর্শণীর ব্যবস্থা, সুনির্দিষ্টভাবে শহর এলাকার জন্য এবং চলমান ও নতুন উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহে পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্তকরণ। যুগপৎভাবে, জাতীয় পরিবীক্ষণ পদ্ধতি ও প্রস্তাবিত নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর (regulatory framework) সাথে পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার কর্মকাণ্ডসমূহ সুসমন্বিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

৩.৭ স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার

৩.৭.১ স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারের গুরুত্ব

বিগত দশকজুড়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাসুবিধার অভিগম্যতায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে স্বাস্থ্য-সুফলের দিক থেকে এসকল অগ্রগতির প্রভাব মোটামুটি পর্যায়েই রয়ে গেছে। যদিও শিশুমৃত্যুর (mortality) হার নিম্নগামী, এজন্য ধন্যবাদ দিতে হয় পানি ও স্যানিটেশন সুবিধায় উন্নত অভিগম্যতাকে এবং ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপির (ORT) মত ডায়ারিয়ার উন্নত অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনাকে, পানিবাহিত রোগ সংক্রমণের প্রবণতা এখনো অনেক বেশি। বাংলাদেশে ২০০৭ সনে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার ছিল প্রতি ১০০০ জীবন্ত জন্মে (live birth) ৬৫ জন। গড়পড়তা প্রতি ১০০০-এ ১৮৮ জন নানারকম অসুস্থতায় ভোগে, যার অধিকাংশই ঘটে থাকে অনিরাপদ পানি ও খারাপ স্যানিটেশন ব্যবস্থার কারণে। এসকল ঘটনা থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, পরিস্থিতির উন্নতি হলেও জনগণ, সুনির্দিষ্টভাবে শিশুরা পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত রোগের ঝুঁকি বহন করেই চলছে। অন্য অর্থে, রোগ সংক্রমণ কমিয়ে আনার জন্য কেবলমাত্র ভৌত সুবিধাদিই যথেষ্ট কার্যকর নয়। পানি ও স্যানিটেশনের মাধ্যমে রোগ সংক্রমণের এই পথটি সাধারণভাবে 'মল-মুখের পথ বা faecal-oral routes' হিসেবে পরিচিত, যা বক্স ৩.৩-এ প্রদর্শিত হয়েছে।

বক্স ৩.৩: মল-মুখের মাধ্যমে রোগ সংক্রমণের এফ-ডায়াগ্রাম

টাইফয়েড, কলেরা এবং অধিকাংশ আন্ত্রিক/খাদ্যনালীর কৃমিসহ (হুক কৃমি ব্যতীত) সকল ডায়ারিয়াজনিত রোগ মল-মুখের রোগের শ্রেণীভুক্ত। ডায়ারিয়াজনিত রোগের সবচেয়ে সাধারণ কারণ হলো প্যাথোজেন (রোগসৃষ্টির মাইক্রো-অর্গানিজম, যেমন: ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস)। একজন ব্যক্তির মল থেকে এসব প্যাথোজেন নানারকম সম্ভাব্য সকল পথে পরিসঞ্চালিত (transmitted) হয় এবং নতুন আরেকজন কর্তৃক গলাধঃকরণ হয়। এফ-ডায়াগ্রামটি নিচে প্রদর্শিত হলো।

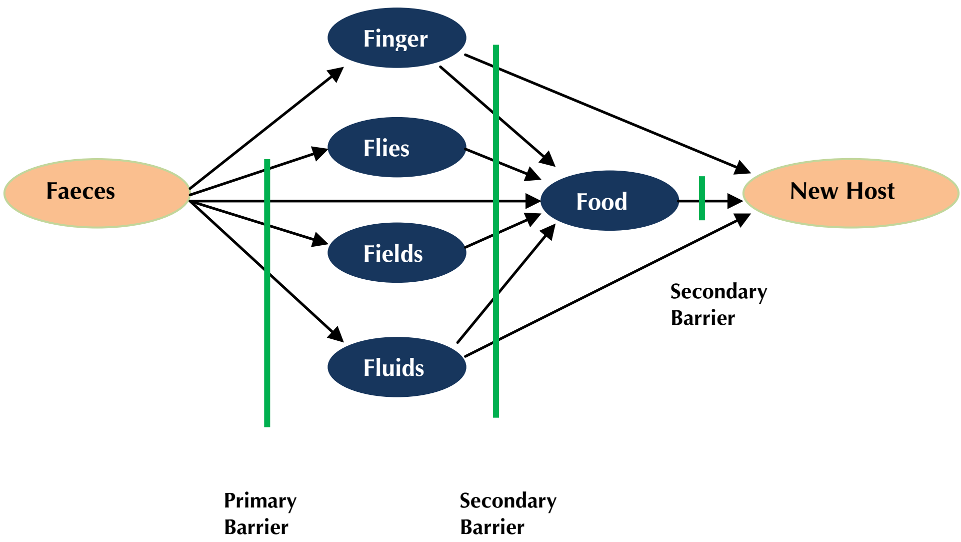

উপরের ডায়াগ্রামে প্রাথমিক প্রতিবন্ধক হলো স্যানিটেশন এবং মাধ্যমিক (secondary) প্রতিবন্ধক হলো স্বাস্থ্যস্মমত আচরণ প্রসার। মল-মুখের সংক্রমণ পথটি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও হাতধোয়ার অভ্যাস দ্বারা ভাঙ্গা সম্ভব হলে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারের কাজটি খুব সহজ হতে পারতো। যাহোক, স্থানীয় পরিবেশে প্যাথোজেনের প্রবেশ ঠেকানো খুবই কঠিন এবং সে কারণেই ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে ও বাড়তে পারে এমন সম্ভাব্য স্থানগুলো কমিয়ে ফেলা ও পরস্পর-সংক্রমণের (cross-contamination) ঝুঁকি সীমিত রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সুনির্দিষ্টভাবে যেখানে প্যাথোজেন গলাধঃকরণের ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি। হাতধোয়ার অভ্যাস, সুনির্দিষ্টভাবে খাবার তৈরি ও গ্রহণের আগে এবং পায়খানা ব্যবহারের পরে বা শিশুদের শৌচকার্য সম্পাদনের পরে, মল-মুখের মাধ্যমে ও খাদ্য তৈরি, সংরক্ষণ, বাসনকোশন ধোয়ার অভ্যাসের মাধ্যমে রোগ সংক্রমণ সীমিত করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সূত্র: এফ-ডায়াগ্রামটি গৃহীত হয়েছে ই.জি. ওয়াগনার এবং জে.এন. ল্যানোইক্স (১৯৫৮) প্রণীত গ্রামীণ এলাকা ও ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পয়ঃবর্জ্য অপসারণ থেকে। ডব্লিউএইচও মনোগ্রাফ সিরিজ নং ৩৯, হু, জেনেভা।

স্বাস্থ্যসম্মত আচরণের অধিক্ষেত্রসমূহ (domains), যার মাধ্যমে রোগ সংক্রমণ প্রভাবিত হতে পারে, তা নিম্নরূপ:

ক) মনুষ্য পয়ঃবর্জ্য অপসারণ;
খ) পানির উৎস নির্বাচন, ব্যবহার ও সুরক্ষা;
গ) পানি ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা (personal hygiene);
ঘ) খাদ্য তৈরি, গ্রহণ ও পরিবেশনা; এবং
ঙ) গৃহস্থালীর ও পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা।

কার্যকর স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার কার্যক্রম নারী, শিশু ও পুরুষের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্যাভ্যাস ও পরিস্থিতি হ্রাস করে। স্বাস্থসম্মত আচরণকে বৃহত্তর আঙ্গিকে একটি ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রম হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, যা রোগ সংক্রমণের চক্রকে ভাঙতে সাহায্য করে। অতঃপর, দেশের প্রধানতম উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ হলো পানি ও স্যানিটেশন-সংক্রান্ত রোগ সংক্রমণের পথটি সংকুচিত করতে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণের সাথে পানি ও স্যানিটেশন সুবিধাদির প্রাপ্যতার সম্মিলন ঘটানো (matching)।

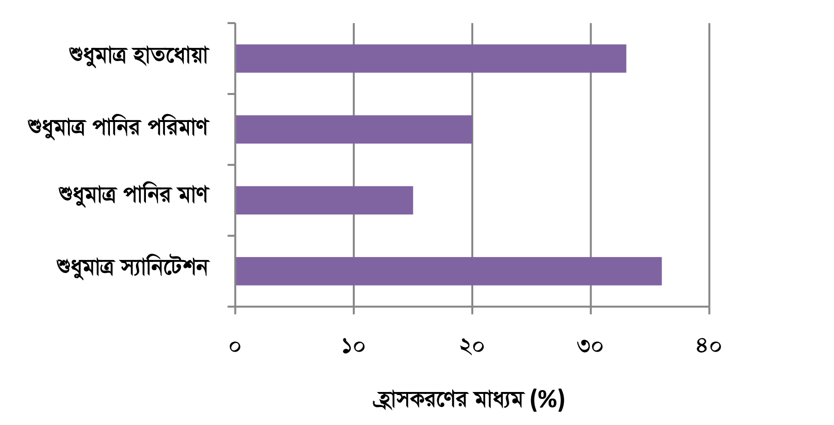

চিত্র ৩.৪: ডায়ারিয়াজনিত রোগে শিশুমৃত্যুর[৩২] হার কমাতে হার্ডওয়ার ও হাইজিন কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা

ডায়ারিয়া প্রতিরোধই সচরাচর পানি ও স্যানিটেশন উন্নয়নে বিনিয়োগের মুখ্য কারণ। যাহোক, এটি হলো উন্নত পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা এবং ভাল স্বাস্থ্যাভ্যাসের মিশ্রণ (combination), যা দৃশ্যত মল-মুখ সংক্রমণের পথ ব্যতীরেকে অন্যভাবে সংঘটিত ডায়ারিয়াজনিত রোগ কমাতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে। চিত্র ৩.৪-এ ডায়ারিয়া সংক্রমণ কমাতে পানি ও স্যানিটেশন হার্ডওয়ার ও হাইজিন কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা প্রদর্শিত আছে।

৩.৭.২ বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার

নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং ডায়ারিয়া রোগের মধ্যে যোগসূত্র দীর্ঘদিনের স্বীকৃত। এটিই ছিল ১৯৭০ সনের দিকে পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বিনিয়োগের প্রধান কারণ। আশির দশক ছিল পানির দশক, এসময়ে পানি সরবরাহ পদ্ধতিতে একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়; কেননা প্রত্যাশিত স্বাস্থ্য সুফল কেবলমাত্র পানি সরবরাহের মাধ্যমে অর্জন সম্ভব হচ্ছিল না। স্যানিটেশন কর্মসূচি, যেমন: ডিপিএইচই কর্তৃক সম্পন্ন গ্রাম স্যানিটেশন কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ শিক্ষা উপাদানসহ নতুনভাবে আবির্ভূত হয়। গুরুত্ব প্রদান করা হয় স্বাস্থ্যশিক্ষার ওপর; রোগ সংক্রমণের পথ বিষয়ে জনগণকে শিক্ষা দেয়া হয় এবং আশা করা হয় যে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য ঐ জ্ঞান দিয়েই তারা তাদের আচরণ পরিবর্তন করবে। নব্বই'র দশকে দেখা যায়, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ বিষয়ে পুনরুন্নতি ঘটছে। ঐ দশকের শেষ দিকে প্রধানত এনজিও'র মাধ্যমে পরিচালিত 'নির্দেশনামূলক শিক্ষা' (instructive education) পন্থায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়। বৃহৎ পরিসরে বাস্তবায়িত হতে থাকে সামাজিক সমাবেশকরণ (social mobilization) প্রকল্প। "পরীক্ষামূলক পাটগ্রাম" শির্ষক প্রকল্পে একটি উপজেলায় শতভাগ স্যানিটেশন অর্জিত হয়। সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ হলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের (উপজেলার প্রশাসনিক প্রধান) দৃঢ়/শক্তিশালী নেতৃত্ব।

স্বাস্থ্যাভ্যাস/পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা (হাইজিন) *বলতে সেইসব অভ্যাসকে বুঝায় যা দ্বারা অসুস্থতা রোধকল্পে বা রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে একজন ব্যক্তি তার নিজেকে এবং তার আশপাশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে।*

স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ শিক্ষা (হাইজিন এডুকেশন) *অর্থ হলো জ্ঞানবৃদ্ধিতে মানুষের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান।*

স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার (হাইজিন প্রমোশন) *হলো আচরণ পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া অথবা ব্যক্তিগত আচরণের স্বাস্থ্যসম্মত বা ইতিবাচক পরিবর্তনের একটি সামগ্রিক পন্থা।*

---

[৩২] ওয়াটার সাপ্লাই, স্যানিটেশন এ্যান্ড হাইজিন প্রমোশন - ডিজিস কন্ট্রোল প্রাওরিটিস ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিস, বাই স্যান্ডি কেয়ার্ণক্রস এ্যান্ড ভিভিয়ান ভালমানিস (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookself/br.fcgi?book=dep2&part=A5898).

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সেক্টরের আলোকপাত (focus) পানি সরবরাহ থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে স্যানিটেশনে; এখানে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারেও বৈচিত্র্য এসেছে। জনগোষ্ঠী-নেতৃত্বে সার্বিক স্যানিটেশন (CLTS) পন্থার উদ্ভব ঘটেছে, যার মাধ্যমে সমগ্র জনগোষ্ঠীর স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারের বিষয়গুলো বিবেচিত। সিএলটিএস মূলত এনজিও-উদ্যোগে আবিস্কৃত। এনজিওগুলোর মধ্যে ওয়াটার এইড, ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) ও এনজিও ফোরাম অন্যতম। সরকারের নেতৃত্বে ২০০৩ সনে জাতীয়ভাবে স্যানিটেশন প্রচারাভিযান শুরু হয় এবং এসময়ের মধ্যে দেশে স্যানিটেশন কভারেজের ক্ষেত্রে একটি ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়। বাংলাদেশের মৌলিক মানদণ্ড অনুযায়ী ২০০৩ সনের ৩৩ শতাংশ কভারেজ ২০০৯ সনে উন্নীত হয় ৮০.৫ শতাংশে (মৌলিক মানদণ্ডের সংজ্ঞা বিষয়ে সারণি ২.৩ দেখুন)। কিছু কিছু দাতা-সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পে (যেমন: ডানিডা সমর্থিত HYSAWA প্রকল্প, ইউনিসেফ ও ডিএফআইডি সমর্থিত SHEWA-B প্রকল্প) স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমের মেরুদণ্ড বিবেচনা করা হয়। অনুভূত হয় যে, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমের তুলনায় স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার কার্যক্রমে তুলনামূলক দীর্ঘ সময় (প্রকল্প চক্র) দরকার। দশকের শেষদিকে পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার (WSP বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন অনুচ্ছেদ ৩.৬-এ) অবতারণা হয়, এর সাথে যুক্ত হয় পানি সরবরাহ সুবিধাদির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পানির ব্যবহারের শিক্ষামূলক দিকসমূহ। কয়েকটি বড় প্রকল্পে যেমন: ব্র্যাক ওয়াটার, স্যানিটেশন এ্যান্ড হাইজিন (WASH) প্রোগ্রামে স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার কার্যক্রমের সাথে পানি সরবরাহ ও পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনাকে সমন্বিত করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারে স্কুল স্যানিটেশন খুবই কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে গণ্য, কেননা শিশুরা সবচেয়ে কার্যকর পরিবর্তনকারী এবং স্কুল হতে পারে আদর্শ যোগাযোগের মাধ্যম। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত বিবেচনা করে শিশুদের জন্য **'মীনা'** নামে অত্যন্ত সফল একটি আচরণগত পরিবর্তন প্রচারাভিযান পরিচালনা করে ইউনিসেফ (বক্স ৩.৪ দেখুন)।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারে সক্রিয়। ইউনিয়ন পরিষদের অধীন প্রতিটি ওয়ার্ডে তাদের একজন করে আবাসিক কর্মী কাজ করে, যাদেরকে বলা হয় "স্বাস্থ্য সহকারী"। তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার ও নৈমিত্তিক স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের কাজসহ স্থানীয় জনগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য-পরিচর্যা সেবা দিয়ে থাকে। যাহোক, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচিতে তাদের সম্পৃক্ততা খুব বেশি নয়; তারা মাঝেমধ্যে নানাবিষয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে যেমন, আর্সেনিক নিরসন।

বিগত প্রায় ৩০ থেকে ৪০ বছরের একটি দীর্ঘ সময়ব্যাপী দেশে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ বিষয়ে উপর্যুক্ত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তদুপরি সকল সহযোগী কর্তৃক অনুসরণযোগ্য স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারের একটি সাধারণ পন্থা-পদ্ধতি আজও অনুপস্থিত।

বক্স ৩.৪: মীনা

স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত দক্ষিণ এশিয়ার একটি অনুপম যোগাযোগ উপকরণের প্রদর্শণী

প্রায় এক দশক আগে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রচারিত ইউনিসেফ প্রযোজিত একটি আবেগময় চলচ্চিত্র ধারাবাহিকের মোহনীয় নায়িকাচরিত্রের নাম মীনা। চলচ্চিত্রটি এতদঞ্চলে মেয়ে শিশুদের মর্যাদা প্রসারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত একটি যোগাযোগ উপকরণের অনন্য প্যাকেজ। আবেগটি হাস্যরসের মাধ্যমে শিশুদের সাথে কার্যকর উপায়ে যোগাযোগের নিমিত্তে উদ্ভাবিত।

চলচ্চিত্রের একটি পর্বের নাম "মীনার তিনটি ইচ্ছা", সেখানে একটি যাদুর দৈত্যকে স্বপ্নে পায় মীনা, যে তার তিনটি ইচ্ছাকে পূরণ করে, যাতে সকলেই সুস্থ থাকে এবং কখনই তারা খারাপ স্যানিটেশন ও অনিরাপদ পানির কারণে অসুস্থ হয়ে না পড়ে। জেগে ওঠার পর মীনা স্বপ্নটিকে সত্যে পরিণত করার সংকল্পে মেতে ওঠে। তার ভাই রাজু, গ্রামের অন্য সকল শিশু ও মিঠু নামে তার প্রিয় টিয়াপাখির সহযোগিতায় সকলকে পায়খানা স্থাপন ও এর ব্যবহার, রোগজীবাণুর বিস্তার রোধ করতে নিরাপদ পানির ব্যবহার ও হাত ধোয়ার অভ্যাসে উদ্বুদ্ধ করে মীনা।

বাংলাদেশে মীনা সম্পর্কে প্রায় সার্বজনিক সচেতনতা পরিলক্ষিত হয় এবং ৯৫ শতাংশ মানুষ মীনা নামের টেলিভিশন সিরিজটি দেখে। ২০০৪ সনে সম্পাদিত একটি জরিপ থেকে দেখা যায়, প্রায় সকল উত্তরদাতাই শিক্ষাকে মীনা নামের যোগাযোগ

উদ্যোগটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে মত দেয়। এরপরই আসে শৈশবকালীন পরিচর্যা ও জেণ্ডার-সম্পর্কিত বিষয়গুলো। ছেষট্টি শতাংশেরও বেশি শিশু ও কিশোর বিশ্বাস করে যে মীনা দেখার পরই তাদের অভিভাবকরা তাদেরকে স্কুলে পাঠায়। বিশ্বব্যাপী যারা কার্টুনের সাথে পরিচিত নয় এবং এমনকি যারা একজন দক্ষিণ এশীয় বালিকাকে কার্টুনে দেখতে অভ্যস্ত নয়, মীনা তাদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে। তারা বিস্মিত হয় যে মীনার মত একটি ছোট্ট বালিকা কি করে এতদঞ্চলের মেয়ে শিশুদের জন্য দুর্ভোগসৃষ্টিকারী অনেক বড় বড় সমস্যা মোকাবিলা করে। অনেকের জন্যেই মীনা ছিল একটি রোল মডেল এবং এখনও তেমনিই আছে, যে কি না পথ দেখাতে পারে। লক্ষ লক্ষ পরিবারে সে পৌঁছে যায় মুহূর্তেই, এবং অনেকের জন্যেই সে একজন প্রকৃত ব্যক্তিতে পরিণত হয়, যে শিশুটি পৃথিবীতে তার নিজের পথ খুঁজে নিতে নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত। ছোট্ট শিশুদের অনেকেই ইউনিসেফ বাংলাদেশে ফোন করে এবং জিজ্ঞেস করে যে, তারা মীনার সাথে কথা বলতে পারে কী না।

ভারতের গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের স্কুলশিক্ষকগণ স্বীকার করেন যে মীনা প্রচারাভিযান গ্রামের সেইসব মেয়ে শিশুদের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে, যারা মীনা কার্টুনের গল্পের মাধ্যমে মেয়ে শিশুদের শিক্ষাদান, হাত ধোয়ার জন্য সাবান ব্যবহার, ডায়ারিয়া আক্রান্ত শিশুদেরকে মুখে খাবার স্যালাইন প্রদানের মত ভাল স্বাস্থ্যাভ্যাস অনুশীলনে সর্বদাই অনুপ্রাণিত। তারা মীনার একটি গল্পের সাথেও একমত পোষণ করেন যে, ছেলে ও মেয়ে উভয় শিশুর জন্যই একইরকম ও একই পর্যায়ের পুষ্টির প্রয়োজন।

সূত্র: ইউনিসেফ/ইণ্ডিয়া/২০০৭; চিলড্রেন এনজইং দি মীনা স্টোরি বী-ইং এনাক্টেড বাই দেয়ার ক্লাসমেট ইন কাপরাদা প্রাইমারী স্কুল বাই গুরিন্দও গৌতি এ্যান্ড বিদ্যা কুলকার্ণি।

৩.৭.৩ বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারের সমস্যা ও কার্যকারিতা

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারের প্রভাব বিষয়ে গবেষণা অত্যন্ত সীমিত। প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর প্রায় ১৫ মাস পরে শেওয়া-বি[৩৩] (SHEWA-B) প্রকল্পের তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায়, শিশুদের মধ্যে ডায়ারিয়ার প্রবণতা সামান্যই কমেছে, এবং আশ্চর্য্যজনকভাবে দেখা যায় যে ডায়ারিয়া সংঘটনের মাত্রা (incidence) নিয়ন্ত্রিত এলাকা (control areas) ও কার্যক্রমভুক্ত এলাকায় (intervention areas) একই রকম বিদ্যমান (শেষ দুই দিনে ১২ শতাংশ এবং শেষ ১৪ দিনে ১৫ শতাংশ)। এও পরিলক্ষিত হয় যে, হাত ধোয়ার অভ্যাস (৫ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ওঠানামা করে) বিষয়ে আত্ম-প্রকাশিত (self-reported) ফলাফল সবসময়ই কাঠামোবদ্ধ পর্যবেক্ষণ (structured observation) ফলাফলের তুলনায় তিন গুণ (৪৫ শতাংশ থেকে ৭১ শতাংশ পর্যন্ত ওঠানামা করে) অথবা এরও বেশি। ব্র্যাকের ওয়াশ[৩৪] কর্মসূচির ভিত্তিজরিপে প্রাপ্ত তথ্যের তুলনায় কার্যক্রম গ্রহণের তিন বছর পর পানি ও স্যানিটেশনবাহিত রোগ সম্পর্কে আত্ম-প্রকাশিত ঘটনার গড়পড়তা অবনমন ৩০ শতাংশ। দেখা যায়, যথাযথ স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ বিষয়ে মানুষের জ্ঞান অনেক বেশি (প্রায় ৯৭ শতাংশ), কিন্তু কার্যক্রম গ্রহণের তিন বছর পরও যথাযথ স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ অনুশীলন করে মাত্র ৬০ শতাংশ মানুষ।

উপর্যুক্ত দুটি সমীক্ষা আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাকেই সমর্থন করে যে, স্বাস্থ্যসম্মত আচরণের পরিবর্তন ব্যতীত স্বাস্থ্যের উপর এককভাবে স্যানিটেশনের (উভয়ক্ষেত্রেই ৯০ শতাংশ) প্রভাব সীমিত (চিত্র ১ দেখুন)। পুনরায়, উভয় সমীক্ষায় দেখা যায় যে জ্ঞান ও প্রকৃত চর্চার মধ্যে বেশ তফাৎ রয়েছে, যার মাধ্যমে নিম্নতম স্বাস্থ্যসুফল-ই প্রমাণিত হয়। অনুমানটি ইউনিসেফ ও লন্ডন স্কুল অব হাইজিন এ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন (LSHTP) কর্তৃক জুন ২০১০ সনে সম্পাদিত গবেষণা (Formative Research) দ্বারা সমর্থিত। গবেষণায় দেখা যায় যে, উন্নয়ন সহযোগীদের অনুসমর্থনে অনেক প্রকল্প স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করলেও তার ফলাফল খুব নিম্নপর্যায়েই রয়ে গেছে। মানুষ রোগজীবাণু সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবার্তা শুনতে পছন্দ করে না; অথচ বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারমূলক কার্যক্রম রোগজীবাণু ও বয়স্কভিত্তিক।

অর্জিত জ্ঞান প্রকৃত আচরণে রূপান্তরের বিষয়টি একটি জীবন-দক্ষতা (Life-Skill) প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। প্রক্রিয়াটির সমাপ্তি ঘটে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি (KSA) পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে; বক্স ৩.৫ এ বর্ণিত।

[৩৩] ডিএফআইডি'র ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়ারিয়াল ডিজিস কর্তৃক প্রণীত শেওয়া-বি (SHEWA-B) হেলথ্ ইমপ্যাক্ট স্টাডি রিপোর্ট, ২০০৯।
[৩৪] ব্র্যাক ওয়াশ প্রোগ্রাম, তৃতীয় মিশন প্রতিবেদন, মে ২০১০।

বক্স ৩.৫: স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ বিষয়ে জীবন-দক্ষতা (Life-Skills)

জনগণের স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যটি বিদ্যমান ভাল আচরণের বিকাশ ও ক্ষতিকর আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তনের মধ্যেই নিহিত। সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ পরিবর্তনে যে বিষয়গুলো অবদান রাখে সেগুলোর পুনঃব্যবহার ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার কার্যক্রমকে তিনটি বিষয়ে আলোকপাত করতে হবে। বিষয়গুলো: জ্ঞান (knowledge), দক্ষতা (skills), ও দৃষ্টিভঙ্গি (attitudes) অথবা সংক্ষেপে KSA। স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার বিষয়ে KSA এর উন্নয়নকেই প্রকারান্তরে "জীবন-দক্ষতা"র উন্নয়ন গণ্য করা হয়।

জ্ঞান *বলতে স্বাস্থ্যাভ্যাস সম্পর্কে বাস্তব ও তাত্ত্বিক তথ্য গ্রহণ করা ও সেগুলো সম্পর্কে নিজের বোঝাপড়া অনুযায়ী আচরণ করাকে বুঝায়। উদাহরণ: সকল মা-বাবা-ই জানেন যে অসুস্থতা যেমন, ডায়ারিয়া ও কৃমির সংক্রমণ ঘটে থাকে অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ থেকে যেমন পায়খানা ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে হাত না ধোয়া।*

দক্ষতা *হলো কোন সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ চর্চায় বাস্তব সামর্থ্য বা সক্ষমতা। উদাহরণস্বরূপ, শিশুরা জানে অসুস্থতা ও সংক্রমণ এড়াতে কেমন করে হাত পরিস্কার করতে হয়। অথবা, কঠিন ময়লা-বর্জ্য থেকে সংক্রমণ এড়াতে শিশুরা সেগুলো মাটিতে পুতে অথবা পুড়িয়ে ফেলে।*

দৃষ্টিভঙ্গি বা মূল্যবোধ *একধরণের অন্তর্দৃষ্টিভঙ্গীয় বা ব্যাক্তিগত বিশ্বাস, যা স্বাস্থ্যাভ্যাস সম্পর্কে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের এবং কখনও কখনও অন্য কারো মতামতের উপর নির্ভর করে এবং এগুলো একটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অন্য কাউকে কিছু একটা করতে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, বয়স্কদের দেখে অথবা তাদের কাছ থেকে কিছু প্রেরণা নিয়ে কিশোর-কিশোরীরা তাদের নিজেদেরকে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবান রাখতে চায়। অথবা, স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ অনুশীলনে অন্যদেরকে, বিশেষ করে শিশু-কিশোরদেরকে সহযোগিতা করতে দায়িত্বশীলতা ও আস্থা বোধ করে।*

ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির একটি পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, গুচ্ছ সভার (cluster meetings) মত বিদ্যমান পদ্ধতিগুলো স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ পরিবর্তনে তেমন কার্যকর নয়। এসকল সভা মূলত "জ্ঞান" ও সামান্য কিছু ক্ষেত্রে "দৃষ্টিভঙ্গি" পরিবর্তনের ওপর আলোকপাত করে। আগে থেকেই জানে এমন কোন বিষয়ের ওপর সভায় অংশগ্রহণ করতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা সত্যি কঠিন কাজ। অন্যদিকে স্কুল, বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত জাতীয় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি, খবরের কাগজ, অভিভাবক ও বন্ধুদের মাধ্যমে সকলেই ইতোমধ্যে স্বাস্থ্যবার্তা পেয়ে গেছে। অন্যান্য প্রকল্পের অভিজ্ঞতাও প্রায় একই ধরণের।

স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার পানি ও স্যানিটেশনের সাথে পরস্পর-সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরূপ, হাত ধোয়ার জন্য যে কারো জন্যে পানি দরকার। স্বাস্থ্যসম্মত আচরণের প্রসার কার্যক্রমের স্বাস্থ্যগত সুফল সবচেয়ে ভাল পাওয়া যায় যদি সেটি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমের সাথে একীভূত/যৌথভাবে করা যায়। নিচের বক্স ৩.৬-তে স্থিতিশীল স্বাস্থ্য-সুফল কর্ম-কাঠামো প্রদর্শিত হয়েছে, যেখানে পানি ও স্যানিটেশন হার্ডওয়ার উপকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ পরিবর্তন ও একটি অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য একটি সংঘবদ্ধ পন্থায় (combined approach) কার্যক্রম গ্রহণ করার দরকার। বাংলাদেশে কিছু কিছু প্রকল্পের মাধ্যমে এধরণের পন্থার কেবল আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছে।

৩.৭.৪ বিদ্যালয়ে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ

উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও হাত ধোয়ার সুবিধাদির সাথে স্বাস্থ্যশিক্ষা সমন্বয়ে প্রদত্ত স্কুলে পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যচর্চা (WASH) শিশুদের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে এবং জনগোষ্ঠীতে ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রসার ঘটাতে পারে[৩৫]। শিশুদেরকে হাতধোয়ার গুরুত্ব ও অন্যান্য ভাল স্বাস্থ্যাভ্যাস শেখালে তাদের জ্ঞানবৃদ্ধি ও ইতিবাচক আচরণগত পরিবর্তন

---

[৩৫] ল্যানচেট ২০০৪। ডিলিংহাম এ্যান্ড গুয়েরান্ট। চাইল্ডহুড স্টান্টিং: মিজারিং এ্যান্ড স্টিমিং দি স্ট্যাগারিং কস্ট অব ইনএ্যাডিকোয়েট ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন। দি ল্যানচেট, ভলিউম ৩৬৩, জানুয়ারী ১০, ২০০৪।

ঘটে, বিশেষ করে স্কুলটিতে যদি পর্যাপ্ত সংখ্যক নিরাপদ পায়খানা এবং হাতধোয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সাবান ও পানির ব্যবস্থা থাকে।

বক্স ৩.৬: পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণের স্থিতিশীল স্বাস্থ্যসুফল কর্ম-কাঠামো

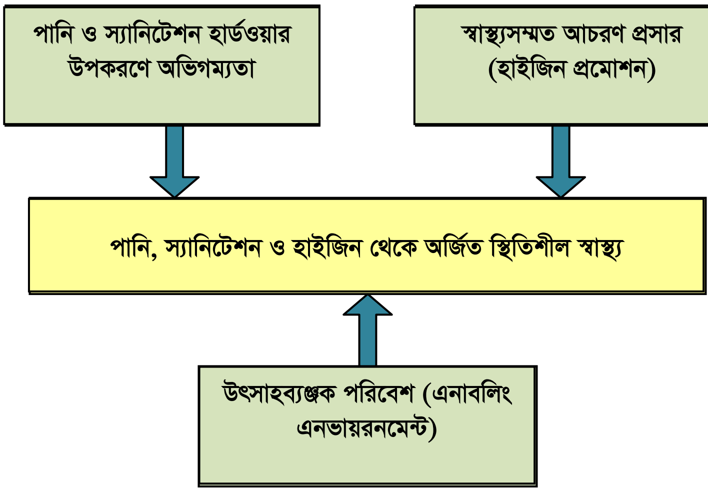

এই ব্যাপকভিত্তিক (comprehensive) পন্থাটি একটি নিবিড় আলোচনামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রণীত। কাঠামোটি তিনটি মুখ্য উপাদানকে সমন্বিত করার উপর জোড় দেয়:

পানি ও স্যানিটেশন হার্ডওয়ার উপকরণে অভিগম্যতা: *এর সাথে অন্তর্ভুক্ত আছে পানি সরবরাহ প্রযুক্তি, উন্নত স্যানিটেশন সুবিধাদি এবং বসতবাড়িতে ব্যবহার্য প্রযুক্তি, এবং উপকরণসমূহ যেমন: পানি সংরক্ষণের পাত্র/জলাধার, বাড়িতে পানি পরিশোধন পদ্ধতি, হাতধোয়ার উপকরণ, সাবান ইত্যাদি।*

স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার: *কর্মকাণ্ডগুলোর সাথে থাকবে আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগ (BCC), সামাজিক সমাবেশকরণ (social mobilization), সামাজিক বিপনন, জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও এ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন।*

উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশ সৃষ্টি: *এটি নিম্নোক্ত কার্যক্রমের একটি অথবা তারও বেশি নিয়ে সৃষ্ট: নীতি উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধিকরণ, জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি, অর্থায়ন ও ব্যয়-পুনরুদ্ধার কার্যক্রম এবং সেক্টর-পরস্পর (cross-sector) ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব।*

তথ্যসূত্র: যৌথ প্রকাশনা ৮। দি হাইজিন ইমপ্রুভমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক - এ কমপ্রিহেনসিভ এ্যাপ্রোচ ফর প্রিভেন্টিং চাইল্ডহুড ডায়ারিয়া, প্রিপেয়ার্ড বাই ইএইচপি, ইউনিসেফ/ডব্লিউইএস, ইউএসএআইডি, দি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক/ডব্লিউএসপি এ্যান্ড ডব্লিউএসএসসিসি, মে ২০০৪। (www.ehproject.org/pdf/Joint-Publications/JP008-HIF.pdf), এবং

স্কেলিং আপ ওয়াশ ফর হেলথ্ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বাই মেরী ওয়েইঙ্গার অব এনভায়নরমেন্ট হেলথ্ এট ইউএসএআইডি। বিশ্ব পানি দিবস ২০১০ উপলক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত একটি উপস্থাপনা "দি রিপল ইফেক্ট অব ওয়াটার, স্যানিটেশন এ্যান্ড হাইজিন অন গ্লোবাল হেলথ্ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট"। (www.ehproject/pdf/egkm/weinger-congressional2010.pdf).

দুটি প্রধান কারণে স্কুল স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষায় বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, স্যানিটেশন সুবিধাদিতে অভিগম্যতা হলো মৌলিক অধিকার, যা স্কুল-শিশুদের স্বাস্থ্য ও মর্যাদাকে সুরক্ষা দেয়। দ্বিতীয়ত, স্বাস্থ্যাভ্যাস সম্পর্কিত সঠিক আচরণ রপ্ত (develop) করার জন্য প্রাকশৈশব-ই (early childhood) সঠিক সময়। স্কুলে ওয়াশ কর্মকাণ্ডের সুফল বক্স ৩.৭-এ বর্ণিত আছে।

বক্স ৩.৭: বিদ্যালয়ে ওয়াশ কার্যক্রমের সুফল

বিদ্যালয়ে ওয়াশ কার্যক্রম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে উৎসাহ যোগায়:

- *অধিকতর স্বাস্থ্যবান বা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে;*
- *স্কুলে সর্বোচ্চ নৈপুণ্য প্রদর্শণে;*
- *বাড়িতে ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীতে সকলের স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ পরিবর্তনে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে;*
- *তাদের নিজেদের, বন্ধুদের ও ছোট ভাইবোনদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও আচরণ অনুশীলন সম্পর্কে শিখতে, পর্যবেক্ষণে, যোগাযোগে, সহযোগিতায়, শুনতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে (এগুলো এমন দক্ষতা, যা তাদের জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে সমর্থ করে তোলে);*
- *তাদের বর্তমান স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ পরিবর্তনে ও ভবিষ্যতে আরও ভাল আচরণ রপ্ত করতে, যখন তারা নিজেরাই হবে অভিভাবক, শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী কিম্বা অন্য কোন সমাজকর্মী;*
- *রজঃস্রাবসংক্রান্ত পরিচ্ছন্নতা (menstrual hygiene) এবং বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সময় নিজের যত্ন নিতে, যা মেয়েদেরকে রজঃস্রাবকালীন সময়েও স্কুলে আসতে এবং রজঃস্রাবের গন্ধ, অস্বস্তি, সম্ভাব্য মুত্রনালীয় ও যৌনাঙ্গের সংক্রমণ-সংক্রান্ত ভীতি কাটিয়ে উঠতে উৎসাহিত করে; এবং*
- *স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ সম্পর্কিত কার্যাবলী সমানভাবে সম্পাদনে (উদাহরণস্বরূপ: পায়খানা পরিস্কার করা, পানি উত্তোলন ও সংগ্রহ, পানি ফুটানো এবং অসুস্থ মানুষের সেবাযত্ন করা)।*

সূত্র: ইউনিসেফ (কার্যপত্র ১২ থেকে সংকলিত)।

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর এলাকার স্কুলগুলোর পরিচ্ছন্নতা প্রায়শ-ই সন্তোষজনক নয়। এহেন পরিস্থিতি স্বাস্থ্যঝুঁকি ও অন্যান্য নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করে। ফলে শিশুদের জন্য স্কুল নিরাপদ থাকে না। পানি ও স্যানিটেশন সেবাসুবিধাকে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ ও শিশুদের সুস্বাস্থ্যের পূর্বশর্ত (বা মৌলিক শর্ত) মানা হলেও, বাস্তব অবস্থায় অধিকাংশ স্কুলের পরিচ্ছন্নতার পরিস্থিতি একেবারেই অপর্যাপ্ত।

বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ প্রকল্পভুক্ত (২০০২-০৫) ৪,৩৩৩ টি স্কুলের ওপর সম্পাদিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে প্রতিটি স্কুলে গড়ে ২৪৬ জন ছাত্র ও চারজন শিক্ষক আছেন। প্রায় ১৯ শতাংশ স্কুলে কোন পানির ব্যবস্থা নেই; ২৮ শতাংশ স্কুলের পানির উৎসগুলো অচল, এবং ৫৩ শতাংশ স্কুলে সেগুলো সচল আছে। পায়খানা-ই নাই প্রায় ৬ শতাংশ স্কুলে, ১৩ শতাংশ স্কুলে অচল এবং ২৫ শতাংশ স্কুলে ১ টি পায়খানা, ৪৪ শতাংশে দুটি পায়খানা ও ১২ শতাংশ স্কুলে তিন বা ততোধিক সচল পায়খানা রয়েছে। দেখা যায়, প্রায় ৪৬ শতাংশ স্কুলে মেয়েদের জন্য পৃথক পায়খানার ব্যবস্থা আছে। গড়ে ১৫২ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একটি পায়খানা, যাহোক, এমনও স্কুলও আছে যেখানকার ৪৭৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য মাত্র একটি পায়খানা! প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) কর্তৃক প্রকাশিত স্কুল জরিপ প্রতিবেদন ২০০৭ অনুযায়ীও দেখা যায়, প্রায় ৪৩ শতাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৬৫ শতাংশ নিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা কোন পায়খানা নাই। একই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৩৮৫টি স্কুল রয়েছে, যা দেশের মোট স্কুলের মাত্র ১ শতাংশকে প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের ব্যবহারোপযোগী পায়খানার ব্যবস্থা আছে।

মূল নীতিমালা ও প্রত্যাশিত পরিস্থিতি

বাংলাদেশের স্কুলগুলোতে ওয়াশ কার্যক্রমের দুই দশকেরও বেশি সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে নিম্নোক্ত মূল নীতিমালা ও প্রত্যাশিত পরিস্থিতি উদ্ভুত:

- স্যানিটেশন, হাতধোয়া, পানি সরবরাহ, স্কুলপ্রাঙ্গনে বেড়া স্থাপন (compound fencing) এবং কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের জন্য স্কুলগুলোতে শিশুবান্ধব, জেণ্ডার-সংবেদনশীল, উন্নত মানের ও টেকসই সেবাসুবিধা (facilities) পরিকল্পনা (design) ও নির্মাণ;
- জীবন-দক্ষতাভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা ও শিশুদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা বা স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতা বৃদ্ধি। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, কেবলমাত্র ওয়াশ অবকাঠামো নির্মাণ-ই

স্বাস্থ্য উন্নয়নে যথেষ্ট নয়। স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার এক্ষেত্রে পায়খানা তৈরির মত-ই এমনকি নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রদানের চেয়েও বেশি কার্যকর[৩৬];

- অভিভাবকগণ বা প্যারেন্টস্ (বাবা-মা) ও জনগোষ্ঠীকে লক্ষিত দল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা, কেননা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা-ই তারা পালন করতে পারেন;
- জাতীয়, স্থানীয় ও স্কুল/জনগোষ্ঠী পর্যায়ের একটি ব্যবস্থাপনা মডেল তৈরিতে পরিকল্পনা প্রক্রিয়া শুরু করা;
- একটি চাহিদা-নির্ভর পন্থা (demand-responsive approach), কার্যক্রমের ব্যাপকতা সৃষ্টি (scaling up) এবং কার্যকর দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরির বিষয়টি সামাজিক অনুমোদনের জন্য রাজনৈতিক মালিকাবোধ বা একাত্বতা (political ownership) সৃষ্টি করা; এবং
- শিশুবান্ধব স্কুল প্রতিষ্ঠায় স্কুলপর্যায়ে স্বাস্থ্য/পরিচ্ছন্নতা অথবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে কাজ করছে এমন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে যৌথভাবে এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা। ইউনিসেফের সহযোগিতায় যৌথভাবে স্কুলে ওয়াশ কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে ডিপিএইচই ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (DPE)।

৩.৭.৫ স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারে কর্ম-নির্দেশনা

কার্যকর স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা হবে:

উন্নয়ন পন্থায় পরিবর্তন। স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারসংক্রান্ত জ্ঞান বিগত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। যাহোক, বিদ্যমান স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার পন্থাগুলো মানুষের জানা বিষয়ের ওপর তথ্য প্রদানে বিশেষ আলোকপাত করে। এখন নতুন পন্থা আবিস্কারের দিকে বেশি মনসংযোগ করতে হবে, যা মানুষের অর্জিত জ্ঞানকে চর্চায় রূপান্তরে কার্যকর হবে;

ওয়াশ কার্যক্রম প্রসারে তথ্য-শিক্ষা-যোগাযোগ নির্দেশিকার (*IEC Guideline*) অন্তর্ভুক্তি। স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারে গৃহীত বিভিন্ন এনজিও এবং উন্নয়ন প্রকল্পের পন্থাগুলো একীভূত (combine) করা, এবং জনগোষ্ঠীর জন্য একটি সমন্বিত তথ্য-শিক্ষা-যোগাযোগ নির্দেশিকা (IEC Guideline) প্রণয়ন, যার সাথে যুক্ত থাকবে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার, স্কুলে ওয়াশ (WASH) কর্মকাণ্ড, পানি ও স্যানিটেশন পদ্ধতির যথাযথ পরিচালনা ও সংরক্ষণ (O&M), এবং পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা;

পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রমের সাথে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার কার্যক্রম সমন্বিতকরণ। স্বাস্থ্যাভ্যাসের সর্বোচ্চ সুফল পাওয়া যায় যদি তা পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত হয়। সে কারণে পানি বা স্যানিটেশন সংক্রান্ত সকল কর্মসূচি পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার উপাদানগুলোর সমন্বয়ে একটি যৌথ প্যাকেজ (combined package) আকারে প্রণয়ন করতে হবে;

জাতীয় কৌশলপত্রসমূহের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্তকরণ। প্রস্তাবিত জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্রের সাথে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করতে হবে; এবং

সেক্টর ও আন্তঃসেক্টর অংশীদারদের মাঝে সুসমন্বয়। জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় পানি ও স্যানিটেশন ফোরাম এবং স্থানীয় পর্যায়ে ওয়াটসান কমিটিগুলোর মাধ্যমে এনজিও এবং বেসরকারি খাতের সংস্থার মত সেক্টর অংশীদারদের সাথে কার্যকর সমন্বয় সাধন করা হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের, বিশেষ করে ওয়ার্ড পর্যায়ে কর্মরত স্বাস্থ্য সহকারীদের সমর্থনমূলক ভূমিকার সাথে পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের

---

[৩৬] এস. ইসারে, এট আল (১৯৯০)। "হেলথ্ বেনিফিটস্ ফ্রম ইমপ্রুভমেন্টস্ ইন ওয়াটার সাপ্লাই এ্যান্ড স্যানিটেশন: সার্ভে এ্যান্ড এ্যানালাইসিস অব দি লিটারেচার অন সিলেকটেড ডিজিসেস", ওয়াশ টেকনিক্যাল রিপোর্ট নং ৬৬।

সাথেও সমন্বয় দরকার। এসকল সুপারিশের কার্যকর বাস্তবায়নে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ে প্রস্তাবিত সচিব কমিটি নির্ধারকের ভূমিকা নিতে পারে।

৩.৮ নাজুক জনগোষ্ঠী (vulnerable groups)

৩.৮.১ ভূমিকা

বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমীক্ষার ফলাফলে প্রতীয়মান হয় যে, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সেবাসুবিধায় সহজ (easy) ও সময়মত (timely) অভিগম্যতা (access) নিশ্চিত করা গেলে নাজুক জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবন মানেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। বৃহত্তর আঙ্গিকে, নাজুক জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তি ও গোষ্ঠী (দ্রুত জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র - পর্যায় ২ অনুসারে)[৩৭] অন্তর্ভুক্ত:

- নারী;
- শিশু;
- শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি;
- দেশজ (আদিবাসী) জনগোষ্ঠী;
- সুবিধাবঞ্চিত ও হত-দরিদ্র ব্যক্তি; এবং
- ভাসমান জনগোষ্ঠী।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে, নাজুক জনগোষ্ঠীর পানি ও স্যানিটেশন সেবাসুবিধার প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন এবং তদানুযায়ী সঠিক নীতিমালা, কৌশলাদি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন যারপর নাই গুরুত্বপূর্ণ (of paramount importance)। প্রেক্ষিতটি হলো, দেশের সমগ্র জনসংখ্যার ৪০ শতাংশেরও বেশি মানুষ দারিদ্র্য-সীমার নিচে বসবাস করে, যাদের অধিকাংশই নাজুক জনগোষ্ঠী এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাসুবিধায় অভিগম্যতা নাই। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র (vicious cycle of poverty) ও নাজুক জনগোষ্ঠীর সাথে এর সম্পর্ক নিচের চিত্র ৩.৫ এ প্রদর্শিত হলো।

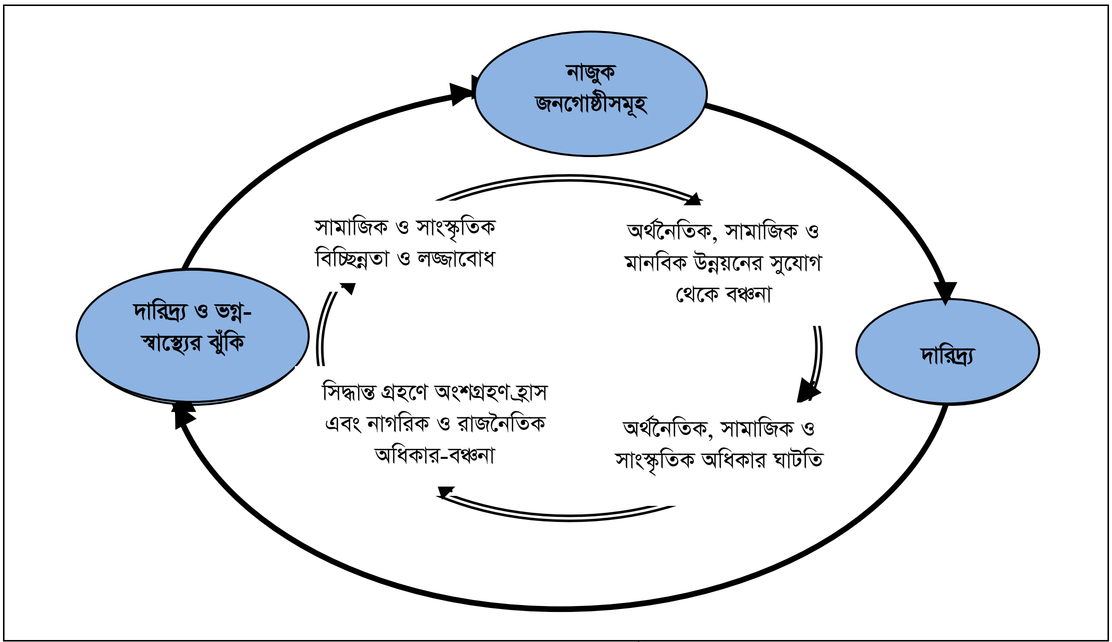

চিত্র ৩.৫: দারিদ্র্য ও নাজুক জনগোষ্ঠী - একটি দুষ্টচক্র

ওয়াটার, ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (WEDC), ২০০৫ থেকে সংকলিত।

[৩৭] নাজুক জনগোষ্ঠী বিষয়ে জাতীয় দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের অধীন "অংশগ্রহণ, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ" অনুচ্ছেদে বিধৃত আছে।

এই অনুচ্ছেদের প্রথমেই নাজুক জনগোষ্ঠীর সকল সদস্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জাতীয় এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের নীতিমালা, কৌশলাদি, পরিকল্পনা ও নির্দেশনাসমূহের একটি সার-সংক্ষেপ, প্রধান প্রধান সমস্যা ও সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য কর্ম-নির্দেশনা উপস্থাপিত হয়েছে।

৩.৮.২ নারী

গবেষণায় দেখা যায়, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের উন্নয়ন কার্যক্রম ও এর ফলে দারিদ্র্য হ্রাসের সম্ভাবনা সাধারণত উচ্চ, বিশেষ করে যখন নারী ও পুরুষ উভয়েই চাহিদা-পরিচালিত (demand-driven) কর্মসূচিতে পুরোপুরি সম্পৃক্ত (বিশ্বব্যাংক, ২০০৭)। পুনরায়, এই সেক্টরে জেণ্ডার দিকসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা গেলে কেবল নারীরাই নন, এর সাথে সরাসরি যুক্ত ব্যবহারকারী, সেবা প্রদানকারী, পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপক, গৃহস্থালীর পরিচ্ছন্নতা অভিভাবক ও এমনকি পুরুষেরাও উপকৃত হন (অত্র অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত জেণ্ডার পরিভাষাটির সংজ্ঞা বক্স ৩.৮-এ দেখুন)।

বক্স ৩.৮: জেণ্ডার পরিভাষার সংজ্ঞা

জেণ্ডার *বলতে কোন একটি সমাজের নারী ও পুরুষের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়-দায়িত্বকে বুঝানো হয়েছে। এটি আমরা যেভাবে বুঝি ও চিন্তা করতে পছন্দ করি এবং নারী ও পুরুষ হিসেবে ভূমিকা নিয়ে থাকি তার সাথে সম্পর্কিত, কেননা সমাজ গঠনের প্রক্রিয়াটি কেবলমাত্র আমাদের শারীরিক পার্থক্যের (biological differences) ওপর নির্ভর করে না।*

একটি জেণ্ডার-সংবেদনশীল পন্থা *নারী ও পুরুষের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত দৃষ্টিভঙ্গি, ভূমিকা ও দায়-দায়িত্বকে প্রকাশ করে। এর মাধ্যমে স্বীকার করা হয় যে, সম্পদের ওপর নারী ও পুরুষের একইরকম অভিগম্যতা ও নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে এমন নয়, এবং এর কার্যাবলী, সুফল ও প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এর জন্য দরকার নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে মুক্ত মন-মানসিকতা:*

- *এমনকি পরিবারের মধ্যেও আগ্রহের ভিন্নতা;*
- *প্রথা (conventions) ও পদানুক্রম (hierarchies) যা কোন এক লিঙ্গকে অন্য লিঙ্গ থেকে প্রাধান্য দেয়;*
- *বয়স, পার্থিব সম্পদ, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (ethnicity) ও অন্যান্য বিষয়ের ভিত্তিতে ভিন্নতা; এবং*
- *আর্থ-সামাজিক ও কারিগরী উন্নয়নের কারণে যেভাবে জেণ্ডার ভূমিকা ও সম্পর্ক বদলায়।*

জেণ্ডারকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ (Gender mainstreaming) *বলতে কেবল নারীদেরকে বুঝায় না। এটি আইন, নীতিমালা অথবা কর্মসূচি প্রণয়নসহ সকল এলাকায় ও সকল পর্যায়ে যে কোন পরিকল্পিত কর্মকাণ্ড যাচাইয়ের একটি প্রক্রিয়া। জেণ্ডার একটি কৌশল, যা সুফল বণ্টনে নারী ও পুরুষের (ধনী ও দরিদ্র) মধ্যে সমতা নিশ্চিত ও অসাম্য পরিহার করতে নারী ও পুরুষের সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ ও অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে।*

সূত্র: ওয়েল ফ্যাক্টশীট অন জেণ্ডার এ্যান্ড পোভার্টি: অথর: ডেইড্রে ক্যাসেলা, জুন ২০০৪; কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স: স্যান্ডি কেয়ার্ণক্রস, ক্রিস্টিন সিবেজমা (WELL FACTSHEET Gender and Poverty: Author: Deirdre Casella, June 2004: Quality Assurance: Sandy Cairncross, Christine Sijbesma)

জেণ্ডার ও চাহিদা-সংবেদনশীল পন্থা নারীদের মানবিক সম্পদ ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, ভারমুক্ত হতে নারী ও মেয়ে শিশুদেরকে নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার নিশ্চয়তা প্রদান এবং নারী ও মেয়ে শিশু কর্তৃক পানি সংগ্রহে ব্যয়কৃত সময় হ্রাস করতেও সহায়তা করে। এর মাধ্যমে তাদের অনেক সময় বাঁচে, যা তারা আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড ও স্কুলের হাজিরাতে কাজে লাগাতে পারে। সারকথা হলো, জেণ্ডার ইস্যুগুলো ঠিকমত বিবেচনা করা হলে সমাজের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বাড়ে।

জেণ্ডার নীতিমালা, কৌশলসমূহ এবং প্রকল্প নির্দেশিকা: সরকার কর্তৃক সংশোধিত ২০০৯ সনের জাতীয় দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র -২ তে উল্লেখ আছে যে দারিদ্র্যের অনেকরকম বোঝাই নারী ও পুরুষকে বহন করতে হয়, কিন্তু নারীদের ওপর এর প্রভাব পুরুষের ওপর প্রভাব থেকে ভিন্ন। কৌশলপত্রটিতে বলা হয়েছে, নারীর অগ্রগতি ও অধিকার

বিষয়ে সরকারের লক্ষ্য (রূপকল্প) হলো এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে নারী ও পুরুষের জন্য সমান থাকবে এবং তারা উভয়েই সমতার বা ন্যায্যতার ভিত্তিতে তাদের সকল মৌলিক অধিকার উপভোগ করবে। আবার সরকার কর্তৃক ২০০৮ সনে প্রণীত জাতীয় নারী নীতির প্রধান প্রধান লক্ষ্য হলো: (ক) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে নারীর অংশগ্রহণ জোরদার করা; (খ) সকল খাতভিত্তিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে নারীদের চাহিদা ও সমস্যাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা; এবং (গ) আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় রেখে জেণ্ডার-সংবেদনশীল প্রবৃদ্ধি (gender sensitive growth) নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের বিদ্যমান নীতিমালা ও কৌশলপত্রসমূহে জেণ্ডার বিষয়ে জাতীয় অবস্থানকে তুলে ধরার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে। জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালার একটি বড় নীতি-আদর্শ হলো গৃহস্থালী পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রদানে নারীর কেন্দ্রীয় ভূমিকা। নগর ও গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালায় পুনরায় জোর দেওয়া হয়েছে যে, "কর্মসূচি পরিকল্পনা, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত ও সমর্থন করতে হবে", এবং এটি করতে হবে "ব্যবস্থাপনা পরিষদে তাদের বর্ধিত প্রতিনিধিত্বের" মাধ্যমে। নীতিমালায় স্যানিটেশন সেবাসুবিধার পরিকল্পনায়, বিনিয়োগে ও প্রসারে জেণ্ডার-সংবেদনশীল পন্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

সরকারের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র-সহায়ক কৌশলপত্র ২০০৫ এ হত-দরিদ্র পরিবার চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত চারটি যোগ্যতার মাপকাঠির একটি হলো সরকারি ভর্তুকিমূল্যে পানি ও স্যানিটেশন সেবাপ্রাপ্তির প্রাকযোগ্যতা অর্জন করবে সেই সব পরিবার, যাদের প্রধান একজন নারী। জাতীয় আর্সেনিক নিরসন নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০০৪ ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদেরকে নিজ নিজ অধিভুক্ত এলাকায় নিরাপদ পানির উৎস স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন কার্যক্রম তদারকির কর্তৃত্ব অর্পন করে। স্থান নির্বাচনের সময়, পুনরায় এটিও নিশ্চিত করতে হয় যে স্থাপিত পানির উৎসটি যেন নারী ও দরিদ্ররা সহজেই ব্যবহার করতে পারে।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন উপখাতের জন্য জাতীয় ভেটিং গাইডলাইন ২০০৯ এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্প প্রস্তাবনা বাছাই পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও স্থানীয় সরকার বিভাগকে নিশ্চিত করতে হবে যে, প্রকল্প প্রস্তাবনাগুলো পনেরটি নির্দেশনামূলক নীতিমালা অনুসারে প্রণীত। এসকল নীতিমালার অন্যতম একটি হলো প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ণ, বাস্তবায়ন এবং সেবাপদ্ধতি পরিচালনা ও সংরক্ষণে নারীর সম্পৃক্ততা।

৩.৮.৩ শিশু

যখন বলা হয় যে বাংলাদেশে শিশু অধিকার ও অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে, তখনই অনেক শিশুর বেঁচে থাকা ও উন্নয়নের জন্যই আরো অনেক কিছু করার তাগিদ সৃষ্টি হবে। কেননা, শিশুরা এখনও নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাসুবিধায় অভিগম্যতা না থাকাসহ দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি, নির্যাতন ও রোগভোগের (abuse and diseases) মত অনেকরকম ঝুঁকির মুখে রয়েছে। গবেষণায় প্রকাশ, ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর এক-চতুর্থাংশ ঘটে নিরাপদ পানি ও পরিবেশগত স্যানিটেশন সেবাসুবিধায় অভিগম্যতা না থাকার কারণে। একই কারণে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে বছরপ্রতি ৬৫ মিলিয়নেরও বেশিবার ডায়ারিয়া সংঘটিত (episodes of diarrheal diseases) হয়। অভিগম্যতার বিষয়টি বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে দেখা হলে, প্রতিবছর ১.৮ মিলিয়ন মানুষ কেবলমাত্র ডায়ারিয়া রোগে মৃত্যুবরণ করছে। এর ৯০ শতাংশেরও বেশি পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু, এবং অধিকাংশই ঘটে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। আবার দেখা যাচ্ছে প্রতিবছর ১.৩ মিলিয়ন মানুষ ম্যালেরিয়াজনিক কারণে মারা যায়, যার প্রায় ৯০ শতাংশ হলো পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু[৩৮]।

শিশু-সম্পর্কিত নীতিমালা ও কৌশলসমূহ: জাতীয় পর্যায়ে পিআরএসপি-২ তে শিশুদের অধিকার ও অগ্রগতির বিষয়টি দারিদ্র্য বিমোচন গতিশীল করা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণে গৃহীতব্য অনুসমর্থনমূলক কৌশলাদির অন্যতম মুখ্য

[38] http://www.worldwatercouncil.org/index.php?id=23

উপাদান হিসেবে বিবেচিত। শিশুর অধিকার ও অগ্রগতি অর্জনে সরকারের প্রধান লক্ষ্য হলো, সুনির্দিষ্টভাবে নগর ও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে "পরিচ্ছন্ন পানি ও স্যানিটেশন, এবং একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশে" শিশুদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা। যাহোক, কেবলমাত্র জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০০৫ এ-ই বলা হয়েছে যে, প্রদত্ত স্যানিটেশন সেবাসুবিধা শিশুদের বিশেষ চাহিদা ও অগ্রাধিকারকে ধারণ করেই প্রদান করতে হবে।

৩.৮.৪ ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তি (Persons with disability)

বিভিন্ন ধরণের অক্ষম ব্যক্তিগণ, যেমনঃ শারীরিক প্রতিবন্ধী (physically challenged), দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (visually impaired), শ্রবণ প্রতিবন্ধী (hearing impaired) ও মানসিক প্রতিবন্ধী (mentally challenged) প্রতিটি সমাজের ও জনগোষ্ঠীর-ই অংশ। অক্ষম ব্যক্তি, যারা দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর অংশ, সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ (most marginalized) ও সুবিধাবঞ্চিত (disadvantaged) এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনসহ অন্যান্য মৌলিক সেবাসমূহে তাদের অভিগম্যতা নাই। এর ফলেই তাদের স্বাস্থ্য এবং দারিদ্র্যের অবস্থা আরও খারাপ আরও হয় (চিত্র ৩.৫ দেখুন)।

জাতিসংঘের প্রাক্কলন অনুযায়ী, পৃথিবীতে ৫০০ মিলিয়নেরও বেশি অক্ষম ব্যক্তি আছে, যার আনুমানিক ৮০ শতাংশ বসবাস করে স্বল্প-আয়ের দেশগুলোতে। প্রাক্কলনটি ৪ থেকে ১০ শতাংশ তারতম্য হতে পারে, একটি ভিত্তিজরিপ থেকে দেখা যায় বাংলাদেশে প্রায় ১৪ শতাংশ মানুষ অক্ষম {ওয়াটার, ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওয়েডেক) ২০০৫ এবং পিআরএসপি ২}।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পন্থা অবলম্বন অক্ষম ব্যক্তি ও তাদের পরিবারগুলোর জন্য অনেক সুফল বয়ে আনতে পারে, যেমনঃ বর্ধিত মর্যাদা ও আত্ম-বিশ্বাস; উন্নত স্বাস্থ্য ও পুষ্টি; এবং দারিদ্র্য হ্রাস ও বেঁচে যাওয়া সময় আয়বর্ধন ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণের ভিত্তিতে পারিবারিক সম্পদ-সমৃদ্ধির উন্নয়ন (ওয়েডেক ২০০৫)। একারণেই অক্ষম ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশনে বর্ণিত অক্ষমতা-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

অক্ষম ব্যক্তি-সম্পর্কিত নীতিমালা ও কৌশলসমূহ: সার্বিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের অধিকার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি সাধণে পিআরাএসপি-২ তে সরকারের দৃঢ় অঙ্গিকারের কথা উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানে সংরক্ষিত অক্ষম ব্যক্তিদের অধিকারের অতিরিক্ত হিসেবে বাংলাদেশ অক্ষম ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ে জাতিসংঘ কনভেনশন এবং এশিয়া প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে অক্ষম ব্যক্তিদের পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ ও সমতা বিষয়ে বেইজিং ঘোষণায় (Beijing Proclamation) স্বাক্ষরপ্রদানকারী একটি দেশ। এছাড়াও, অক্ষম ব্যক্তিদের আইনি সুরক্ষা প্রদান ও একটি জাতীয় অক্ষমতা কর্ম পরিকল্পনা (National Disability Action Plan) প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ডিজএ্যাবিলিটি ওয়েলফেয়ার এ্যাক্ট (২০০১) নামে একটি আইন প্রণয়ন করে।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর পর্যায়ে অক্ষম ব্যক্তিদের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বাস্তবায়নে পরিস্কার কোন নির্দেশনা (explicit references) পাওয়া যায় না। এবিষয়ে কেবলমাত্র দরিদ্র-সহায়ক কৌশলপত্র ২০০৫ এ হত-দরিদ্র পরিবারের একটি সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, এবং তদানুসারে, অন্যান্যদের মধ্যে অক্ষম বা নারী বা বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি যেসকল পরিবারের প্রধান সেসকল পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দরিদ্র-সহায়ক কৌশলপত্রে প্রদত্ত সংজ্ঞাটি জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০০৫ এর মাধ্যমে গৃহীত (endorsed) হয়েছে।

৩.৮.৫ দেশজ/আদিবাসী জনগোষ্ঠী (indigenous communities)

বাংলাদেশের কয়েকটি অঞ্চলে বসবাসরত দেশজ বা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৪৫, এর অধিকাংশই পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বৃহত্তর ময়মনসিংহ, রাজশাহী, সিলেট, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার সমতল এলাকায় বসবাস করে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে সাঁওতাল, মুশর, ওরাও, মাগু, মাহাতো, বাগদো মাহাতো নামক সংখ্যালঘু

এবং বেদে (river gypsies) সম্প্রদায়। বাংলাদেশের আদিবাসী জনসংখ্যা প্রায় ২.০ মিলিয়ন, যার সাথে সমতলভূমিতে বসবাসরত প্রায় ১.৬ মিলিয়ন জনসংখ্যার সম্প্রদায়গুলোও অন্তর্ভুক্ত। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষিত পৃথকভাবে অনুচ্ছেদ ৩.১২ তে বর্ণিত আছে। বৈশ্বিকভাবে, অনুমান করা হয় যে প্রায় ৭০টি দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা প্রায় ৩৭০ মিলিয়ন[৩৯]। সাধারণত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য ও পুষ্টি, এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাসুবিধায় আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীগুলোর অভিগম্যতা খুবই কম।

দেশজ/আদিবাসী জনগোষ্ঠী-সম্পর্কিত নীতিমালা ও কৌশলসমূহ: আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী বিষয়ে পিআরএসপি-২ তে সরকারের রূপকল্প সংযোজিত রয়েছে, এবং সেখানে তাদের "সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিতকরণ; নিরাপত্তা ও মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা; এবং তাদের ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণের" অঙ্গিকার ব্যক্ত হয়েছে। পিআরএসপি-২ তে আরও বলা হয়েছে, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাসহ অন্যান্য সকল মৌলিক সেবাসুবিধায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা নিশ্চিত করা হবে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর পর্যায়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বাস্তবায়নে পরিস্কার কোন নির্দেশনা (explicit references) পাওয়া যায় না।

৩.৮.৬ সুবিধাবঞ্চিত ও অতি-দরিদ্র ব্যক্তি

সুবিধাবঞ্চিত ও অতি-দরিদ্র ব্যক্তি পিআরএসপি-২ তে পৃথকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, "যারা সামাজিক ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত (subject to social injustice) ও প্রান্তিক (ঝুঁকিপূর্ণ) জনগোষ্ঠীতে পরিণত, এবং তাদের জন্য চরম বাস্তবতা (harsh realities) থেকে উত্তরণের সুযোগ খুবই কম"। এসকল দলে অন্যান্যদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে: হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠী যেমন সুইপার; উপকূলীয় এলাকার জেলে বা মৎসজীবী; এবং চা বাগানে কর্মরত শ্রমিক ও যৌনকর্মী। মোহাজের (অবাঙালি বিহারী হিসেবে সুপরিচিত), রোহিঙ্গা শরণার্থী (মায়ানমার থেকে আগত) এবং বিভিন্ন ছিটমহল ও ভারতীয় সীমান্ত বরাবর অবরুদ্ধ বাংলাদেশি (প্রায় ১২,২৯০ একর) এলাকায় বসবাসরত জনগণকেও সুবিধাবঞ্চিত ও অতি-দরিদ্র গণ্য করা যেতে পারে।

সুবিধাবঞ্চিত ও অতি-দরিদ্র ব্যক্তি/জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত নীতিমালা ও কৌশলসমূহ: জাতীয় পর্যায়ে, সুবিধাবঞ্চিত ও অতি-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারি লক্ষ্য হলো তাদেরকে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ (include them into the mainstream of the society)। এটি করা হবে সকল পর্যায়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও মৌলিক মানবাধিকার সুরক্ষা, এবং বিদ্যমান দারিদ্র্যের পর্যায় কমিয়ে আনার মাধ্যমে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর পর্যায়ে, দরিদ্র-সহায়ক কৌশলপত্র ২০০৫ ও জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০০৫ এ সুবিধাবঞ্চিত ও অতি-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত আছে। যাহোক, উভয় দলিলেই পেশা ও বর্ণেও দিক থেকে সুবিধাবঞ্চিত ও অতি-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কোন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি।

বক্স ৩.৯: শহুরে বস্তির ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য উদ্ভাবনীমূলক কমিউনিটি ল্যাট্রিনের মডেল

বাংলাদেশের শহর এলাকার মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বসবাস করে বস্তিতে। বস্তিগুলো অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা নগরীর বস্তিতে বসবাসকারী জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ২২০,০০০ জন, যা নগরীর অন্যান্য এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর প্রায় সাত গুণ। সাধারণত, বস্তির একটি পরিবার খুবই ছোট্ট একটি কক্ষে (আয়তন ৭ থেকে ১০ বর্গমিটার) বসবাস করে। বস্তিবাসীর অধিকাংশই পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনসহ অন্যান্য মৌলিক সেবাসুবিধা থেকে বঞ্চিত। এখানকার প্রায় সব পায়খানাই মাটির গর্তবিশিষ্ট, যা অনেকসংখ্যক ব্যবহারকারী এবং যথাযথ ও নিরাপদ পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে দ্রুতই ভরাট হয়ে পড়ে। পয়ঃবর্জ্য প্রায়শঃই নিকটস্থ মুক্ত নর্দমা অথবা জলাশয়ে অবমুক্ত করা হয়, ফলে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির সৃষ্টি হয়। বিবিএস-ইউনিসেফ সম্পাদিত বহু নির্দেশক গুচ্ছ জরিপ ২০০৯ অনুযায়ী, মাত্র ১২ শতাংশ বস্তিবাসী উন্নত স্যানিটেশন সেবাসুবিধার আওতাভুক্ত।

---

[৩৯] http://www.indigenouspeople.net/sidemenu.html

বস্তিবাসীর স্যানিটেশন প্রয়োজনীয়তা পূরণে অন্যান্য অংশীদার এনজিও'র সহযোগিতায় বেশ কয়েকটি বড় এনজিও যেমন: ওয়াটার এইড, দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল এসকল এলাকায় কমিউনিটি ল্যাট্রিন প্রদান করছে। বস্তিবাসীদের সাথে পরামর্শমূলক আলোচনার ভিত্তিতে তারা উদ্ভাবনীমূলক কিছু ল্যাট্রিন ডিজাইন করে, যাতে বস্তিতে বসবাসকারী নারী, শিশু, বয়োবৃদ্ধ ও ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিসহ সকল পর্যায়ের জনগণের জন্য সেগুলো ব্যবহারোপযোগী হয়। পাশাপাশি বসবাসরত বস্তিবাসীদের নিয়ে গঠিত জনগোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠনগুলো (সিবিও) এসকল কমিউনিটি ল্যাট্রিনের রক্ষণাবেক্ষণ করে। সিবিওগুলো ল্যাট্রিন রক্ষণনাবেক্ষণের কাজে একজন কেয়ারটেকার ও একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োজিত করে থাকে। নিয়োজিত কেয়ারটেকার ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা ল্যাট্রিন রক্ষণাবেক্ষণের বিনিময়ে ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে (পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত পরিমাণ) একটি ফি আদায় করে।

কমিউনিটি ল্যাট্রিনের উপরিকাঠামো ইট দিয়ে তৈরি এবং ছাদে করোগেটেড টিন ব্যবহার করা হয়। বস্তিতে জায়গার স্বল্পতার কারণে, কমিউনিটি ল্যাট্রিনগুলো সাধারণত সেপটিক ট্যাংকের ওপরই স্থাপন করা হয়। ল্যাট্রিনের দেয়াল ও ছাদের মধ্যে প্রায় অর্ধ-মিটারের মত স্থান ফাঁকা রাখা হয়, যাতে ল্যাট্রিনের ভিতর পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস ঢুকতে পারে। ভিতরে অতিরিক্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে ল্যাট্রিনের ছাদে ব্যবহৃত করোগেটেড টিনের কিছু অংশে আধা-স্বচ্ছ (semi-transparent) প্লাস্টিক শীট ব্যবহার করা হয়। ল্যাট্রিন কম্পাউন্ডের ভিতরে অথবা খুবই কাছে সাধারণত একটি নলকূপ অথবা পানির কল স্থাপন করা হয়। এর সাথে যুক্ত থাকে গোসলের স্থানও।

একটি কমিউনিটি ল্যাট্রিনে সাধারণত চার থেকে আটটি চেম্বার থাখে - যার প্রতিটি প্রায় ১০ পরিবারের জন্য ব্যবহারোপযোগী। নারী ও পুরুষের জন্য থাকে আলাদা চেম্বার ও ল্যাট্রিনে ঢোকার পথ। রজঃস্রাবজনিত পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা রাখার কারণে নারীদের ল্যাট্রিন চেম্বার তুলনামূলকভাবে বড় আকারের। একইভাবে, শিশুদের ব্যবহারের সুবিধা রাখার কারণে নারীদের গোসলের স্থানও অপেক্ষাকৃত বড়। অন্তঃস্বত্ত্বা নারী, বয়োবৃদ্ধ ও শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ল্যাট্রিনের পথে রেলিং, সিঁড়ি ও ভিতরের দেয়ালের সাথে সংলগ্ন হাতল যুক্ত করা হয়েছে। ল্যাট্রিনের ভিতরে ও বাইরের দেয়ালে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ বিষয়ে বার্তা যেমন, পায়খানা ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়া বিষয়ে লেখা অথবা টাঙ্গিয়ে রাখা হয়।

শহুরে বস্তিতে স্থাপিত কমিউনিটি ল্যাট্রিনের একটি মূল্যায়ন (DevCon, 2007) থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঘর থেকে ল্যাট্রিনের দুরত্ব বিষয়ে অধিকাংশ ব্যবহারকারী-ই সন্তুষ্ট। উত্তরদাতাদের অধিকাংশই (প্রায় ৭৮ শতাংশ) ল্যাট্রিনের ভিতরের জায়গা নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। বায়ুনির্গমণ ব্যবস্থা বিষয়েও অধিকাংশ ব্যবহারকারী (প্রায় ৯২ শতাংশ) সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। আরও উৎসাব্যঞ্জক ফলাফল পাওয়া যায় নারীদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা বিষয়ে (৯০ শতাংশ) এবং প্রায় ৯১ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করে যে কমিউনিটি ল্যাট্রিন ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের সামাজিক মর্যাদা দারুণভাবে বেড়েছে। যাহোক, সবচেয়ে কম সন্তুষ্টি দেখা যায় (প্রায় ৫৫ শতাংশ) ভিতরের আলোর ব্যবস্থা বিষয়ে। কমিউনিটি ল্যাট্রিনের মডেলটি এখন ব্যপকহারে সরকারি সংস্থা ও এনজিও কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে।

সূত্রঃ এ্যাসেসমেন্ট অব ফাংকশনালিটি এ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি অব কমিউনিটি ল্যাট্রিনস্ আন্ডার এ্যাশে আরবান প্রোগ্রাম, ওয়াটার এইড (২০০৭ সনে ডেভকন কর্তৃক সম্পাদিত) *Assessment of Functionality and Sustainability of Community Latrines under ASEH Urban Program by DevCon, 2007.*

৩.৮.৭ ভাসমান জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশ উচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এখানকার অধিকাংশ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নগর এলাকায় গণ্ডিবদ্ধ। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষ জীবিকার সন্ধানে শহর এলাকায় আসে এবং বসবাসের জন্য অনানুষ্ঠানিক স্থানকে-ই বেছে নেয়। অনেকেই রেলস্টেশনে, ফুটপাতে, বস্তিসহ পার্কের মত মুক্তস্থানে রাত্রিযাপন করে। এছাড়াও, প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ব্যবসা অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে শহরে আসে এবং দিনের বা রাত্রিশেষে বাড়ি ফেরে। এসকল মানুষ পায়খানা ও ধোয়ামোছার মারাত্মক সমস্যায় ভোগে। অন্যদিকে, যারা বিভিন্ন স্থানে রাত্রিযাপন করে তারাও পানি ও স্যানিটেশন সুবিধাদির সমস্যায় পড়ে। পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধাদির অভাবে এসব ভাসমান জনগোষ্ঠী ফুটপাত, রাস্তা, বাস ও রেলস্টেশনের মত উন্মুক্তস্থানে নানারকম অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

৩.৮.৮ নাজুক জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

সরকার নানারকম সেবাসুবিধায় নাজুক জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা বৃদ্ধি ও অধিকতর বিকল্প চাহিদা ও সুযোগ প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এগুলো সরকারের জাতীয় ও পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত কিছু কিছু নীতিমালা ও কৌশলপত্রে প্রতিফলিত। তা সত্ত্বেও, এসকল সমস্যার ধরণ ও মাত্রা এত বেশি যে এগুলোকে আরও বেশি সমন্বিত, সমতাভিত্তিক ও টেকসই করা প্রয়োজন। সমস্যাগুলোকে দুটি ভাগে আলোকপাত করা হয়েছে, একটি সাধারণ বা সামগ্রিক ও অন্যটি নাজুক জনগোষ্ঠী-নির্দিষ্ট:

সাধারণ:

- জাতীয় নীতিমালা ও কৌশলপত্রসমূহে নাজুক জনগোষ্ঠী-সংক্রান্ত সমস্যাগুলো বিশদভাবে আলোচিত, কিন্তু পুনরায় এগুলো পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের নীতিমালা ও কৌশলপত্রসমূহে বিশেষ নজর দেওয়া প্রযোজন;
- নাজুক জনগোষ্ঠী-সংক্রান্ত সমস্যাগুলো বহুমাত্রিক (multi-dimensional) ও বহু-খাত বিষয়ক (multi-sectoral)। যাহোক, সকল পর্যায়ে একটি কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া-পদ্ধতির অভাব বিদ্যমান এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও এনজিওদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ব্যবস্থার অনুপস্থিতিও পরিলক্ষিত;
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে নাজুক জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে এনজিও কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের বেশ কিছু ভাল উদাহরণ রয়েছে (বক্স ৩.৯ দেখুন), কিন্তু এগুলো মূলধারায় এখনো সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়নি। সামাজিক-অর্থনৈতিক দিকগুলোও সম্পূর্ণরূপে বুঝে ওঠা ও বিবেচনায় নেওয়া যায়নি;
- নাজুক জনগোষ্ঠী বিষয়ে পৃথককৃত তথ্যের অভাব (lack of disaggregated data) এদের জন্য সঠিক নীতিমালা, কৌশলাদি ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে আরেকটি বড় বাঁধা; এবং
- নাজুক জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ এবং অর্থায়ন প্রক্রিয়াসহ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে তাদের চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তাকে অন্তর্ভুক্ত করার কার্যকর প্রক্রিয়া-পদ্ধতি নেই বললেই চলে।

নাজুক জনগোষ্ঠী-নির্দিষ্ট:

- ***অক্ষমতা (Disability):*** বাংলাদেশ অক্ষমতা কল্যাণ আইনে (The Bangladesh Disability Welfare Act) অক্ষম ব্যক্তির পরিস্কার সংজ্ঞা সংযোজিত নাই এবং এটি অধিকারভিত্তিক পন্থার (right-based approach) ভিত্তিতে প্রণীত নয়; এবং
- ***শিশু (Children):*** স্যানিটেশন কভারেজ সার্বিকভাবে বৃদ্ধি পেলেও এখনো প্রায় ৬১ শতাংশ শিশুর স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানায় অভিগম্যতা নাই।

৩.৮.৯ নাজুক জনগোষ্ঠী বিষয়ে কর্ম-নির্দেশনা

নাজুক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্ম-নির্দেশনাগুলো নিম্নরূপ:

- বিভিন্ন নাজুক জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা, অগ্রাধিকার ও সমস্যা বিষয়ে একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার (database) প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় পর্যায়ে জরিপ সম্পন্ন করা;
- 'কোনটি কার্যকর বা কাজ করে' বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে একটি শিখন পন্থা (a learning approach) অবলম্বন করা এবং এর ভিত্তিতে নির্দেশিকা প্রণয়ন (prepare guidelines), উপকরণ তৈরি (design tools) ও বিভিন্ন ধরণের নাজুক জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা (specific approaches) অবলম্বন করা;
- সচেতনতা সৃষ্টি এবং জনগোষ্ঠী পর্যায়ের পরিকল্পনায় নাজুক জনগোষ্ঠীর সমস্যাগুলোর সঠিক সমাধান অন্তর্ভুক্ত করা;

- কৌশলগত স্থানসমূহে পর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যেমন পরিচালনা ও সংরক্ষণ (O&M) সেবা আউটসোর্স করাসহ গণশৌচাগার নির্মাণ;
- প্রস্তাবিত নগর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র এবং গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্রে নাজুক জনগোষ্ঠীসমূহের সুনির্দিষ্ট সমস্যাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা;
- অধিকতর কার্যকর উপায়ে নাজুক জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সামর্থ্য বৃদ্ধি করা; এবং
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের প্রতিটি সংস্থা পর্যায়ে কার্যক্রম সমন্বয়ে ও কারিগরী নির্দেশনা প্রদানে নাজুক জনগোষ্ঠীর জন্য একজন করে মুখ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (focal persons) নিয়োগ করা।

৩.৯ বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ

৩.৯.১ বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুবিধা অনেক। সেগুলো হলো: (১) সেক্টরের বর্ধিত বিনিয়োগ চাহিদা পূরণের জন্য বেসরকারি সম্পদ সমাবেশ; (২) অধিক সংখ্যক বিনিয়োগকারীর আগমনের কারণে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি; (৩) দক্ষতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা বাড়ানো; (৪) অধিকতর কম দাম; ও (৫) সার্বজনীন কভারেজ অর্জন।

উপযুক্ত পরিবেশে প্রয়োগ করা হলে, সাধারণভাবে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ সামাজিকভাবে প্রত্যাশিত ফলাফল বয়ে আনতে পারে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, বেসরকারি খাতকে কাজের সুযোগ দিতে মালিকানার ধরণ (সরকারি থেকে বেসরকারি মালিকানায়) পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়। বরং সাফল্য অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতার রাশ ধরতে পারে এমন উপযোগী পরিবেশ বজায় রাখা প্রয়োজন। যে ব্যবস্থার অধীনে বেসরকারি পানি সরবরাহকারী আরও দক্ষ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে প্রতিযোগিতার জন্য উদ্ভাবনী ধারণা প্রবর্তন, কার্যকর বিধি-বিধান, সুশাসন ও চুক্তি বলবৎকরণ এবং পর্যাপ্ত কার্যকর চাহিদা সৃষ্টি। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতে যে কোন বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির পূর্বে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে এসব প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ বিদ্যমান[৪০]।

বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি, উভয় খাতই বিভিন্ন উপায়ে সম্পৃক্ত[৪১]। বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকে তিনটি বৃহৎ বাজার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। নিচে এগুলোর ব্যাখ্যা ও চিত্র ৩.৬-এ ছকের সাহায্যে দেখানো হলো।

- **ক্ষুদ্রাকার হার্ডওয়্যার বাজার:** মুক্ত বা তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতারা প্রধানতঃ হার্ডওয়্যার দোকানের উদ্যোক্তা। তাঁরা নলকূপের পাইপ ও পাম্প বিক্রি এবং পায়খানা উৎপাদন করে। গ্রামীণ ও নগর উভয় এলাকার বাজারে ক্রেতাদের কাছে সরাসরি পণ্য বিক্রি করা হলেও এটি প্রধানতঃ গ্রামীণ বাজার-ই। সেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সরকারি খাতের কোন মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা থাকে না। তারপরও বাজার আকারের প্রেক্ষিতে এ অংশই বৃহত্তম;

- **ক্ষুদ্রাকার সেবা বাজার:** এগুলো গ্রামীণ পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ও এনজিও কর্তৃক বস্তিতে পানির উৎস পরিচালনার মত ক্ষুদ্র ব্যবসা। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানের জন্য এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সরকারি সংস্থা হতে সচরাচর লাইসেন্স বা চুক্তি নিয়ে থাকে; ও

---

[৪০] বেসরকারিকরণ পুনরালোচনা: উন্নয়নশীল দেশসমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ হতে শিখন। এডিবি ইডিবি কার্যপত্র নম্বর ১১, মে ২০০৮।

[৪১] অনুচ্ছেদ ২ ও ৫ এ বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ খাতের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

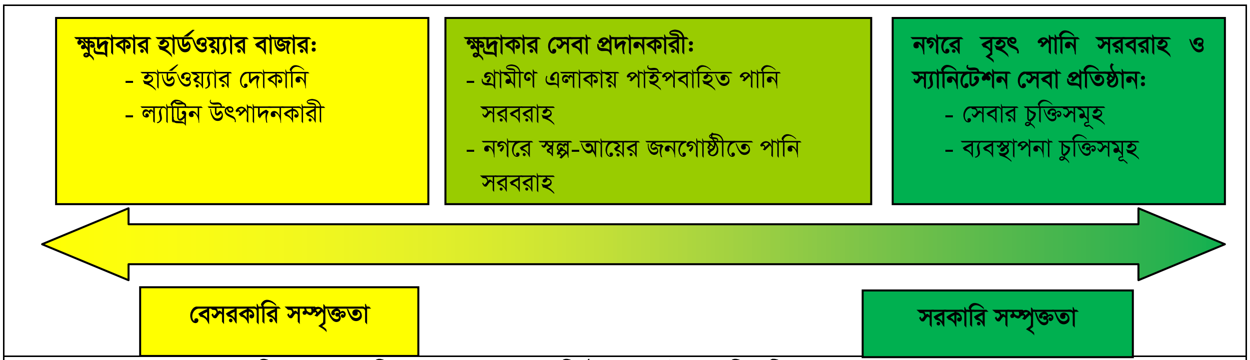

চিত্র ৩.৬ পানি সরবরাহ নও স্যানিটেশন সেক্টরের তিনটি প্রধান বাজারের অংশ

- **নগরসেবা প্রতিষ্ঠানের বৃহদাকার বাজারঃ** এটা সরকারি সেবার ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের গতানুগতিক ধাঁচের অংশগ্রহণ। সেবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম এবং কখনো কখনো বিনিয়োগ ও আনুষঙ্গিক ঝুঁকিসমূহ সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। সরকারি সংস্থা একটি চুক্তিমূলক সমঝোতার মাধ্যমে বেসরকারি পরিচালনাকারীর সাথে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। চুক্তির ধরণ সাধারণ সেবা ও ব্যবস্থাপনা চুক্তি থেকে ইজারা (leasing) বা বিশেষ সুবিধা (concesion) প্রদান চুক্তি পর্যন্ত হতে পারে।

উপর্যুক্ত তিনটি শ্রেণীতে বেসরকারি খাতের উন্নয়নে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ এবং সুপারিশগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

৩.৯.২ ক্ষুদ্রাকার হার্ডওয়্যার বাজার

বাংলাদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা সরবরাহের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাকার হার্ডওয়্যার বাজার (গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের প্রায় ৮০ ভাগ) প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। আশা করা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে এ ধারা আরও তীব্র হতে থাকবে। বর্তমানে বেসরকারি খাত প্রতিবছর প্রায় ৩ লক্ষ হস্তচালিত নলকূপ ও ১০ লক্ষ পায়খানা স্থাপন করছে। বিদ্যমান পায়খানাগুলোর উন্নয়নে পায়খানা নির্মাতারা সম্পৃক্ত (বক্স ৩.১০)। নগর পানি সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত পাইপ ও পাম্পের বেশিরভাগই দেশে উৎপাদিত। বেসরকারি খাত এরই মধ্যে ভূ-গর্ভস্থ নিম্ন পানিস্তরে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরণের হস্তচালিত নলকূপ উৎপাদন ও স্থাপনে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছে। বেসরকারি খাত হাতধোয়ার জন্য স্বল্পমূল্যের সাবান এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন উৎপাদনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারে সহযোগিতা দিচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে আর্সেনিক পরীক্ষার কীটস্ (প্রতিবছর ১০-২০ হাজার কীটস্-এর ভবিষ্যত চাহিদা) ও পানির মিটার (প্রতিবছর প্রায় ৫০-৬০ হাজার মিটার) উৎপাদনের ক্ষমতাও রয়েছে বেসরকারি খাতের। ক্ষুদ্রাকার হার্ডওয়্যার বাজার বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানেও সক্ষম। এ বাজারের মাধ্যমে হস্তচালিত নলকূপ ও মটরচালিত পাম্প মেরামতের কাজ চলতে পারে। নগর পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন মেরামত ও সংরক্ষণ কাজে প্লাম্বারও সহজে পাওয়া যায়।

গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনশীলতা বর্তমানে একটি উদীয়মান সমস্যা। মানুষের আয় স্তর বাড়ছে, উচ্চতর সেবাসুবিধার জন্য বিকাশ ঘটছে সচেতনতার। সাথে সাথে সাধারণ হস্তচালিত নলকূপ ও উচ্চস্তরের রুচিসম্মত প্রযুক্তির জলাবদ্ধ (water seal) গর্ত পায়খানার চাহিদা বাড়ছে। এ চাহিদা পূরণে বেসরকারি খাতের কারিগরি ও ব্যবসায়িক নৈপূণ্য আরো বাড়ানো প্রয়োজন।

বক্স ৩.১০ স্যানিটেশন সোপানে আরোহণ - বেসরকারি খাতের অবদান

গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত প্রায় এক-চতুর্থাংশ পায়খানার জলরোধক (water seal) নেই অথবা সেগুলো ভাঙ্গা। যাহোক, জলরোধকবিহীন পায়খানা স্যানিটেশন সোপানে আরোহণের প্রথম ধাপ। উন্নয়নের পরবর্তী ধাপ হলো জলরোধকযুক্ত ল্যাট্রিন, যাকে সাধারণভাবে স্যানিটেশন সোপানের পরবর্তী ধাপে আরোহণ বলা হয়ে থাকে (বক্স ২.৩ দেখুন)।

গ্রাম এলাকায় অনেক পায়খানা উৎপাদনকারী বিদ্যমান পায়খানাগুলোতে জলরোধক যুক্ত করার জন্য এনজিও, বিশেষ করে ব্র্যাক ও ওয়াটার এইড-এর কাছ থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। একই সময়ে এনজিওরা জনগোষ্ঠীকে পায়খানায় জলরোধক স্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। গ্রামীণ জনসাধারণ এখন এর সুফল সম্পর্কে সচেতন। মাল-মসলাসহ মাত্র ৩০-৫০ টাকা খরচ করে তাঁদের বিদ্যমান পায়খানাসমূহে জলরোধক লাগানোর জন্য সেবা ক্রয়ের এমন অনেক ঘটনা আছে। বিগত দু'বছরের মধ্যে ব্র্যাক কর্মসূচি (ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি পর্যালোচনা প্রতিবেদন, মে ২০১০) একাই ৮০ লক্ষ উপকারভোগীর মধ্যে ১৭ লক্ষ পায়খানায় জলরোধক স্থাপন করেছে।

কর্ম-নির্দেশনা

এ সকল খণ্ড খণ্ড বাজারকে সহায়তার জন্য কর্ম-নির্দেশনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো:

- জন-প্রত্যাশা পূরণের জন্য গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনে প্রধান ভূমিকা পালন করতে বেসরকারি খাতকে অব্যাহতভাবে উৎসাহিত করা;
- পরিবর্তিত পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করতে বেসরকারি খাতকে সমর্থন করা। সমর্থনের ক্ষেত্রগুলো হতে পারে উদ্যোক্তা ও সরবরাহ চেইন উন্নয়ন, পাম্প তৈরিতে কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং নতুন ধরণের নলকূপের সেবার গুণগত মানদণ্ড পূরণে ড্রিলিং কৌশল রপ্ত করা। বেসরকারি খাতকে বিভিন্ন অবস্থায় প্রযুক্তির যথার্থতা বিষয়ে কারিগরি তথ্যের পাশাপাশি এলাকায় পানির প্রয়োজনীয় গভীরতা ও নলকূপের সম্ভাব্য পানি উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যও দেয়া যেতে পারে। এসব সহায়ক কার্যক্রম চলতে পারে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)-এর মাধ্যমে;
- সচেতনতা ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ভোক্তাদেরকে উচ্চতর মানের পানি ও স্যানিটেশন সেবা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা। এটা করা যেতে পারে বিশেষভাবে পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ- WASH)-এর জন্য একটি সমন্বিত তথ্য-শিক্ষা-যোগাযোগ (IEC) বিষয়ক কার্যক্রমের প্যাকেজ প্রবর্তনের মাধ্যমে। এনজিওদের সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো এ জাতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে; এবং
- গৃহস্থালী পর্যায়ে (উদাহরণস্বরূপ, নলকূপের স্বাস্থ্যসম্মত সংরক্ষণ ও জলরোধকসহ পায়খানা) প্রদত্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার মান পরিবীক্ষণ ও নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সামাজিক সেবা ও আইনি দলিলপত্রসমূহ কাজে লাগানো। যেহেতু গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে বহুসংখ্যক উৎপাদনকারীসহ একটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বিদ্যমান, সেহেতু এখনই কোন অর্থনৈতিক (মূল্য) নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই।

৩.৯.৩ ক্ষুদ্রাকার সেবা বাজার

এ বাজারটি আংশিকভাবে উন্নীত ও বর্তমানে খুব সামান্য পরিমাণে (১ ভাগেরও কম) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা দিয়ে থাকে। কিন্তু আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে তা যথেষ্ট প্রসারিত হবে। বাজারের এ অংশে সরকারি হস্তক্ষেপের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। বেসরকারি খাত, জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন মাত্রার সম্পৃক্ততার মাধ্যমে বাজারটিতে বহুসংখ্যক গ্রামীণ পাইপবাহিত পানি সরবরাহ মডেল, যেমন: ডিপিএইচই কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BMDA), পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (RDA) ও সামাজিক উন্নয়ন তহবিল (SDF) প্রচলন করা হয়েছে। ফলাফল মিশ্র প্রকৃতির হলেও এর চাহিদা বর্ধনশীল। ক্ষুদ্রাকার

সেবাদানকারীরা সেপটিক ট্যাংকের বর্জ্য অবমুক্তকরণ ও অপসারণের কাজও করে থাকে। নগরাঞ্চলে কিছু এনজিও সেপটিক ট্যাংক পরিস্কার করতে সাকশান মেশিন ব্যবহারের অনেক দৃষ্টান্ত রেখেছে। তথাপিও নিরাপদ ও পরিবেশ-বান্ধব উপায়ে বর্জ্য অবমুক্তকরণের কাজটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আরও ব্যাপক উন্নতি দরকার। নগর বস্তিতে এনজিও অথবা জনগোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠন (CBOs) কর্তৃক পানির উৎস পরিচালনার কিছু সাফল্য গাথাও রয়েছে। এরা সেবাদানকারীদের কাছ থেকে পানি কেনে ও ব্যবহারকারীদের কাছে বিক্রি করে (বক্স ৩.১১)।

ভবিষ্যতে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আওতা-বহির্ভূত এলাকায় পাইপবাহিত সাব-নেটওয়ার্ক পরিচালনার কাজে ক্ষুদ্রাকার সেবাদানকারীদের যুক্ত করা যেতে পারে। তাদেরকে চুক্তিবদ্ধ করা যেতে পারে সহজ ও বিকেন্দ্রীকৃত বর্জ্য পানি পরিশোধন প্লান্ট-এর কাজেও।

ক্ষুদ্রাকার সেবাদানকারীদের অবস্থার আরও উন্নতির জন্য সামর্থ্য-বৃদ্ধিমূলক সহায়তা প্রয়োজন। এছাড়াও পরিবেশগত সংরক্ষণ ও মান নিশ্চিতকরণের বিধান প্রবর্তন করাও জরুরি।

বক্স ৩.১১ বাংলাদেশ: সেবাসুবিধার ক্ষেত্রে ঢাকার বস্তিবাসীদের অভিগম্যতার উন্নয়ন

বাংলাদেশের আনুমানিক ২৫ শতাংশ মানুষ শহর এলাকায় বসবাস করে। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বেশিরভাগ নগরে পরিবারহসমূহের জমির আইনসম্মত অধিকার ব্যতীত পানি সরবরাহ সুবিধা ভোগের অনুমতি ছিল না। ঢাকায় ১৪৮ লক্ষ জনসংখ্যার ৩৫ ভাগের বাস নগরের বস্তি ও অবৈধভাবে দখলকৃত বসতিতে। অর্থাৎ অধিবাসীরা যে জমিতে বসবাস করে তার মালিকানা প্রদর্শনে তাঁরা অক্ষম। ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসুবিধা পাবার অধিকার তাঁদের ছিল না।

১৯৯২ সালে ওয়াটারএইড বাংলাদেশের সহযোগী সংস্থা দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (DSK) নামের ঢাকাভিত্তিক এনজিও বস্তিবাসী ও ঢাকা ওয়াসার মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন শুরু করে। DSK জমির মালিকানা থেকে পানি সুবিধার অভিগম্যতাকে পৃথক করার যুক্তি দেখায়। সংগঠনটি জনগোষ্ঠী কর্তৃক বিল পরিশোধের নিশ্চয়তাস্বরুপ নিরাপত্তা জামানতেরও ব্যবস্থা করে। এরুপ ব্যবস্থার ফলে ঢাকা ওয়াসা ১৯৯২ ও ১৯৯৪ সালে ঢাকার দরিদ্র-প্রবণ এলাকায় দুটি পানি উৎস স্থাপনের অনুমতি দেয়।

শহরের গরীব মানুষদের টেকসই পানি সরবরাহের জন্য পরবর্তীতে DSK এ অভিজ্ঞতাকে একটি মডেলে উন্নীত করে। এছাড়াও ১২টি বস্তির জনগোষ্ঠীতে মডেলটির ভিত্তিতে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প (পাইলট প্রজেক্ট) গ্রহণের জন্য ঢাকা ওয়াসার সাথে সমঝোতায় উপনীত হয়। DSK পানির উৎস ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়নে কাজ করে। তাছাড়াও নিয়মিত বিল পরিশোধ ও পুরো মূলধন ব্যয় পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করা হয়। নিয়মিত বিল পরিশোধের ১৬ বছর পর ২০০৮ সনে, ঢাকা ওয়াসার সাথে সুরক্ষিত চুক্তি স্বাক্ষর একটি যুগান্তকারী ঘটনা। চুক্তি অনুযায়ী কোন মধ্যস্থতাকারী ব্যতিরেকেই পানি সংযোগ নেয়ার আবেদন করার জন্য CBOদের অনুমতি দেয়া হয়।

আজ এসকল জনগোষ্ঠী ঢাকা ওয়াসার গ্রাহক বা ক্রেতা হিসেবে সম্মানিত এবং প্রকল্পটি এখন সারা দেশে প্রবর্তিত হতে যাচ্ছে। অতীতে যারা সেবা থেকে বাদ পড়েছিল এখন তাঁরা পানির উৎস পরিকল্পনা ও ব্যবহারে এবং পরিশোধ স্কীমে সক্রিয়ভাবে জড়িত।

উৎসঃ নগর দরিদ্রদের দৃশ্যমানতা ও মতামত দেয়ার অধিকার উন্নয়নে নগর পানি ও স্যানিটেশন সংস্কারে সুশীল সমাজের সম্পৃক্ততা – ওয়াটারএইড কান্ট্রি প্রোগ্রামের অভিজ্ঞতা। ওয়াটারএইড প্রতিবেদন, মার্চ ২০১০

কর্ম-নির্দেশনা

ক্ষুদ্রাকার সেবাদানকারীদের উন্নয়নের জন্য কর্ম-নির্দেশনাগুলোয় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

- যথাযথ মডেল উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ পানি সরবরাহের সকল মডেল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা অব্যাহত রাখা;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততাসহ সেবার মান ও পরিবেশগত সংরক্ষণ বিষয়ক বিধি-বিধান প্রণয়ন করা। এর মধ্যে লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ: প্লাম্বিং, বর্জ্য অপসারণ এবং আর্সেনিক ও পানির অন্যান্য গুণাগুণ পরীক্ষার লাইসেন্স প্রদান;

- বিদ্যমান ব্যবসা শক্তিশালীকরণ ও নতুন ব্যবসা প্রবর্তনে (উন্নয়নে) কারিগরী ও ব্যবস্থাপনাগত সহায়তা প্রদান করা। এটা ডিপিএইচই'র মাধ্যমে হতে পারে;
- পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারে ক্ষুদ্রাকার সেবাদানকারীদের সম্পৃক্ততাকে উৎসাহিত করা। যেমন: হস্তচালিত পাম্প বিক্রির সময় পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার ও পায়খানা সামগ্রী বিক্রিকালে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার সম্পর্কিত প্রচারপত্র বিলি করা;
- মেকানিক, প্রেরণাদানকারী ও পানি গুণাগুণ পরীক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান। ডিপিএইচই এটা করতে পারে; ও
- যাতে করে ক্ষুদ্রাকার বাজার চাহিদা নিরুপণ ও তা পূরণে নিজেদের প্রস্তুত রাখতে পারে সেজন্য জাতীয় কর্মসূচিসমূহ ওয়েব সাইটে দেয়া।

৩.৯.৪ বৃহদাকার নগরসেবা প্রতিষ্ঠানের বাজার

বর্তমানে নগর এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বৃহদাকার বেসরকারি খাতের খুব বেশি অংশগ্রহণ নেই। ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ঢাকা নগরীর কিছু এলাকার জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বিল করা ও আদায়ের জন্য সম্পাদিত চুক্তি বিভিন্ন মাত্রার সফলতা দেখেছে। ঢাকা ওয়াসাও ডিস্ট্রিক্ট মিটারযুক্ত এলাকার পরিচালনা ও সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থাপনা-চুক্তির সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করছে। ২০০৫ সনে ফরিদপুর পৌরসভায় বিল করা ও আদায়ের জন্য স্থানীয় একটি বেসরকারি সংস্থার সাথে ৩ বছর মেয়াদি সেবাচুক্তি সম্পাদন করেছিল। এতে রাজস্ব আদায় বাড়লেও পৌরসভা বিভিন্ন কারণে চুক্তির মেয়াদ আর বাড়ায়নি।

নগরসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ মডেলটি সাধারণ সেবা ও ব্যবস্থাপনা চুক্তি থেকে আরও অগ্রবর্তী ধরণের হতে পারে। যেমনঃ নির্মাণ, পরিচালনা ও হস্তান্তর বা বিল্ড অপারেট ট্রান্সফার (BOT) ও বিশেষ সুবিধা প্রদান বা কন্‌সেশন চুক্তি। জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা, ১৯৯৮-এ নির্মাণ, পরিচালনা ও মালিক বা বিল্ড, অপারেট ও ওন (BOO) ও BOT স্কীমের মাধ্যমে নগর পানি সরবরাহে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা PPP (সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ বা FDI সহ) বাংলাদেশ বেসরকারি খাত অবকাঠামো নির্দেশিকা (BPSIG) ২০০৪ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এতে পানি ও স্যানিটেশন উপযুক্ত একটি খাত। বেসরকারি অবকাঠামো কমিটি (PICOM) PPP প্রকল্পের তালিকা, প্রক্রিয়াকরণ ও পরিবীক্ষণ করে। সরকার PPP উন্নয়নে উচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। জুন ২০০৯-এ অর্থ বিভাগ একটি অবস্থানপত্র প্রকাশ করেছে। এর শিরোনাম ছিল, "সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উদ্দীপ্ত বিনিয়োগ উদ্যোগ (Invigorating Investment Initiative through Public Private Partnership)।" এখানেও পানি ও স্যানিটেশনকে অগ্রাধিকারভুক্ত সেক্টর হিসেবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে, বাংলাদেশে পানি ও স্যানিটেশন সেক্টর PPP'র জন্য বেশ সম্ভাবনাময়[৪২]। যাহোক, অতিমাত্রায় অগ্রসর PPP'র জন্য দেশীয় বিনিয়োগ পরিবেশ খুব সহায়ক নয়। বিনিয়োগকারীদের স্পষ্ট নিশ্চয়তা দেওয়া না হলে এবং আন্তর্জাতিক অর্থায়নকারীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়া না গেলে FDI'র সম্ভাবনা কম-ই থেকে যাবে। শুরুতে স্থানীয় বেসরকারি খাত মডেলের (স্থানীয় PPP মডেল) ভিত্তিতে PPP হওয়া উচিত। পর্যায়ক্রমে অভিজ্ঞতা বাড়ার সাথে সাথে বেসরকারি পুঁজি আকর্ষণসহ উচ্চধরণের PPP বাস্তবায়ন সম্ভব। এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ত্রিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের (TPP) ভিত্তিতেও PPP বাস্তবায়ন হতে পারে (বক্স ৩.১২)।

PPP'র অন্যতম পূর্বশর্ত হলো, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ভালভাবে বিকশিত এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য তাদের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন আছে। যাহোক, পৌরসভার ক্ষেত্রে পানি সরবরাহ শাখাটি পৌরসভার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীন। অথচ তাদের নিজেদেরই পর্যাপ্ত স্বায়ত্বশাসনের অভাব রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পৌরসভা পানি সরবরাহ শাখার (PWSS) হিসাব পৃথকভাবে রাখা হয় না। অন্যদিকে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া পৌরসভা নতুন কর্মী নিয়োগ করতে পারে না। অতএব PPP ব্যবস্থার মাধ্যমে বিনিয়োগসহ বেসরকারি খাতের বর্ধিত সম্পৃক্ততার জন্য একটি স্পষ্ট পথ

[৪২] বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানের জন্য বেসরকারি খাতকে জড়িত করার সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহের তালিকা, রাজকীয় নেদারল্যান্ড দূতাবাস, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৬।

তৈরি করা প্রয়োজন। এ প্রক্রিয়ায় যখন বেসরকারি খাতের জন্য বর্ধিত ভূমিকা থাকবে, তখন সরকারি খাত পর্যায়ে প্রচুর প্রস্তুতিমূলক কাজ করার মত থাকবে।

বক্স ৩.১২ অধিকতর ভারসাম্যপূর্ণ ও টেকসই সমাধানের জন্য ত্রিপক্ষীয় অংশীদারিত্ব

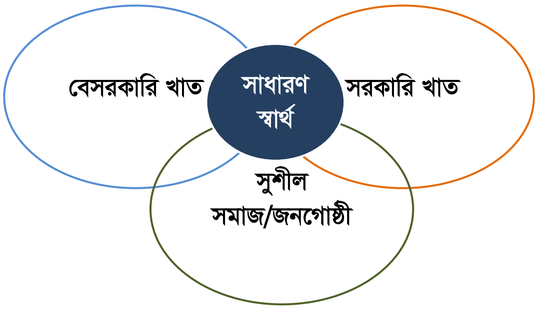

পানি সরবরাহ খাতে PPP সেসব মানুষদের সতর্ক করতে পারে, যারা বিশ্বাস করে যে, পানি সাধারণ একটি গণপণ্য। তাঁরা ভেবে ভয় পায় যে, এ সেবার ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতকে জড়ানো মানেই পানির শুল্কবৃদ্ধি, নিম্নমানের সেবা ও অশুভ আঁতাত।

যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনায় এনজিও/সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করা যায়, তবে ব্যবহারকারীদের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করা যেতে পারে। ঘটনা এমন হলে এটা সম্ভবতঃ পুরো সেবা কার্যক্রমকে অধিকতর টেকসই করবে। ফলে তা বেসরকারি পরিচালনাকারীদের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় হবে। PPP প্রকল্পে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সক্রিয় সম্পৃক্ততার ফলাফল হতে পারে TPPতে উত্তরণ।

নতুন কিছু PPP উদ্যোগে এনজিওসমূহ ও জনগোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠনগুলো ক্রমবর্ধমান হারে সক্রিয় অংশীদার হচ্ছে। তারা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষ, বিশেষভাবে দরিদ্রদের প্রতিনিধিত্ব করে। ইংল্যান্ড ও ওয়েলস্ (ইউকে), বুয়েনেস্ আইরিস (আর্জেন্টিনা), ম্যানিলা (ফিলিফিনস্) ও জাকার্তায় (ইন্দোনেশিয়া) TPP কার্যকর হিসেবে প্রমাণিত। এগুলো সবই আন্তর্জাতিক পর্যায়ের PPP (IRC-Jo Smet)।

কর্ম-নির্দেশনা

নগরসেবা বাজার উপাদানসমূহের উন্নয়নে সুপারিশমালা:

- PPP মডেল প্রণয়নকালে TPP'র ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করা। এর মাধ্যমে সামাজিক গুণাবলী দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হবে এবং দরিদ্র মানুষের মতামতের প্রতিফলন ঘটবে;
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরকে প্রস্তুত করার মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারী অংশীদারিত্বের (PPP) পথে উত্তরণ (বক্স ৩.১৩)। এর অন্তর্নিহিত নীতি হলো প্রথমে সহজধরণের, যেমন: সেবা বা ব্যবস্থাপনা চুক্তি দিয়ে শুরু করা;
- জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালার সুপারিশ অনুসারে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য PPP নির্দেশিকা প্রণয়ন করা । এ নির্দেশিকায় সরকারের উৎসাহব্যঞ্জক অভিপ্রায়সমূহ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে হবে। PPP বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জনের পর নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা যেতে পারে; এবং
- পর্যায়ক্রমে PPP প্রচলনের জন্য একটি সহায়তাকারী সংস্থা (যেমন: Infrastructure Investment Facilitation Center – IIFC) নিয়োগ করা। এছাড়া সমন্বয় ও নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহ সমন্বয় ও সমর্থনের জন্য একটি সরকারি প্রতিরূপ-পক্ষ (counterpart) প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন (উদাহরণস্বরূপ, পলিসি সাপোর্ট ইউনিট বা PSU)।

বক্স ৩.১৩ বাংলাদেশে PPP'র উত্তরণ পর্যায়

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরকে প্রস্তুত করা:

- *পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর স্বায়ত্ত্বশাসন প্রদান;*
- *প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ;*
- *পানি শুল্ক কাঠামোকে যৌক্তিক করা;*
- *জনসচেতনতা সৃষ্টি;*
- *একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা (পৃথক ডকুমেন্ট দেখুন...)।*

সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রস্তুত করা:

- *একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি বাস্তবায়ন;*
- *বিল করা ও আদায় ব্যবস্থার উন্নয়ন;*
- *যেখানে সম্ভব মিটার ব্যবস্থা চালু করা:*
- *সম্পদের উন্নত রেজিস্টার তৈরি করা;*
- *MIS বাস্তবায়ন; ও*
- *সংখ্যা ও দক্ষতার সংমিশ্রণে কর্মীবিন্যাস যৌক্তিক করা।*

বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানের জন্য বেসরকারি খাতকে জড়িত করার সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহের তালিকা, রাজকীয় নেদারল্যান্ডস্ দূতাবাস, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৬ থেকে নেয়া।

৩.১০ পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

৩.১০.১ পরিবেশ, উন্নয়ন, দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন ও জীবিকার মধ্যে যোগসূত্র

ভূমি, পানি ও বায়ু নিয়ে গঠিত প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত অবনতির মধ্য দিয়ে সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়। উন্নয়ন হচ্ছে দালানকোঠা ও ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নসহ প্রাকৃতিক ও মনুষ্য-সৃষ্ট পরিবর্তনসমূহ। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও দারিদ্র্য বিমোচনের মত বিষয়গুলো মানবিক কল্যাণমূলক উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে দুর্যোগের অন্তর্ভুক্ত হলো চরম প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ, যেমনঃ ভূমিকম্প, বন্যা, খরা ও গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের দীর্ঘমাত্রার প্রভাব। জলবায়ু পরিবর্তন হলো প্রাকৃতিক ও মনুষ্য-সৃষ্ট বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রভাবিত জলবায়ু সংশ্লিষ্ট চরম দুর্যোগের বারংবার সংঘঠন ও গভীরতা। এর মধ্যে আছে বন্যা, খরা ও গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়। অবলম্বিত ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে পরিবেশ, উন্নয়ন, দুর্যোগ ও জলবায়ুর পরিবর্তন সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকাকে ইতিবাচক অথবা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। দুর্যোগের প্রেক্ষিতের দিক থেকে জলবায়ু পরিবর্তনসহ এসব উন্নয়ন ও পরিবেশগত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা একটি দৃঢ় পারস্পরিক-নির্ভরশীলতা দেখতে পাই। এগুলোর প্রত্যেকটি অপরকে প্রভাবিত করে অথবা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এসব মিথষ্ক্রিয়ার কেন্দ্রে রয়েছে "ঝুঁকি প্রশমন ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি"র (বক্স ৩.১৪) উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ এই উদ্দেশ্য থেকেই মানবিক নিরাপত্তার সার্বিক পরিমণ্ডলটি গঠিত।

মানবিক নিরাপত্তা মানুষের স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত। ২০০০ সনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলনে মানবিক নিরাপত্তাকে প্রথমবারের মত একটি উন্নয়ন ধারণা হিসেবে অভিহিত করা হয়। ধারণাটি সাধারণ মানুষ কর্তৃক ভোগকৃত 'স্বাধীনতার মাত্রা'র সাথে সম্পর্কিত।

বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনায় (NPDM) ২০১০-২৫ (চূড়ান্ত খসড়া, মার্চ ২০১০) টেকসই উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে একটি স্বচ্ছ নীতি ও কৌশলের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি স্বীকার করেছে। এটা পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও কার্যকর দুর্যোগ প্রশমনের সাথে যুক্ত।

বক্স ৩.১৪ পরিবেশ, উন্নয়ন, দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে যোগসূত্র

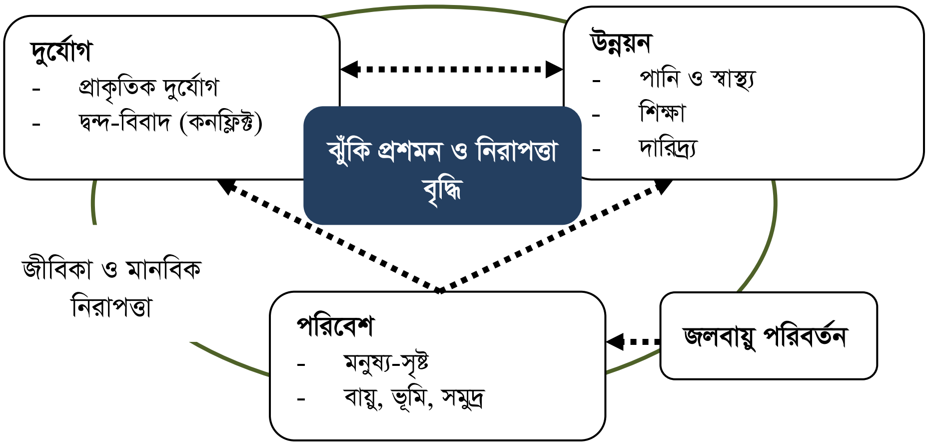

রাজীব শ, কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক উপস্থাপনা হতে গৃহীত।
(www.info.worldbank.org/etools/docs/library/230308/Session)

৩.১০.২ পরিবেশ

পরিবেশের মধ্যে ভূমি, পানি, বায়ু ও ভৌতসম্পদ এবং তাদের মধ্যেকার বিদ্যমান আন্তঃসম্পর্ক অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এছাড়াও রয়েছে মানব সত্ত্বা, অন্যান্য জীবসত্ত্বা, অন্যান্য প্রাণীকূল, উদ্ভিদ ও অনুজীবসমূহ (বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর অনুচ্ছেদ ২ঘ)। পরিবেশের চারটি বৃহত্তর ক্ষেত্র, যা প্রধানতঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আলোকপাত করা হয়েছে সেগুলো হলোঃ ভৌত পরিবেশ, জীব পরিবেশ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ (বক্স ৩.১৫)।

বক্স ৩.১৫ পরিবেশের বৃহত্তর ক্ষেত্র

ভৌত পরিবেশ
- ভূ-সংস্থান ও মাটি
- বায়ুমন্ডল (বায়ুর গুণাগুণ ও জলবায়ু)
- ভূ-বিদ্যা ও ভূ-কম্পবিদ্যা
- পানি সম্পদ (পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনসহ)

জীব পরিবেশ
- মৎস ও বন্য প্রাণী
- উদ্ভিদ জগত ও বন
- বিরল ও বিপন্ন প্রজাতি
- সংরক্ষিত এলাকা
- পানি সম্পদ (পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনসহ)

অর্থনৈতিক পরিবেশ
- স্বাভাবিক বৃত্তিমূলক কাঠামো
- ভূমি ব্যবহার
- শিল্প ও কৃষি
- অবকাঠামো
- পরিবহণ

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ
- জনসংখ্যা তত্ত্ব
- আর্থ-সামাজিক অবস্থা
- স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুবিধা
- ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পর্যটন

পানি ও স্যানিটেশনের সাথে সম্পর্কিত পরিবেশগত সমস্যা

পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো পানি, মানব জীবনে যার অবদান তাৎপর্য্যপূর্ণ। কিন্তু পানির উৎসগুলো যেমন: নদী, লেক ও পুকুর মানুষের অপরিকল্পিত কর্মকাণ্ডের কারণে দূষিত হচ্ছে।

পানির প্রধান দুটি উৎস হলো ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি। দুটি উৎসই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত (বক্স ৩.১ দেখুন)। ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি দূষিত হয়ঃ ১) শহর, কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থার সাথে সন্নিকটস্থ পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া; ও ২) পরিশোধিত বা অপরিশোধিত শিল্পকারখানার তরলবর্জ্য, সার ও অন্যান্য কৃষিজ রাসায়নিকের নিঃসরণ দ্বারা। বাংলাদেশে দূষণের প্রেক্ষিতে এসব ব্যবস্থা সরাসরি ভূ-গর্ভস্থ পানির সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া না করলেও ভূ-পৃষ্ঠস্থ দূষিত পানি চুইয়ে মাটির অভ্যন্তরে সঞ্চারিত হয়। ফলশ্রুতিতে ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষিত হয়। প্রাকৃতিক কারণেও ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষিত হতে পারে, যেমন আর্সেনিক। ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ অনুচ্ছেদ ৩.৩-এ আলোচিত এবং এ অনুচ্ছেদে পরিবেশের জন্য চরম উদ্বেগের কারণ হিসেবে চিহ্নিত ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি দূষণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

পানির উৎসের চরম দূষণ বাংলাদেশের জন্য একটি জরুরি বিষয়। যথাযথভাবে পরিচালিত না হলে স্যানিটেশন ব্যবস্থাও পানিসম্পদকে দূষিত করে। এতে পানির গুণাগুণ ও মানুষের স্বাস্থ্যে প্রভাব পড়ে। ২০০৬ সনে বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত 'বাংলাদেশ ভূখণ্ডে পরিবেশ বিশ্লেষণ' বাংলাদেশের জন্য পাঁচটি অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে। সেগুলো হলোঃ ১) পরিবেশগত স্বাস্থ্য (পানি, স্যানিটেশন ও বায়ু দূষণের প্রভাবসহ); ২) ঢাকার ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির গুণ; ৩) আবদ্ধ মৎসক্ষেত্র; ৪) মাটির গুণাগুণ; ও ৫) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানসমূহ। এসব বিষয়ে পরিবেশগত প্রভাবকে একত্রে হিসেবে নেয়া হলে মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় জিডিপি'র ৪.২ শতাংশে। এ ক্ষতির ৩৭ ভাগ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিনের জন্য, ২৩ ভাগ নগর এলাকার বায়ুর গুণাগুণ, ২১ ভাগ গৃহমধ্যস্থ বায়ু দূষণের, ১৭.৫ ভাগ ঢাকার ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির গুণের জন্য ও ২.৫ ভাগ মৎসচাষের কারণে হয়ে থাকে।

ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি দূষণ

ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি দূষণ যথাক্রমে প্রবাহমান পানি (নদী, খাল, ইত্যাদি) ও মুক্ত পানির (অপ্রবাহমান) আধারকে (পুকুর, হাওড়, বাওড় ও অন্যান্য) নির্দেশ করে। নদী ও খালের পানি দূষিত হয় প্রধানতঃ শিল্পকারখানা ও নগর থেকে নদীতে অপরিশোধিত বর্জ্য অপসারণের কারণে। অন্যদিকে পুকুর, হাওড় ও বাওড়ের পানিদূষণ ঘটে অত্যধিক কীটনাশক ব্যবহার ও ভূমি ক্ষয়ের ফলে।

বড় বড় শহরের ভিতর ও চারপাশে পানির দূষণ মারাত্মক। ঢাকা, চট্রগ্রাম ও খুলনা শহরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সমস্যাসহ ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি দূষণের সমস্যাসমূহ বক্স ৩.১৬-এ দেখানো হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানিদূষণ দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যকে প্রভাবান্বিত করে। কারণ তাঁরা সংক্রমিত ও অসংক্রমিত উৎস থেকে পছন্দেরটি বেছে নিতে পারে না। গ্রামীণ ও নগর এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র মানুষের দুর্ভোগের প্রধান কারণ পানিবাহিত রোগ। এটা গ্রামীণ ও নগর উভয় এলাকার মানুষের (বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারসমূহের জন্য) গোসলের পানি সমস্যার সাথে মিশে বাংলাদেশের জন্য প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

ধারণা করা হচ্ছে দ্রুত বর্ধনশীল নগরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে পানি দূষণ ভয়াবহভাবে বেড়ে যাবে। পরিবেশের ওপর চাপ, দূষণের পর্যায় ও জীবনের ওপর প্রভাব এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেকার আন্তঃযোগসূত্র বক্স ৩.১৭ এর ছকে দেখানো হলো।

ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি দূষণের অন্যতম প্রধান প্রদায়ক হলো মলজনিত বস্তু। পানির গুণাগুণের ক্ষেত্রে মূল সমস্যা হলো নগরের বর্জ্য পানি পরিশোধনের অপর্যাপ্ত সুবিধা। সারাদেশে একটি মাত্র তরল বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট আছে। এটা ঢাকার একটি মাত্র অংশকে সেবা দিতে পারে। অন্য এলাকায় সেপটিক ট্যাংক ও গর্ত পায়খানা ব্যবহৃত হয়। গ্রামাঞ্চলে বহুল ব্যবহৃত গর্ত পায়খানাগুলো বর্ষাকালে সাধারণতঃ পানিতে নিমজ্জিত হয়ে যায়। এতে আশপাশের ভূমি ও জলাশয়ে ব্যাপকহারে পয়ঃদূষণ ছড়িয়ে পড়ে।

বক্স ৩.১৬ বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নগরী – ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি দূষণ

ঢাকা *শহর ও এর চারপাশে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির অবস্থা বিশেষ করে গ্রীষ্ম মওসুমে খুবই খারাপ থাকে। মৎসক্ষেত্রের, গতানুগতিক পরিশোধনের (বিওডি ৬ মিলি গ্রাম/লি.) পর খাবার পানির উৎস ও মৎস চাষের (এ্যামোনিয়া ১.২ মিলি গ্রা/লি.) জন্য ব্যবহার্য পানির গুণ নির্দেশক তুলনা করা হলে একটি চিত্র পাওয়া যায়। এতে দেখা যায়, শুষ্ক মওসুমে ঢাকার চারপাশের ৯৫ শতাংশ নদীর পানির গুণস্তর ২০০ শতাংশ অতিক্রম করে ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত হয় (বাংলাদেশ ভূখন্ডে পরিবেশগত বিশ্লেষণ, বিশ্বব্যাংক, সেপ্টেম্বর ২০০৬)। পানির গুণের এসব সমস্যা বহুল সংখ্যক শিল্পকারখানার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। বিশেষ করে চামড়া শিল্প, যা নদীতে অপরিশোধিত বর্জ্য নির্গত করে। বস্তুতঃ এসব নদীব্যবস্থা জীব পরিবেশগতভাবে মৃত। দেখা যাচ্ছে, নদীসমূহে কোন মাছ বা জলজ প্রাণী অথবা উদ্ভিদ নেই।*

শুষ্ক মওসুমে বিশেষ উদ্বেগের অন্যতম হলো সায়দাবাদ পরিশোধন প্লান্টে ব্যবহৃত অরুপান্তরিত পানিতে উচ্চমাত্রার এ্যামোনিয়া। এখন এ পানিকে খাবার পানির গুণগত মানে নিয়ে যেতে প্লান্টের পরিশোধন ক্ষমতা হুমকির সম্মুখীন। এ্যালুমিনিয়াম, লীড, ক্যাডমিয়াম, মার্কারী ও ক্রোমসহ ভারী ধাতুর ঘনীভবনের অত্যধিক পরিমাণে উপস্থিতি রাসায়নিক সংক্রমণকে বাড়িয়ে তুলেছে। এতে পানি পরিশোধনে নতুন মাত্রার জটিলতা যুক্ত হয়েছে (পরিবেশের অবস্থা, ঢাকা সিটি, ২০০৫– ইউএনইপি)।

চট্টগ্রাম *শহর কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। সেখানে রয়েছে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর। এ নদীতে শিল্প, পৌর ও হাসপাতাল বর্জ্য এবং বিপুল পরিমাণে কৃষি-রাসায়নিক-এর উচ্ছিষ্ট বা অবশিষ্টাংশ ফেলা হয়। উদাহরণস্বরূপঃ হাটহাজারী রোডে বটতলী বাজারে অবস্থিত চামড়া শিল্প, কালুরঘাটের ক্ষতিকর শিল্পাঞ্চল, হাইড ও স্কীন ব্যবসা জোন আতুরার ডিপো থেকে প্রতিদিন ১৫০,০০০ লিটার তরল রাসায়নিক বর্জ্য নির্গত হয়। এ বর্জ্যের মধ্যে ক্রোমিয়াম যৌগও অন্তর্ভুক্ত। উজানে অবস্থিত কর্ণফুলী কাগজ কল প্রতিদিন ০.৩৫ টন চায়না ক্লে ও অন্যান্য রাসায়নিক অপসারণ করে (চট্টগ্রাম বন্দর বাণিজ্য সম্প্রসারণ প্রকল্প, ভলিউম ২, এডিবি, মে ২০০৪)।*

নদী দূষণের কারণে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ এমন স্তর পর্যন্ত হ্রাস পায়, যা মাছসহ জলজ সম্পদের বেঁচে থাকার জন্য অপ্রতুল। জাহাজ বা নৌকা হতে দুর্ঘটনাক্রমে উপচে পড়া তেলও দূষণ ঘটায়। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, পানির উপর তেলের পাতলা আবরণ আলোর অনুপ্রবেশে বিঘ্ন ঘটায়। এছাড়াও পানি ও বায়ুর ইন্টারফেসে অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বিনিময়কে বিঘ্নিত করে। এতে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয় এবং দ্রবীভূত অক্সিজেন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। মৎসজীবীদের মধ্যে কর্মরত এনজিও কমিউনিটি উন্নয়ন কেন্দ্র (CODEC) আভাস দিয়েছে যে, অতীতে কর্ণফুলী নদীর ওপর নির্ভরশীল রাউজান, রাঙ্গুনিয়া ও আনোয়ারা উপজেলার প্রায় ২০,০০০ জেলের অনেকে মৎস শিকার পেশা ছেড়ে দিয়েছে। কারণ তাঁরা এখন যথেষ্ট মাছ পায়না।

ভৈরব ও রুপসা নদীতীরে ***খুলনা*** *নগরী অবস্থিত। নগরে বা সন্নিকটে প্রধান দূষণকারী শিল্প হচ্ছে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল এবং পাট, বস্ত্র ও মৎস প্রক্রিয়াকরণের মত অন্যান্য শিল্প। এসব শিল্প প্রতিদিন নদীগুলোতে প্রায় ১ কোটি গ্যালন তরল বর্জ্য নির্গত করে। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল একাই নিঃসরণ করে ৪৬ লক্ষ গ্যালন (খুলনা নগরের জন্য পরিবেশগত মানচিত্র ও ওয়ার্ক বুক, আগষ্ট ১৯৯৯)।*

জানা গেছে যে, খুলনা নগরী বরাবর প্রবাহমান ভৈরব নদীর বিস্তৃত ধারা বিগত দু'দশক যাবত মৎসশুন্য। খুব সম্ভব এ অবস্থা হয়েছে শিল্পবর্জ্য দ্বারা দূষণের কারণে। এসব দূষণকারক সুন্দরবনসহ এতদাঞ্চলের মিঠা পানি ও সামুদ্রিক বাস্তু-সংস্থান উভয়েরই মারাত্মক ক্ষতির কারণ।

আইনি কাঠামো

১৯৯৫ সনের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন বাংলাদেশের পরিবেশ ব্যবস্থাপনার ভিত্তি। এ আইন অনুযায়ী বাস্তবায়নের পূর্বে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর (DOE) থেকে পরিবেশ ছাড়পত্র (Environment Clearance Certificate) নেওয়া বাধ্যতামূলক। আইনের অধীনে ১৯৯৭ সনে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা প্রণীত হয়। বিভিন্ন প্রকল্পের ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য অনুসৃত প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় দলিলাদি প্রদর্শনের বিষয় এতে উল্লেখ

রয়েছে। বিধিমালার তফসিল ৩ পানি ও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট। এ তফশিলে নির্ধারিত আছে পারিপার্শ্বিক পানির ও খাবার পানির গুণগত মানদণ্ড। তফশিল ১০-এ বর্ণিত আছে শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প থেকে নিঃসরিত তরল বর্জ্যের মানদণ্ড।

বক্স ৩.১৭ পরিবেশের ওপর চাপ, দূষণ পর্যায় এবং জীবন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর প্রভাবের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক

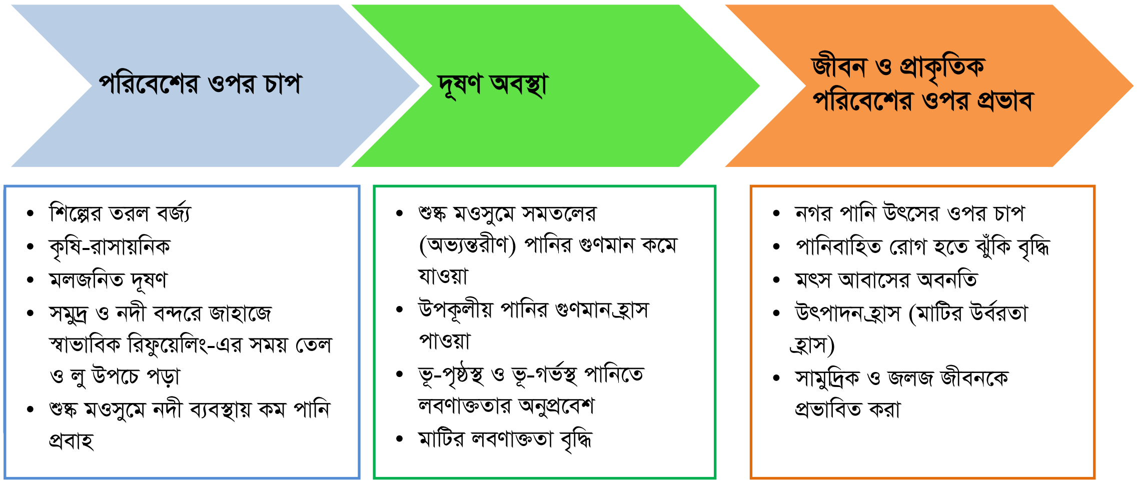

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-তে বর্জ্য, বর্জ্য পরিশোধন, গাদ/স্লাজ ব্যবস্থাপনা ও তরলবর্জ্য পরিশোধন নিয়ন্ত্রণের কোন সুনির্দিষ্ট বিধান রাখা হয়নি। তাই বিধিমালাটিতে নিম্নবর্ণিত সংশোধন আনার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি:

- নগর জলাশয়গুলোর রাসায়নিক দূষণের নিরিখে তফসিল ৩-এ অধিক স্থিতিমাপসহ (প্যারামিটার) ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির গুণগত মানদণ্ড আরো বিস্তারিত উল্লেখ করা; ও
- খাবার পানির গুণগত মানদণ্ড সংশোধন করা (অনুচ্ছেদ ৩.৪-এ আলোচিত)।

পানি দূষণ:

- নগর জলাশয়ে পানিদূষণের পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের আলোকে আরো স্থিতিমাপসহ উৎসভিত্তিক পানি নির্গমন মানদণ্ড সংশোধন (তফসিল ৯ ও ১০)।

তরল বর্জ্য/সিউয়েজ নির্গমন ব্যবস্থাপনা:

- শিল্পকারখানার নির্গমন মানদণ্ডে তরল বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট অন্তর্ভুক্তকরণ (তফসিল ১১)।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানসমূহ

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়-এর অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর (DOE)। পানিসম্পদের দূষণ নিরোধসহ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ও সংশ্লিষ্ট আইন বলবৎ করার ক্ষেত্রে DOE'র কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব রয়েছে। আশা করা হচ্ছে বিভিন্ন সেক্টরের, যেমন: ভূমি ব্যবহার, পানি ও বিষাক্ত রাসায়নিক, পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত নীতি ও আইন-কানুন DOE'র কাজে সহায়ক হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী কর্তৃক পরিবেশগত মানদণ্ডের বিপরীতে DOE'র বিধান প্রতিপালন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জটিলতা কমিয়ে আনা যেতে পারে। এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে, দূষণের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে গণ তথ্যব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়তা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

পানি খাতে সম্পৃক্ত প্রধান সংস্থাগুলো, যেমনঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) ও ওয়াসাগুলোর নিজস্ব প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পরিবেশগত নির্দেশিকা রয়েছে। LGED একটি পরিবেশ কোষ প্রতিষ্ঠা করেছে। যাহোক, এসব সংস্থায় পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ কর্মীর অভাব বিদ্যমান। DPHE এখনও একটি নিবেদিত পরিবেশগত ইউনিট প্রতিষ্ঠার অপেক্ষায়। পরিবেশগত সচেতনতা ও ক্ষমতায়ন বিষয়ে সেক্টর সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান পরিবেশগত মান উন্নয়নে বিপুলভাবে সহায়ক হবে।

৩.১০.৩ জলবায়ু পরিবর্তন

ভূমিকা

বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি এখন তর্কাতীত। জলবায়ু পরিবর্তন উন্নয়ন চ্যালেঞ্জসমূহকে আরো জটিল করে তুলছে এবং সুনির্দিষ্টভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে। অধিকতর খরা, অতিমাত্রায় বন্যা, অতি উচ্চ তীব্রতার ঝড় ও অধিকতর তাপ প্রবাহের মাধ্যমে এর প্রভাব ইতোমধ্যেই বৈশ্বিকভাবে অনুভূত হচ্ছে। এতে ব্যক্তি ও সরকারের ওপর করের বোঝা বাড়ছে এবং উন্নয়ন থেকে সম্পদ অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এ শতাব্দীর শেষে তাপমাত্রা ৫° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত বাড়তে বা প্রাক-শিল্পযুগের তুলনায় বেশিও হতে পারে। এমনকি আজ যেমন আছে তা বদলে ভিন্ন একটা ধরণী গড়ে দিতে পারে। আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্ত্বেও, তাপমাত্রা ২° ডিগ্রী পর্যন্ত বৃদ্ধি পেলেও ঘন ঘন ও চরম আবহাওয়াজনিত ঘটনা ঘটতে পারে। এসব ঘটনাগুলো হতে পারে তাপপ্রবাহ, অনেক অঞ্চলে পানির ওপর কঠিন চাপ বৃদ্ধি, খাদ্য উৎপাদন কমে যাওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত বাস্তু-সংস্থান ও আরও অনেক কিছু। সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ একটি স্পষ্ট পূর্বাভাস দিচ্ছে যে, পর্যাপ্ত অভিযোজন ব্যবস্থা গ্রহণ আশু প্রয়োজন।

> ***"জলবায়ু ব্যবস্থার দ্ব্যর্থহীন পূর্বাভাস"*** *– জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেল-এর চতুর্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদন (আইপিসিসি) ২০০৭।*

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেল-এর চতুর্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদন (IPCC), ২০০৭ খুব নিখুঁত ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্ণনা করেছে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম নির্মম শিকার হিসেবে চিহ্নিত। দেশটির ভৌগলিক অবস্থান, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নিম্ন উচ্চতা, জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্ব, দুর্বল অবকাঠামো, উচ্চমাত্রার দারিদ্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অতি-নির্ভরশীলতার[৪৩] কারণে বাংলাদেশের ৭০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের দুঃসহ পরিস্থিতিতে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি দেশের ১৮ শতাংশ এলাকাকে জলমগ্ন করবে (ও পুরো মালদ্বীপ এলাকা)[৪৪]। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা (OECD) এবং বিশ্বব্যাংক-এর হিসাব মতে বাংলাদেশের বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তার ৪০ শতাংশ-ই হতে পারে জলবায়ু সংবেদনশীল বা ঝুঁকিমুখী।

বাংলাদেশ ১৯৯৪ সনে ক্লাইমেট কনভেনশন ও ২০০১ সনে কিয়োটো প্রটোকল অনুমোদন করেছে। শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার জন্য। আঞ্চলিকভাবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের উদ্বেগের বিষয়ে জোরালো ভূমিকা নিয়েছে দেশটি। এটা আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য দক্ষিণ-এশীয় সংস্থা (SAARC) কে ২০০৭ সনের ডিসেম্বরে জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষক ঘোষণা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। একটি সমন্বিত জাতীয় কাঠামো তৈরি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার জন্য সরকারের কৌশল বর্ণনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (BCCSAP) প্রণীত হয়। পরিকল্পনাটি ২০০৯ সনে হালনাগাদ করা হয়। এটা গড়ে উঠেছে ২০০৫ সনে প্রকাশিত অভিযোজনের জন্য জাতীয় কর্মসূচিকে (NAPA) ভিত্তি করে। জাতীয় দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন

[৪৩] জাতিসংঘ মানবিক উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৭/০৮

[৪৪] বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১০, বিশ্বব্যাংক

কৌশলপত্র, ২০০৯-১১ (NSAPR II)-তে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলোর জোরালো প্রতিফলন ঘটেছে। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাণ্ড নামে একটি তহবিল (৭০০ কোটি বাংলাদেশি টাকা, যা ১০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের সমান) গঠন করে সরকার। এ তহবিল থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলামূলক প্রকল্পে সরকারি সংস্থা, এনজিও এবং বেসরকারি খাতের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়।

সরকার ২০০৪ সনে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়-এর অধীনে জলবায়ু পরিবর্তন সেল প্রতিষ্ঠা করে। এর উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সক্ষমতা অর্জন। সচেতনতা সৃষ্টি, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনকে মূলধারায় আনতে স্থানীয় সরকার বিভাগ, কারিগরী সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে মোট ৬১টি ফোকাল পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের ওপর প্রভাব

এটা অসম্ভব নয় যে ক্রমাগত পরিবর্তনের বিষয়গুলো, যেমন: তাপমাত্রা বৃদ্ধি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও অধিকতর অননুমেয় আবহাওয়ার ধরণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরকে প্রভাবান্বিত করবে। এর মধ্যে অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যগত প্রভাব থাকবে অন্যতম (চিত্র ৩.৭ দেখুন)।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ঘটনাগুলো, বিশেষভাবে ঘূর্ণিঝড় ও ঝড় সৃষ্ট সামুদ্রিক জলোচ্ছাস বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত করবে (বক্স ৩.১৮)।

বক্স ৩.১৮ জলবায়ু পরিবর্তন বিভিন্ন উপায়ে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ বাড়াবে

- *উচ্চতর সমুদ্রতলের মাধ্যমে নদীসমূহে লবণাক্ততার/বিশুদ্ধ ওয়াটারফ্রন্ট এর সরাসরি অনুপ্রবেশ;*
- *উজান থেকে নদীর নিম্ন প্রবাহ, সমুদ্র থেকে অনুপ্রবেশের প্রভাব বৃদ্ধি;*
- *ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তরে লবণাক্ততা/বিশুদ্ধ পানির ইন্টারফেসে উর্ধ্বমুখী চাপ (স্থিতিশক্তি চাপ ভারসাম্যের কারণে সমুদ্রতল ১ সেন্টিমিটার বাড়লে ইন্টারফেস ৪০ গুণ বাড়বে);*
- *ভূ-পৃষ্ঠস্থ বর্ধিত লবণাক্ত পানি থেকে ভূ-গর্ভস্থ ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ;*
- *শীতকালে বর্ধমান বাষ্পীভবন হার বর্ধিত কৈশিক (ক্যাপিলারী) ক্রিয়া শুরু করবে; ও*
- *পরবর্তীতে উপকূলীয় মাটিতে লবণায়ণ।*

গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা বৃদ্ধি নগর এলাকায় খাবার ও গোসলের পানির চাহিদা বাড়াবে। একইসঙ্গে শীতলীকরণ ব্যবস্থার জন্য শিল্পকারখানায় পানির চাহিদাও বেড়ে যাবে। প্রতিযোগিতামূলক চাহিদার কারণে নগর এলাকায় গৃহস্থালী ও শিল্পকারখানায় পানি সরবরাহের মধ্যেকার চলমান টানাটানি/দ্বন্দ্বের প্রকোপ আরও বাড়তে পারে। গ্রাম এলাকার অবস্থা ভিন্ন হবে। সেখানে শুষ্ক মওসুমে নদী, আর্টেজীয় কূপ ও পুকুরের পানির লভ্যতা এবং গুণমানের অবনতি ঘটবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে কৃষিক্ষেত্র ও উদ্ভিদের উচ্চতর বাষ্পীভবন হার সেচের পানির চাহিদা বাড়াবে। ফলস্বরূপ, ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর নেমে যাওয়ার পরিমাণ অনেক বেশি হতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশেষ করে উপকূলীয় ও দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় খরা-প্রবণ এলাকায় নিরাপদ খাবার পানি ঘাটতির বিষয় জোরালোভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। লবণাক্ত পানির সীমারেখা ঠেলে দেশের আরও অভ্যন্তরে সম্প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ফলে বিস্তৃত এলাকায় ভবিষ্যতে দুঃসহ পানিসংকট দেখা দেবে। বর্তমানে যেসব মানুষ নিরাপদ পানি পাচ্ছে, তাঁরা সুবিধাটি আর বেশি দিন ভোগ করতে পারবে না। আরো ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় ও ঝড়-সৃষ্ট সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের কারণে অভ্যন্তরীণ ভূখণ্ডে প্রচুর পরিমাণে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং বিশুদ্ধ পানির পুকুরগুলোকে দূষিত করবে। এসব বিদ্যমান খাবার পানির উৎসগুলোকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

উদাহরণস্বরূপ: পুকুর ও কূয়া লবণাক্ত পানিতে প্লাবিত হতে পারে। এটা দুষিত করতে পারে হস্তচালিত নলকূপ ও পানির অন্যান্য উৎসকেও।

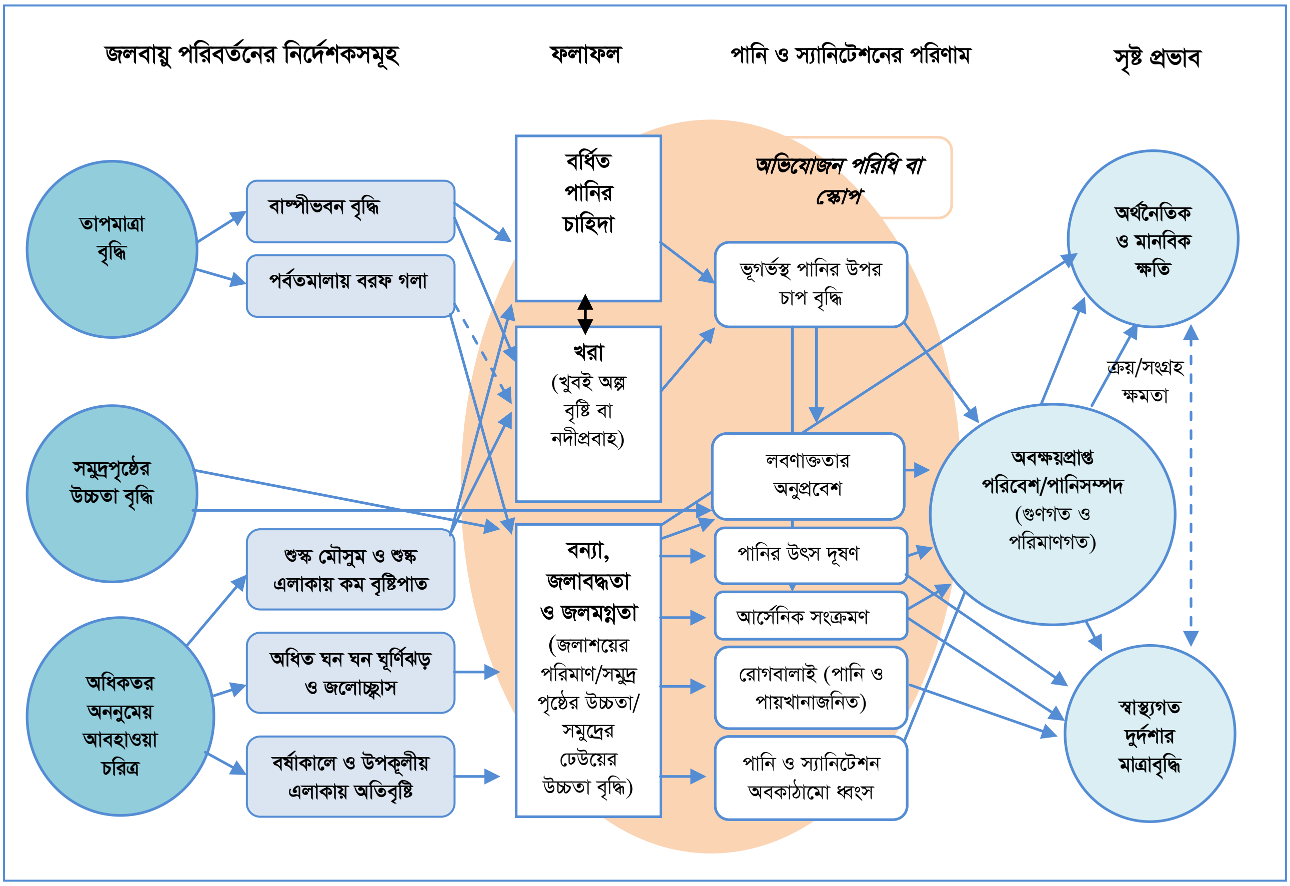

চিত্র ৩.৭ জলবায়ু পরিবর্তনের কার্যকারণ ডায়াগ্রাম: নির্দেশক, পানি ও স্যানিটেশনের পরিণাম এবং মানব জীবনের ওপর প্রভাব।
সূত্র: বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, পিএসইউ, জুলাই ২০০৯।

এরূপ সম্ভাবনাও আছে যে, দুষ্প্রাপ্যতা ও নিম্নমান শুষ্ক মওসুমে খাবার পানির বিদ্যমান সংকটকে আরও জোরালো করবে। এটা নিজ নিজ পরিবারের খাবার পানি সংগ্রহের দায়িত্বপ্রাপ্ত নারী ও শিশুদের কষ্ট বাড়াবে। বর্ধিতভাবে লবণাক্ত খাবার পানির ফলে বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্য-ঝুঁকি দেখা দিতে পারে। প্রতীয়মান হচ্ছে যে, জলবায়ু পরিবতনের বিরূপ প্রভাব পুরুষের চেয়ে নারীদের ওপর বেশি পড়বে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশে ২০০৯ সনে পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য একটি জলবায়ু ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণীত হয়। ডানিডার সহায়তায় স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর অধীন পিএসইউ কর্তৃক এটি প্রণীত হয়েছিল। এতে নীতি ও কৌশলসমূহ, উন্নত পদ্ধতি (যেমন: ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ডায়াগ্রাম বা নকশা) ও হাতিয়ারসমূহের (যেমন: বাছাই বা স্ক্রীনিং ও ঝুঁকি মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স) ব্যাপক মূল্যায়ন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে সেক্টরের সুসংবদ্ধ বাছাইয়ের জন্য এটা করা হয়। এতে বিভিন্ন প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত ও ভবিষ্যতে গৃহীতব্য কার্যক্রমও বিশ্লেষিত হয়েছে।

নিম্নবর্ণিত সমস্যা ও সুপারিশগুলোর বেশিরভাগই জলবায়ু ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা থেকে নেয়া:

- বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে খুব সীমিত সাড়া মিলছে। উদাহরণস্বরূপ, বন্যার কবল থেকে রক্ষার জন্য নলকূপ ও পায়খানার প্লাটফর্ম উঁচুকরণ;

- পানি ও স্যানিটেশন প্রকল্পের জন্য প্রণীত ভেটিং নির্দেশিকার (পিএসইউ, ২০১০) ব্যতিক্রম ছাড়া পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত কোন নীতি, কৌশল বা নির্দেশিকায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় উল্লিখিত বা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এটা একারণেই বিস্ময়জাগানিয়া নয় যে, অধিকাংশ দলিলই প্রণীত হয়েছে প্রায় এক দশক পূর্বে। তখন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জ্ঞান ও সচেতনতা তুলনামূলকভাবে অপ্রতুল ছিল। অধিকন্তু, তখন জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়সমূহ জাতীয় কর্মসূচিতেও পর্যাপ্তভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল না;
- যেহেতু ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও গর্ভস্থ, উভয় পানির উৎসই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি বহন করে, সেহেতু পানি নিয়ন্ত্রণ ও তৎসম্পর্কিত বিধানসমূহ বলবৎ করা জরুরি। কেবলমাত্র নিরাপদ পানির উপযোগী উৎসগুলো সংরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ হলেই ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহে সক্ষম হবে;
- অভিযোজন ও দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনের অনেক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে, কিন্তু সেগুলো ছিল বিচ্ছিন্ন। সেক্টরে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং অভিজ্ঞতা ও ভালো শিখনসমূহ বিনিময় করতে পারে এমন একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার। যদিও এটা অনুমিত যে, জলবায়ু পরিবর্তন কোষ চালু হবে ও এটিই এসকল কার্যক্রম সমন্বয় করবে। অথচ পানি ও স্যানিটেশন সেক্টর বিষয়ে এর ভূমিকা সীমিত; ও
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন স্থাপনার বিপদাপন্নতা বা নাজুকতার অর্থাৎ, যে মাত্রায় বর্তমানে স্থাপনার প্রসার হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর উপযোগিতা বা স্থায়িত্বশীলতা সম্পর্কে খুব কমই বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছে। অধিকতর জলবায়ু সহনশীল হতে পারে এমন নতুন ও উন্নত প্রযুক্তির পরীক্ষাও জরুরি।

৩.১০.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ভৌগলিক অবস্থান, ভূমির বৈশিষ্ট্য, নদীর বহুমাত্রিকতা ও মৌসুমী জলবায়ুর কারণে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঙ্গসংস্থানবিদ্যা (coastal morphology) এতদঞ্চলের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলাফলকে প্রভাবিত করে। বিশেষভাবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রাকৃতিক ঝুঁকি উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিকে বাড়িয়ে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে মন্থর করে দেয়। প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ - বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, ভূমিকম্প, নদীভাঙ্গন, অগ্নিকাণ্ড, অবকাঠামো ধ্বস, ভূ-গর্ভস্থ পানিতে উচ্চমাত্রার আর্সেনিক সংক্রমণ, জলাবদ্ধতা, মাটি ও পানিতে লবণাক্ততা, মহামারী ও বিভিন্ন ধরণের দূষণ - এসবই পুনঃপৌনিক ঘটনা (frequent occurrance)।

দুর্যোগের সংজ্ঞা

দুর্যোগ এমন একটি ঘটনা, যা প্রাকৃতিক বা মনুষ্য সৃষ্ট হতে পারে, আকস্মিক বা ক্রমবিকাশমানভাবে ঘটতে পারে। এটা সমাজের সচলতাকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করে এবং এমন ব্যাপকমাত্রায় মানবিক, বস্তুগত ও পরিবেশগত ক্ষতিসাধন করে যে, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে তা মোকাবিলায় ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। বিঘ্নতার পর্যায় এমন হয় যে, কেবলমাত্র নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে পরিস্থিতি সামলে ওঠা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব হয়না।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NPDM) ২০১০-এ একগুচ্ছ ব্যাপক-ভিত্তিক কৌশলের (a group of broad-based strategy) ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে ঝুঁকি ও দুর্যোগের ফলাফল ব্যবস্থাপনা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এর সাথে আরও যুক্ত থাকবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, জরুরি কার্যক্রম ও দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার তৎপরতা;
- জীবন ও সম্পদ সুরক্ষার প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হবে জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা হবে দুর্যোগ মোকাবিলা কৌশলের অপরিহার্য অংশ। দুর্যোগ প্রস্তুতি, জরুরি কার্যক্রম ও উদ্ধারের মূল চাবিকাঠি হবে স্বনির্ভরতা; এবং
- অ-কাঠামোগত প্রশমন কার্যক্রম, যেমনঃ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ, প্রচারণা বা এডভোকেসী ও জনসচেতনতাকে অবশ্যই উচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। এজন্য কাঠামোগত প্রশমনের সাথে ও অ-কাঠামোগত প্রশমন কার্যক্রমকে সমন্বিত বা একীভূত করা প্রয়োজন।

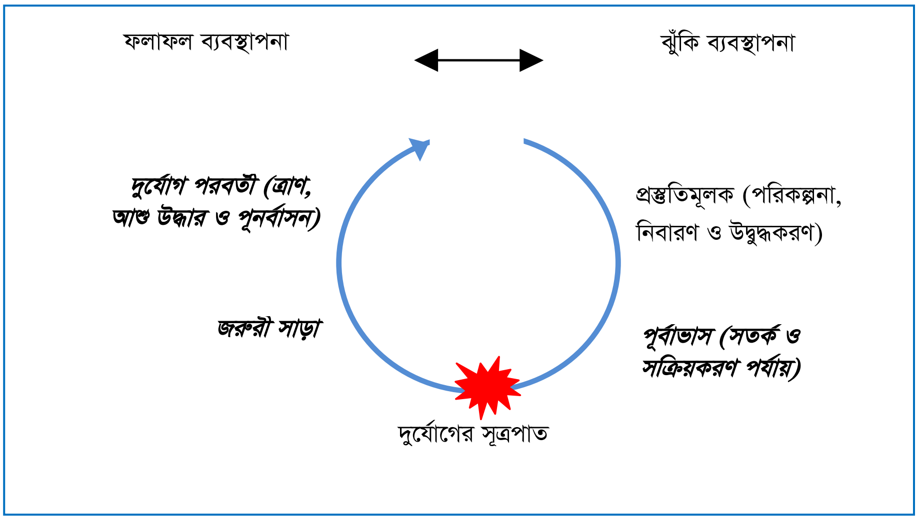

চিত্র ৩.৮: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র

চিত্র ৩.৮-তে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র প্রদর্শিত হয়েছে। এ চক্রে রয়েছে: দুর্যোগ প্রস্তুতি, পূর্বাভাস, জরুরি সাড়া বা কার্যক্রম ও দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার তৎপড়তা। দুর্যোগ থেকে অর্জিত শিখন দুর্যোগ-প্রস্তুতির কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় (MoFDM) কর্তৃক জারিকৃত দুর্যোগ সংক্রান্ত স্থায়ী নির্দেশাবলী (SOD) ২০১০ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আইনগত ভিত্তি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যকর পরিকল্পনা ও সমন্বয় এবং জরুরি কার্যক্রমসমূহ নিশ্চিত করতে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কতকগুলো পরস্পর-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে। বণ্টন করা হয়েছে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও কমিটির ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হলো খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের তিনটি সংস্থার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সম্পাদিত হয়, যেমন: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো (DMB), ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিদপ্তর (DRR) ও খাদ্য মহাপরিচালক। স্থানীয় সরকার বিভাগ, ডিপিএইচই ও ওয়াসাসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহ একে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে।

জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কমিটিসমূহ হলো: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC) ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (IMDMCC)। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কাউন্সিল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্টদের দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। অন্যদিকে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি MoFDM-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত। কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে দুযোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা এবং NDMC'র ও সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন। ইতোমধ্যে স্থায়ী নির্দেশাবলী সংশোধন ও খসড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এখন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়নের কাজ চলছে।

আঞ্চলিক পর্যায়ে জেলাসহ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে, যেমন: উপজেলা, ইউনিয়ন, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কার্যকর রয়েছে। এসব কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক প্রধানগণ।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

প্রতিবছর দেশের ব্যাপক অঞ্চল কম-বেশি তীব্রতায় বন্যাপ্লাবিত হয়ে থাকে। নলকূপ ও অন্যান্য পানির উৎসগুলো বন্যার পানিতে ডুবে যায় এবং দূষিত হয়। পায়খানাগুলো পানির তোড়ে প্রায়ই ভেসে যায়। নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও পয়ঃবর্জ্য অপসারণের স্থানের অভাবে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ অনুশীলন বাধাগ্রস্ত হয়। ঘূর্ণিঝড় ও ঝড়জনিত

জলোচ্ছ্বাস পানি ও স্যানিটেশন স্থাপনার একইরকম ক্ষতিসাধন করে থাকে। সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' ও 'আইলা' প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দুর্যোগের ঝুঁকির (vulnerability) দিক থেকে ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা (privacy) বজায় রাখতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের সম্মুখীন হয় নারী ও শিশুরা।

দুর্যোগ পরবর্তীকালে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ডিপিএইচই নলকূপ, স্থানান্তরযোগ্য (mobile) পানি পরিশোধন প্লান্ট ও স্যানিটেশন সুবিধাসমূহ স্থাপনের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বোতলজাত পানি ও পানি বিশুদ্ধকরণ বড়িও (ট্যাবলেট) বিতরণ করা হয়। জলমগ্নতা প্রতিরোধে এক টুকরো পাইপ লাগিয়ে উঁচু করা হয় হস্তচালিত নলকূপের মাথা। ডিপিএইচই, এনজিও ও অন্যান্য সরকারি সংস্থা বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু এসব কর্মসূচির পরিধি সীমিত। নগরাঞ্চলে ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ পানি সরবরাহ স্থাপনা রক্ষার ব্যবস্থা নেয় ও ট্যাংকারের মাধ্যমে পানি বিতরণ করে। কখনও কখনও তীব্র বন্যা রাস্তা-পার্শ্বস্থ ভূমিক্ষয়ের কারণ হয়। ফলে পাইপলাইন ও সহায়ক কাঠামো অনাবৃত হয়ে পড়ে। এর কারণে পাইপলাইন ভেঙ্গে যায়। এমনকি পাম্প-হাউজগুলো জলমগ্ন হয়ে পড়ে ও উৎপাদন নলকূপ বন্ধ হয়ে যায়। ২০০২ সনে বন্যার সময় অনেক পৌরসভায় এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো দুর্যোগের মাত্রা বৃদ্ধি, যখন শত-সহস্র মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরেকটি সমস্যা হলো অধিকাংশ কার্যক্রমই নেয়া হয় জরুরি অবস্থায় ও দুর্যোগ-পরবর্তী উদ্ধারকালে। ফলে সাড়া দিতে বিলম্ব ঘটে এবং স্থাপনা মেরামত ও ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য দরকারি খুচরা যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য সরবরাহ অপ্রতুল থাকে।

৩.১০.৫ পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্ম-নির্দেশনা

উপর্যুক্ত তিনটি বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ কর্ম-নির্দেশনা প্রথমে এবং তৎপরে বিষয়-সংশ্লিষ্ট কর্ম-নির্দেশনাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

সাধারণ

- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য উপযোগী নিয়ন্ত্রণবিধি প্রণয়ন ও সেগুলো বলবৎ করার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা। পানিখাতের নিয়ন্ত্রণবিধি যৌথভাবে অন্যান্য উপখাত যেমন: পানিসম্পদ ও কৃষির সাথে বাস্তবায়িত হবে;
- সেক্টর প্রতিষ্ঠানসমূহের সামর্থ্য বৃদ্ধি ও তাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন। প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট একটি তথ্য বিনিময় কেন্দ্র অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রশিক্ষণ, তথ্য সমাবেশ ও উৎকৃষ্ট অনুশীলন (best practice) বিনিময়ের জন্য বিদ্যমান একটি প্রতিষ্ঠান, যেমন ITN-BUET-কে নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে;
- সেক্টর সংস্থাসমূহ, যেমন ওয়াসা ও ডিপিএইচই'র অভ্যন্তরে বিশেষায়িত ইউনিট প্রতিষ্ঠা। ইউনিটের কাজ হবে পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো দেখা ও ঐসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য ও সহনশীলতা বৃদ্ধি; এবং
- জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু সহনশীল পানি ও স্যানিটেশন প্রযুক্তির ওপর গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম এবং পরীক্ষামূলক প্রকল্প (pilot project) গ্রহণ। এসব কার্যক্রম গ্রহণকালে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষজন, বিশেষ করে নারী, শিশু ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

পরিবেশ বিষয়ক

- পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ। এর উদ্দেশ্য হবে: খাবার পানির মানদণ্ড পুনঃপর্যালোচনা, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির বিস্তারিত মানদণ্ড অন্তর্ভুক্তি, উৎসভিত্তিক পানি নির্গমন মানদণ্ড সংশোধন ও শিল্পবর্জ্যের নিঃসরণ মানদণ্ডে তরলবর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট অন্তর্ভুক্ত করা। স্থানীয় সরকার বিভাগ উদ্যোগী হয়ে প্রস্তাবটি MoFE-তে প্রেরণ করতে পারে; এবং

- বিশেষভাবে বৃহৎ নগরীগুলোর আশপাশে পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ ও সমন্বয়সাধণ। আশা করা হচ্ছে, পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত প্রস্তাবিত সচিব কমিটি এতে নেতৃত্বের ভূমিকা নেবে (অধ্যায় ৭ দেখুন)।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

- সংশোধিত (updated) জাতীয় নীতিমালা ও কৌশলসমূহ এবং পুনঃপর্যালোচিত (revised) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে জলবায়ু পরিবতন অভিযোজনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা;
- সেক্টরের পরিকল্পিত বিনিয়োগ যাচাই ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কার্যক্রমে অর্থায়ন নিশ্চিতকরণে একটি কর্ম-কাঠামো প্রণয়ন করা। পরিবেশের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের অনেকগুলো স্থিতিমাপের আন্তঃসম্পর্কের কারণে কর্ম-কাঠামোটি স্বাভাবিক পরিবেশগত মূল্যায়নের (উদাহরণস্বরূপ, পরিবেশগত প্রভাব যাচাই) মধ্যেই নিহিত থাকতে পারে; এবং
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ, ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর ক্রমান্বয়ে নেমে যাওয়া, নদীর পানিপ্রবাহ কমে যাওয়া ও বৃষ্টিপাতের ধরণে পরিবর্তনকে নিয়মিত পরিবীক্ষণের জন্য একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করা। উদ্দেশ্য হবে, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনে সেবাসুবিধায় গৃহীতব্য সম্ভাব্য অভিযোজন পন্থা বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সাহায্য করা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক

- সেক্টর প্রতিষ্ঠানসমূহের (সরকার ও এনজিও) ভেতরেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা। ডিপিএইচই, ওয়াসাসমূহ ও এলজিইডি'র মত সরকারি সংস্থাগুলো রাজস্ব বাজেট থেকে একটি পৃথক বাজেটলাইন তৈরি অথবা উন্নয়ন বাজেট থেকে প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে;
- যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং দুর্যোগকালীন একটি স্ট্যাণ্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) যেমন: দ্রুত যাচাই ও কার্যক্রম গ্রহণ এবং কৌশলগত অবস্থানে খুচরা যন্ত্রাংশ মজুদ রাখার মাধ্যমে মাধ্যমে দুর্যোগ-প্রস্তুতি শক্তিশালী করা। ওয়াশ ইমারজেন্সি ক্লাস্টারকে[৪৫] সক্রিয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সকল স্টেকহোল্ডারের জন্য একটি আকস্মিক ঘটনা মোকাবিলার পরিকল্পনা (contingency plan) প্রণয়ন করতে হবে;
- দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগ-প্রতিরোধ ও জরুরি অবস্থায় স্থানীয় মানুষের ব্যবহারোপযোগী অন্ততঃপক্ষে কিছু পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন স্থাপনা নির্মাণ করা। ভবিষ্যতে স্কুল ও এ জাতীয় সকল জনগোষ্ঠীভিত্তিক স্থাপনাকে দুর্যোগ সহনশীল করে নির্মাণ করতে হবে। এগুলো নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধাসহ দুর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে;
- স্থানীয় কর্মীদেরকে অধিকতর কর্তৃত্ব অর্পণের মাধ্যমে সতর্কীকরণ ও জরুরি অবস্থায় প্রশাসনিক পদ্ধতি সহজতর করা। জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় ক্রয়বিধি নমনীয় করা। সতর্কীকরণকালে কর্মী, যানবাহন ও সরবরাহ উপকরণের সমাবেশ নিশ্চিত করতে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- কার্যকরভাবে সাড়াদান কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন, এনজিও এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় করা। সতর্কীকরণকালে নিশ্চিত করতে হবে যে, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মত কৌশলগত অবস্থানে পানি ও স্যানিটেশন সুবিধাসমূহ সচল আছে; এবং
- দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার এবং নারী ও শিশুদের বিশেষ চাহিদা বিবেচনায় রাখা।

[৪৫] এনজিওদের একটি নেটওয়ার্ক; যাদের পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন (WASH) সংক্রান্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কর্মপরিকল্পনা আছে। ডিপিএইচই ও ইউনিসেফ ওয়াশ জরুরি ক্লাস্টারের কো-চেয়ার। জাতীয় ও স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উদ্যোগকে সহায়তা দিতে ওয়াশ ক্লাস্টার সদস্যরা SOD ২০১০ অনুযায়ী নিজেদের প্রস্তুত রাখে।

৩.১১ গবেষণা ও উন্নয়ন

৩.১১.১ ভূমিকা

প্রাকৃতিক সম্পদ খাতসমূহের সুষম ও টেকসই উন্নয়নে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম (R&D) একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরে এটা তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা খাবার পানি সংস্থানের মাধ্যমে জীবনের জন্য অমূল্য অবদান রেখে চলেছে সেক্টরটি। এছাড়াও পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রমের ওপর যথাযথ ও সময়োচিত গবেষণা ও উন্নয়ন বহুবিধ খাত যেমনঃ কৃষি ও শিল্পখাত থেকে সীমিত পানি সরবরাহ (finite supply of water) এবং প্রতিযোগী চাহিদার (competing demand) মধ্যে একটি ভারসাম্যর তৈরির উপায় হতে পারে। স্যানিটেশন বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) নিরাপদ পানির টেকসই সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল। এটা জনকল্যাণে, বিশেষভাবে অস্বাস্থ্যকর আচরণ থেকে উদ্ভুত রোগ-সংবেদনশীল শিশু ও বয়োঃজ্যেষ্ঠদের জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় নিরাপদ খাবার পনি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা'র সুপারিশ হলো, "বিদ্যমান প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ধারাবাহিক গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।" বিষয়টিতে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে জাতীয় আর্সেনিক নিরসন নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় (NAMIP) ও জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্রে (NSS)। আঞ্চলিক পর্যায়েও এটি (R&D) উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। ২০০৯ সনের আগষ্ট মাসে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত স্যাকোসান[৪৬] সংক্রান্ত আন্তঃদেশীয় ওয়ার্কিং গ্রুপ-এর সভায় বাংলাদেশসহ সদস্য দেশগুলোকে ব্যয়-কার্যকর (cost effective) ও টেকসই স্যানিটেশন প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে আহবান জানানো হয়েছে। অধিকন্তু, জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব, সুনির্দিষ্টভাবে সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ, লভ্য পানিসম্পদের ওপর বর্ধিত চাপ ও অধিক ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটন মোকাবিলায় অভিযোজন প্রযুক্তি ও নিরসনমূলক পদ্ধতি উদ্ভাবনে আরও বেশি বেশি গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দাবি রাখে।

৩.১১.২ সংগঠন ও কার্যক্রম

নিচের অনুচ্ছেদে সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারি ও এনজিও সেক্টরের গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) বিষয়ক দায়িত্ব ও কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

ডিপিএইচইতে বর্তমানে গবেষণা ও উন্নয়নের দায়িত্ব R&D বিভাগ-এর ওপর ন্যস্ত। বিভাগটি বিকল্প প্রযুক্তিসমূহ, যেমনঃ পন্ড স্যান্ড ফিল্টার, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, আয়রণ ও ম্যাঙ্গানিজ অপসারণ প্লান্ট এবং ভূ-গর্ভস্থ নিম্ন পানিস্তর এলাকায় ডিপসেট পাম্পের কার্যকারিতা (পারফরমেন্স) উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এলজিইডি'রও একটি R&D অনুবিভাগ আছে। এটি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনে সেবা প্রদানে বেসরকারি খাতের উন্নয়ন, ব্যয়-পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া ও নগরাঞ্চলে বস্তিবাসীদের সেবা প্রদানকে কেন্দ্র করে গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ করছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-এর অধীন বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কেন্দ্র (BCSIR) আর্সেনিক নিরসন প্রযুক্তির প্রতিপাদন (verification) ও প্রত্যয়ন (certification) বিষয়ে গবেষণার কাজ করে। ওয়াসাসমূহে গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন শাখা বা বিভাগ নেই। সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের একটিতেও এজাতীয় কিছু নেই।

সুনির্দিষ্ট সমীক্ষা ও স্নাতকোত্তর গবেষণার আকারে অনেক সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পরিবেশগত বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ে কারিগরি গবেষণার কাজ করছে।

---

[৪৬] সাউথ-এশিয়ান কনফারেন্স অন স্যানিটেশন।

আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ নেটওয়ার্ক (ITN)[৪৭] পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে দক্ষতাবৃদ্ধির কাজ করছে এবং গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটি সামাজিক (উদাহরণস্বরূপ: জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, জেণ্ডার ও যোগাযোগ) ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, উভয় ক্ষেত্রেই গবেষণা চালাচ্ছে। আইটিএন-এর সাম্প্রতিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সেক্টর অংশীদারদের সহযোগিতায় পানি সংরক্ষণ ও পানির মান সার্ভিলেন্সের ওপর গবেষণা।

ব্র্যাক, ওয়াটার এইড, এনজিও ফোরাম ও দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র'র মত অল্প কিছু এনজিও প্রধানতঃ যোগাযোগ ও আচরণগত পরিবর্তন এবং জনগোষ্ঠীভিত্তিক পদ্ধতি উন্নয়নের ওপর সমীক্ষা পরিচালনা করে। তারা নাগরিক ক্রিয়াকলাপ, জনগোষ্ঠী-চালিত পানি ও স্যানিটেশন পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় দরিদ্রদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া-পদ্ধতি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চালায়।

৩.১১.৩ সমস্যা ও অন্তরায়সমূহ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে কিছু স্থায়ী (persistent) সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অতীব প্রয়োজন। ১৯৯০-এর গোড়ার দিকে নলকূপের পানিতে ব্যাপকমাত্রায় আর্সেনিক সংক্রমণ সনাক্ত হয়। অথচ এখনও তার বাস্তব কোন সমাধান পাওয়া যায়নি। অনেক নলকূপের পানিতে অতিরিক্ত মাত্রায় লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজের ক্ষতিকর উপস্থিতি পানির মান সংক্রান্ত আরেকটি সমস্যা। সেটার সমাধানেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। উপকূলীয় বলয়ের মত কিছু কিছু এলাকায়, যেখানে ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির উপযোগী কোন উৎসই নেই, সেখানে এখনও পানি সরবরাহ কভারেজ ঘাটতি বিদ্যমান। নগরাঞ্চলে লাগসই স্যানিটেশন প্রযুক্তির অনুপস্থিতি আরেকটি ব্যাপক আলোচিত সমস্যা। অন্যদিকে, অধিকতর কার্যকর লক্ষিত (targeted) স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার কার্যক্রম পরিকল্পনার জন্য আচরণগত পরিবর্তনের বিষয়গুলো আরো ভালভাবে আত্মস্থ করা দরকার। এ ছাড়াও দেশের বিস্তৃত অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাবার মত উদ্ভূত সমস্যা মোকাবিলার জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি (যেমন: ডিপ সেট পাম্প প্রযুক্তি) বা সৌর বিদ্যুত চালিত সাবমার্জিবল পাম্প প্রয়োজন।

ইতোমধ্যে অনিষ্পন্ন সমস্যাগুলোর সমাধানে অনেক উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু, ফলাফল মিশ্র প্রকৃতির। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো আর্সেনিক নিরসন প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য বহু গবেষণা কার্যক্রম চালিয়েছে। ল্যাবরেটরী পর্যায়ে পরীক্ষার আশাপ্রদ ফলাফল দেখা গেলেও মাঠে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেগুলো খুব সফল হয়নি। একইভাবে, প্রদর্শণী (demonstration) পর্যায়ে আয়রণ অপসারণ প্লান্ট (IRPs) সফল প্রমাণিত হলেও গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কাছে সেগুলো এখনও ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি। আবার পরীক্ষামূলক ও প্রদর্শণী পর্যায়ে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি ব্যাপক ব্যবহারের জন্য সম্ভাবনাময় মনে হলেও এসকল পদ্ধতির বাজারজাতকরণ এখনও সম্ভব হয়নি।

চিরাচরিতভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, গবেষণা ও উন্নয়ন প্রদর্শণী ও পরীক্ষামূলক বাস্তবায়নের পথ ধরে চলে এবং এরপর তা বাজার উন্নয়নের দিকে চালিত করে। তবে সেটা সবসময় ঘটে না। উদ্ভাবন একটি জটিল প্রক্রিয়া, যার জন্য সহায়ক সরকারি নীতিসহ অনুকূল উপযোগী পরিবেশ প্রয়োজন (বক্স ৩.১৯ দেখুন)।

বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের গবেষণা কার্যক্রম বিচ্ছিন্নভাবে সম্পাদিত ও কেবলমাত্র কিছু সংস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গবেষণা কৌশল ও পদ্ধতিতে দক্ষ কর্মীরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এসকল কাজে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার অভাব ও যন্ত্রপাতির দুষ্প্রাপ্যতাও অন্যতম সীমাবদ্ধতা। অধিকন্তু, কার্যকর সমন্বয় ও যথাযথ প্রচার-প্রচারণা সবসময় করা হয় না। সেক্টরকে এগিয়ে নিতে গবেষণা ও উন্নয়ন যথোচিত গুরুত্ব পায়না অথবা পেশাগত উপায়ে সেগুলো পরিচালনা করা যায় না। সমস্যাটি প্রতিফলিত হয় সরকারি সংস্থার নগণ্য বাজেট সংস্থান (negligible budget provision) এবং গবেষণা ও উন্নয়নের প্রতি নিম্ন অগ্রাধিকারের মধ্য দিয়ে। এ জাতীয় একটি উদাহরণ হলো যে, ডিপিএইচই'র নতুন সাংগঠনিক কাঠামোতে R&D বিভাগকে বাদ-ই দেয়া হয়েছে।

[৪৭] ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং নেটওয়ার্ক (আইটিএন) বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর একটি প্রকল্প ও এর দপ্তর বুয়েটেই অবস্থিত।

বক্স ৩.১৯ উদ্ভাবন একটি কৌশলী প্রক্রিয়া যা জটিল ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করে এমন নীতিসমূহ দ্বারা উন্নয়ন করা যায়

উপযোগী পরিবেশ: সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, শিক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংরক্ষণ, বাণিজ্য সমন্বিতকরণ, নিয়ন্ত্রণ ...

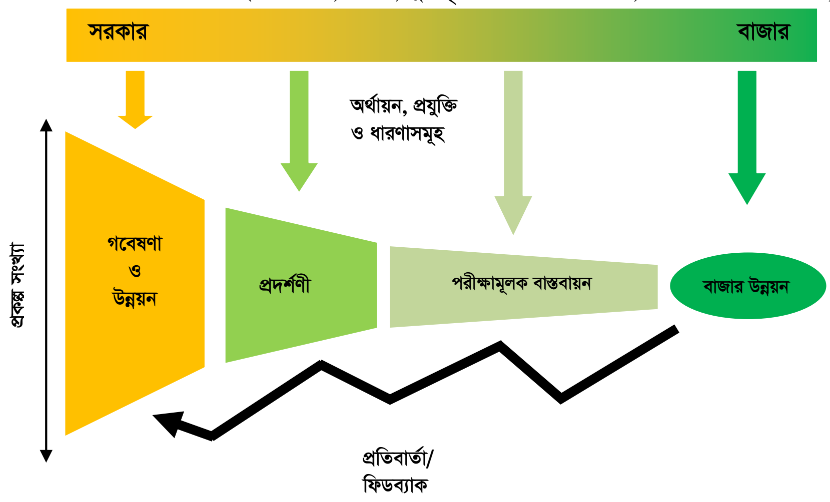

গতানুগতিকভাবে, উদ্ভাবনকে রৈখিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে মনে করা হয় উদ্ভাবন চারটি ধারাবাহিক স্তরে ঘটে থাকে:

- *R&D, নির্দিষ্ট কারিগরি সমস্যার সমাধান খোঁজা ও সেগুলো নতুন প্রযুক্তিতে প্রয়োগ করা;*
- *প্রতিপাদন প্রকল্প, পুনরায় প্রযুক্তিকে অভিযোজিত এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা প্রতিপাদন ও বাস্তব জগতে প্রয়োগ করা;*
- *বিস্তার, একবার মৌলিক কারিগরি প্রতিবন্ধকতা দুর হলে কোন প্রযুক্তির বাণিজ্যিক সম্ভাবনা দৃষ্টিগোচর হয়;*
- *প্রচার, যখন প্রযুক্তি বাজারে প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠে।*

বিস্তৃতি পর্যায়ে উৎপাদকদের অথবা প্রচারকালে খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তার কাছ থেকে প্রতিবার্তা চুইয়ে পুর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। এটা উদ্ভাবনের গতিকে সম্পূর্ণ পাল্টে নতুন, অপ্রত্যাশিত ধারণা ও পণ্যে এবং কখনো কখনো অভাবিত ব্যয়ের দিকে চালিত করে।

যাহোক, অভিজ্ঞতায় দেখা যায় উদ্ভাবন প্রক্রিয়া অনেক বেশি জটিল। কোন একটি বা অন্য যে কোন পর্যায়ে উদ্ভাবন প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে কিছু সংখ্যক আর্সেনিক নিরসন প্রযুক্তি ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা হয়েছে। এগুলো সরকার কর্তৃক প্রত্যয়িত ও প্রকল্পের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে প্রতিপাদিত। আশা করা হয়েছিল আর্সেনিক নিরসন প্রযুক্তির প্রবল চাহিদার কারণে সেগুলির ব্যাপক ব্যবহার বা প্রচারের জন্য বাজার স্বতঃস্ফূর্তভাবে উর্ধ্বমুখী হবে। সে যাই হোক, বাস্তবে অনেকগুলো কারণে এরূপ ঘটেনি। তার মধ্যে প্রতি এক বছর পর পর ফিল্টার মিডিয়া বদলানোর প্রয়োজনে কোন নির্ভরযোগ্য সরবরাহ ব্যবস্থার অভাব অন্যতম। সেগুলোর নিয়মিত পরিচালন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যাও ছিল। পরীক্ষা ও উন্নয়ন পর্যায়ে প্রাপ্ত মূল্যায়ন ও পরীক্ষার ফলাফল প্রচার করা হয়নি। অথচ এটা তাদের পণ্য উন্নয়নে সহায়ক হতে পারতো (আর্সেনিক অপসারণ প্রযুক্তির জন্য পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা সংক্রান্ত পরীক্ষামূলক প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ডেভকন ২০০৯। ডিপিএইচই ও কানাডিয়ান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার – CIDA – জন্য প্রস্তুতকৃত)।

অন্যদিকে, স্যানিটেশন উৎপাদকদের কাছ থেকে ক্রয়কৃত লক্ষ লক্ষ পায়খানা স্থাপনের মাধ্যমে দ্রুত স্যানিটেশন কভারেজ বৃদ্ধি R&D'র সফলতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ভর্তুকি দেয়ার মাধ্যমে ডিপিএইচই পায়খানার R&D, প্রতিপাদন ও বিস্তৃতির কার্যক্রম চালিয়েছে। ডিপিএইচই ও কিছু এনজিও পায়খানা নির্মাণে স্থানীয় মিস্ত্রী ও দোকানীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। সরকারের অনুকূল নীতিসমূহের সহায়তায় স্যানিটেশন উৎপাদকরা ডিপিএইচই'র উন্নয়ন প্রকল্পের সমান্তরালে পায়খানার ডিপিএইচই'র মডেলের প্রতিরূপ বাস্তবায়ন শুরু করেছিল। তারা সাধারণ মানুষের বহুমুখী চাহিদা মেটানোর জন্য অন্য বিকল্পও বাজারে এনেছিল। এভাবে, বেসরকারি স্যানিটেশন উৎপাদকরা সক্ষম হয়েছিল সরকার পরিচালিত স্যানিটেশন প্রচারণার দ্বারা সৃষ্ট বৃহৎ বাজারের চাহিদার সাথে সাড়া দিতে।

ফলে নীতিমালাসমূহ সমেত উপযোগী পরিবেশ, উদ্ভাবনের প্রত্যেকটি স্তরকে প্রভাবিত করে। সর্বদা এ রকম ঘটে না যে, কেবলমাত্র বেশি বেশি গবেষণা উপকরণ (Technology push) সরবরাহ ও বাজার চাহিদা (Market pull) সৃষ্টির দ্বারা উদ্ভাবন পরিচালিত হতে পারে। যখন উভয় ধরণের নীতিমালাসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তখন উদ্ভাবনের বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত কুশীলব (Actor) – ফার্ম, ভোক্তা, সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও অন্যান্যদের – মধ্যেকার বহু সংখ্যক মিথস্ক্রিয়ার অবদানকে স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন। কার্যকর নীতিসমূহ অবশ্যই উদ্ভাবনকে পুরো ব্যবস্থার অংশ হিসেবে গণ্য করে। একইসঙ্গে উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার সকল সমস্যার দিকসমূহকে উদ্দীপিত করার উপায়ও খোঁজে, বিশেষ করে যেখানে বাজার ঘাটতি বিরাজমান।

বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ২০১০, বিশ্বব্যাংক থেকে সংকলিত

৩.১১.৪ গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ে কর্ম-নির্দেশনা

গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদন ও সেগুলোর ফলাফল থেকে লাভ পাওয়ার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করতে হবে:

- R&D এবং তৎপরবর্তী প্রদর্শণী, পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন ও বাজার সৃষ্টির পর্যায়গুলোকে বিকশিত করতে নীতিমালা ও কৌশলসমূহের কার্যকর বাস্তবায়নসহ একটি উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশ (enabling environment) সৃষ্টি করা;
- পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সকল গবেষণা দলিল সংগ্রহ এবং সেগুলোর ফলাফল ও সুপারিশমালা সেক্টরের সকল সহযোগীদের মধ্যে বিনিময় বা ছড়িয়ে (dissemination) দেয়া;
- গবেষণার পরিধি বাড়ানো (বক্স ৩.২০)। বেশি বেশি কর্মকাণ্ড ও উচ্চতর বাজেট বরাদ্দসহ R&D কার্যক্রম কারিগরী সহায়তা ও উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;
- R&D কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন বৃদ্ধি ও উৎসাহীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে একটি নিবেদিত R&D তহবিল প্রতিষ্ঠা করা। সরকার, উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি খাত এ তহবিলে অর্থায়ন করতে পারে। এ তহবিল হতে সুনির্দিষ্ট বা উন্মুক্ত প্রস্তাবও আহবান করা যাবে। এটি গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সহযোগীদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। তহবিলটি পরিচালিত হবে একটি স্বাধীন পর্ষদ দ্বারা। অধিকতর পছন্দানুক্রমিকভাবে এটি BCSIR বা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে;
- গবেষণা ব্যবস্থাপনার সরলীকরণ। গবেষণার বিষয় চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকারক্রম তৈরি, কার্যকারিতার মূল্যায়ন ও ফলাফল প্রচার এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও আছে মৌলিক গবেষণার চাহিদা যাচাই, প্রায়োগিক ও সম্প্রসারণ গবেষণা;
- আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পেশাজীবীদের সমন্বয়ে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। গবেষণার উন্নততর ফলাফল পেতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর অংশরূপে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক R&D-কে অন্তর্ভুক্ত করা;
- গবেষণার ক্ষেত্রে মানবসম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। এর মধ্যে প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা কর্মসূচি, উপকরণ ব্যবস্থা ও যথাযথ টেস্টিং সুবিধা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও সমন্বয় অন্তর্ভুক্ত;
- ডিপিএইচই'র পূর্বের R&D বিভাগ বহাল রাখা এবং অধিকসংখ্যক কর্মী ও উচ্চতর বাজেট বরাদ্দসহ এর কর্মকাণ্ড আরও শক্তিশালী করা;
- বেসরকারি খাতের সঙ্গে গবেষণা ফলাফলের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা; এবং
- নিম্ন-উর্ধ্ব আনুভূমিক (bottom-up horizontal learning) শিখন প্রক্রিয়ার বিকাশসাধন, যা স্থানীয় উদ্ভাবনী অনুশীলনের প্রতিরূপ (replication) বাস্তবায়নের ভিত্তিতে তাত্ত্বিক ধারণা উদ্ভাবনে সহায়তা করে।

বক্স ৩.২০ অব্যাহত এবং নতুন গবেষণা ও উন্নয়নের প্রধান কিছু বিষয়সমূহ

পানি সরবরাহ

- *সঠিক স্থানে (ইনসিটু) আর্সেনিক অপসারণ ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আর্সেনিক টেস্ট কীটস্ উন্নয়নসহ আর্সেনিক অপসারণ প্রযুক্তিসমূহ;*
- *ভূ-গর্ভস্থ পানির কৃত্রিম পুনঃভরাট, বিশেষ করে ঢাকার আশপাশে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের প্রথম এ্যাক্যুয়াফারে (শ্যালো শ্রাউডেড টিউবওয়েলের জন্য);*
- *জনগোষ্ঠীভিত্তিক আয়রণ, ম্যাঙ্গানিজ ও লবণাক্ততা অপসারণ প্রযুক্তিসমূহ এবং খুব নিম্ন পানিস্তরের জন্য হস্তচালিত নলকূপ, ভূ–পৃষ্ঠস্থ পানি পরিশোধন প্রযুক্তিসমূহ ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ;*
- *যেখানে ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর অতিমাত্রায় নেমে যাচ্ছে এবং হস্তচালিত বা ম্যানুয়াল ডিপসেট পাম্প পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়ছে, সেখানে বিদ্যুত চালিত সাবমার্জিবল (ডোবানো) পাম্প ব্যবহার;*
- *গ্রামীণ পাইপবাহিত পানি সরবরাহ স্কীম ও পানির সংযোজক ব্যবহার।*

স্যানিটেশন

- *বাংলাদেশের নগর ও শহরসমূহের জন্য লাগসই স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা;*
- *বন্যাপ্রবণ, পানির উচ্চস্তর ও পাহাড়ি অঞ্চল, উচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ নগর বস্তিতে যথাযথ স্যানিটেশন এবং গ্রামাঞ্চলে উচ্চতর পর্যায়ের প্রযুক্তির জন্য স্যানিটেশন বিকল্প ও বিকেন্দ্রীকৃত বর্জ্যপানি পরিশোধন;*
- *অনসাইট স্যানিটেশন, আর্সেনিক ও অন্যান্য দূষকের কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানির দূষণ;*

***পরস্পর-সম্পর্কিত** (cross-cutting)*

- *প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য উপযোগী পানি ও স্যানিটেশন প্রযুক্তি;*
- *ইউনিয়ন পরিষদের অবকাঠামো পরিকল্পনা ও অর্থায়ন ব্যবস্থার মত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হস্তান্তর;*
- *জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, জেণ্ডার সমতা ও অর্থায়ন ব্যবস্থার মত পরস্পর-সম্পর্কিত (cross-cutting) বিষয়সমূহ;*
- *জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অভিযোজন প্রযুক্তিসমূহ;*
- *স্বাস্থ্যভ্যাস (হাইজিন), নিরাপদ পানি, পরিবেশগত স্যানিটেশন, যথাযথ পরিচালন ও সংরক্ষণে জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নতুন পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে বাজার গবেষণার জন্য IEC উপকরণের একটি সমন্বিত প্যাকেজ।*

৩.১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম

৩.১২.১ ভূমিকা

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এ তিনটি জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল (CHT) গঠিত। ইতিহাস-ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, নৃতাত্ত্বিক গঠন, সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয় ও জীবনাচারের দিক দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা থেকে ভিন্ন। মোট আয়তন ১৩,২৯৫ বর্গ-কিলোমিটার, যার পরিমাণ বাংলাদেশের মোট ভূখণ্ডের প্রায় ১০ শতাংশের সমান। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১১.৬ লক্ষের মত মানুষের বসবাস, যার প্রায় অর্ধেক সংখ্যালঘু নৃ-গোষ্ঠী। এরাও আবার ১৩টি প্রধান ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বায় বিভক্ত। এগুলো হলোঃ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চ্যঙ্গা, ম্রো, মুরং, লুসাই, খুমী, চাক, খ্যায়াঙ, ব্যোম, পাংখুয়া ও রেয়াঙ। এখানে ১১২টি ইউনিয়ন ও ৭টি পৌরসভা আছে। CHT এলাকার ভৌগলিক ও পানি ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা খুবই কঠিন। এ অঞ্চলকে ২টি বৃহত্তর বাস্তু-সংস্থান জোনে বিভক্ত করা যায়। যেমনঃ ক) পাহাড়ি এলাকা; ও ২) কৃষিজ সমতলভূমি।

৩.১২.২ প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো

বাংলাদেশের অবশিষ্ট এলাকার তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে একটি ঐতিহ্যবাহী উপজাতীয় প্রশাসনিক কাঠামো (চাকমা, বোমাং ও মং রাজ বা সার্কেল) বিদ্যমান। ১৯৯৭ সনে সম্পাদিত

শান্তিচুক্তির ভিত্তিতে জাতীয় সরকারি কাঠামো (জেলায় জেলা প্রশাসক, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা) ছাড়াও প্রশাসনিক ও উন্নয়ন বিষয়ের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ (RC) ও ৩টি পার্বত্য জেলা পরিষদ (HDCs) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তির বিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পৃথক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। CHT RC I HDCs এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে। HDCs প্রতিষ্ঠার পর হস্তান্তরিত বিষয় (transferred subjects) হিসেবে ডিপিএইচইসহ ১৮টি সরকারি বিভাগ ও সংস্থা এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ধরণ, বিশেষ করে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেন সেবা প্রদানের জন্য বেশ জটিল। স্থানীয় সরকার বিভাগ সেক্টর পরিকল্পনা, বাজেট প্রণয়ন ও বরাদ্দ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে। অন্যদিকে ডিপিএইচই স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন কাজ করে থাকে। CHT'র জেলা পর্যায়ের ডিপিএইচই'র নির্বাহী প্রকৌশলী HDCs'র সরাসরি তত্ত্বাবধানে কাজ করেন। অথচ তাঁদের কর্মকাণ্ড ও কর্মসূচি সমন্বয় করেন CHT সার্কেল-এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চট্টগ্রামে অবস্থিত)। একটি বিষয় প্রায়ই উত্থাপিত হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা ও বাজেটে বিশেষ করে স্থানীয় জাতিগোষ্ঠীর মতামত প্রতিফলিত হয় না। CHTতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা নিয়েও দ্ব্যর্থকতা রয়েছে।

৩.১২.৩ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবস্থা

পানি সরবরাহ

দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রামে পানি সরবরাহ কভারেজ অনেক কম (জেএমপি সংজ্ঞা অনুযায়ী - MICS প্রতিবেদন, ২০০৯ - জাতীয় কভারেজ ৮৫.৫ ভাগের তুলনায় সেখানকার মাত্র ৫৯ ভাগ পরিবারের উন্নত খাবার পানির উৎসে অভিগম্যতা রয়েছে)। খাগড়াছড়িতে এ হার সর্বোচ্চ (৭৬ ভাগ), তারপরেই আছে বান্দরবান (৪৮ ভাগ) ও রাঙ্গামাটি (৪৭ ভাগ)। মোট পরিবারের প্রায় ৪৬ ভাগের রয়েছে প্রাথমিক/নিজস্ব মালিকানার খাবার পানির উৎস। ১৩ ভাগ পরিবার বিকল্প/যৌথ উৎস হতে সংগৃহীত খাবার পানি ব্যবহার করে। শুষ্ক মওসুমে পানি দুষ্প্রাপ্য হয়, তখন খাবার পানির জন্য ছড়া (পানি প্রবাহের স্থানীয় নাম) প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যাহোক, পরিবেশগত অবনতি ও বর্ধমান বসতির কারণে অনেক ছড়ার পানির মান প্রতিনিয়ত খারাপ হচ্ছে।

সম্প্রতি ওয়াটার এইড বাংলাদেশ, পার্বত্য চট্টগ্রামে[৪৮] পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা বিষয়ে একটি শুমারি (census) পরিচালনা করেছে। শুমারি মতে, মানুষকে অনেক দূর হতে পানি সংগ্রহ করতে হয়। এটা একটা বাড়তি ঝামেলা। পাহাড়ি এলাকার বিশেষ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে দুর্গম পথ বেয়ে পানি সংগ্রহ, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য অসুধিাজনক। পানির উৎস ও পরিবারগুলোর[৪৯] মধ্যেকার ৫০ মিটারের দূরত্বের নির্ণায়ককে বিবেচনায় নেয়া হলে দেখা যায়, মোট পরিবারের প্রায় ৬৬ ভাগকে দূরবর্তী উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয়। বান্দরবান জেলায় প্রায় ৭৪ ভাগ পরিবার খাবার পানির উৎস হতে ৫০ মিটারেরও বেশি দূরত্বে বসবাস করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পানি-ভূতাত্ত্বিক অবস্থা আরও জটিল। সেখানে সারাবছরব্যাপী ব্যবহার করা যাবে এমন ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর বা নিকটস্থ জলপ্রবাহ খুঁজে পাওয়া সবসময় সম্ভব হয়না। এলাকাটিতে বিভিন্ন ধরণের পানি সরবরাহ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেগুলোর মধ্যে নলকূপ প্রযুক্তিই প্রধান। হস্তচালিত নলকূপ ব্যতীত অন্যান্য বিকল্প প্রযুক্তি, যেমন: পাত-কুয়া (ring wells), কূয়া (dug-wells), গ্রাভিটি ফ্লো সিস্টেম, ইনফিল্ট্রেশন গ্যালারি ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ প্রযুক্তিগুলো সেখানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

নিচের সারণি ৩.৯-এ তিন পার্বত্য জেলায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হলো। তিন জেলার মধ্যে খাগড়াছড়িতে প্রায় ৮৬ ভাগ অগভীর নলকূপ রয়েছে। অন্য দুটি জেলায় প্রায়শঃ অধিকতর বিকল্প প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

---

[৪৮] স্টেট অব ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস: এ সেন্সাস রিপোর্ট বাই ওয়াটার এইড, মার্চ ২০১০।

[৪৯] বাংলাদেশ সরকারের দরিদ্র-সহায়ক স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০০৫ অনুযায়ী, বাড়ি থেকে পানির উৎসের ৫০ মিটার দুরত্বকে সুপারিশকৃত ন্যূনতম দুরত্ব বিবেচনা করা হয়, যেটি ওয়াটার এইডও অনুসরণ করে।

সারণি ৩.৯ পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের পানি সরবরাহ প্রযুক্তি (শতকরা)

প্রযুক্তির ধরণ	বান্দরবান	খাগড়াছড়ি	রাঙ্গামাটি	মোট
গভীর নলকূপ	২৭.৭	১১.৬	৩৫.১	১৮.৩
অগভীর নলকূপ	১৬.১	৮৫.৭	২৩.৭	৬৬.৩
রিং ওয়েল (পাত কূয়া)	৪৮.৩	২.৫	৩৬.১	১৩.৫
পাইপবাহিত পানি সরবরাহ	১.১	-	০.২	০.১
তারা ডেভ	২.০	০.১	২.৭	০.৯
ডাগ ওয়েল (কূয়া)	০.৮	-	০.১	০.১
গ্রাভিটি ফ্লো সিস্টেম	২.৪	-	০.৩	০.২
গ্রাভিটি ফ্লো সিস্টেম/বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	-	-	০.১	-
বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি	-	-	০.১	-
ইনফিল্ট্রেশন গ্যালারি	১.২	-	০.১	০.৩
ইনফিল্ট্রেশন ওয়েল	-	-	০.৫	০.১
ওয়াটার ফল বা ঝরণা	০.৪	-	-	-
অন্যান্য	-	-	০.১	-
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

স্যানিটেশন

ওয়াটার এইড বাংলাদেশের শুমারি (census) ২০১০ মতে, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রায় ৭৪ শতাংশ পরিবারের নিজস্ব পায়খানা আছে। অন্যদিকে ১.৩ শতাংশ পরিবার যৌথ এবং ০.০২ শতাংশ পরিবার কমিউনিটি পায়খানা ব্যবহার করে। বাকী ২৫ শতাংশ পরিবার উন্মুক্ত বা খোলা জায়গায় মলত্যাগ করে।

JMP প্রদত্ত সংজ্ঞা মতে, পায়খানাগুলোকে উন্নত ও অনুন্নত এ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। তৎপ্রেক্ষিতে সারণি ৩.১০-এ পায়খানার অবস্থা উপস্থাপন করা হয়েছে। পানি সরবরাহের মত পার্বত্য চট্রগ্রামে স্যানিটেশন কভারেজও কম। ওয়াটার এইড সম্পাদিত শুমারি অনুযায়ী, মাত্র ২৮.৬ শতাংশ পরিবার উন্নত পায়খানা ব্যবহার করে। অথচ MICS ২০০৯-এর জরিপে দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে পায়খানার কভারেজ ৩৩ থেকে ৪৮ শতাংশ হতে পারে (বান্দরবানে ৩৩ শতাংশ, খাগড়াছড়িতে ৪৩ শতাংশ ও রাঙ্গামাটিতে ৪৮ শতাংশ)।

সারণি ৩.১০ পরিবারসমূহ কর্তৃক ব্যবহৃত উন্নত পায়খানার পর্যায় (শতকরা হার)

অবস্থা/পর্যায়	পায়খানার ধরণ	বান্দরবান	খাগড়াছড়ি	রাঙ্গামাটি	মোট
উন্নত স্যানিটেশন	লিডসহ গর্ত পায়খানা	৫.৭	১.৪	৫.৪	৪.০
	স্ল্যাব ও পানি রোধকসহ গর্ত পায়খানা	৭.৮	৩.৭	৫.৩	৫.২
	স্ল্যাবসহ ও পানি রোধক ব্যতীত/ভাঙ্গা গর্ত পায়খানা	৫.৮	১০.৮	৪.৭	৭.৪
	ভেন্ট পাইপ ও পানি/বেন্ড রোধকসহ অফসেট গর্ত পায়খানা	৫.২	৯.১	১৩.৫	১০.০
	ভেন্ট পাইপসহ ও পানি/বেন্ডরোধক ব্যতীত অফসেট গর্ত পায়খানা	০.২	০.০	০.৭	০.৩
	ভেন্টপাইপ ব্যতীত ও পানি রোধকসহ অফসেট গর্ত পায়খানা	০.২	০.০	০.১	০.১
	ভেন্টপাইপ ব্যতীত ও বেন্ড রোধকসহ অফসেট গর্ত পায়খানা	০.১	০.১	০.০	০.০
	ভেন্টপাইপ ও পানি/বেন্ড রোধক ব্যতীত অফসেট গর্ত পায়খানা	০.০	০.২	০.০	০.১

	সেপটিক ট্যাংকসহ পায়খানা	১.৪	১.২	১.৮	১.৫
	উপ-মোট	২৬.৪	২৬.৯	৩১.৬	২৮.৬
অনুন্নত স্যানিটেশন	লিড ব্যতীত গর্ত পায়খানা, ঝুলন্ত/উন্মুক্ত পায়খানা, উন্মুক্ত মলত্যাগ, যৌথ পায়খানা, কমিউনিটি পায়খানা ও অন্যান্য	৭৩.৬	৭৩.১	৬৮.৪	৭১.৪
মোট		১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

পার্বত্য চট্টগ্রামে স্যানিটেশন ব্যবস্থার অধিকাংশই গড়ে উঠেছে স্থানীয়/দেশীয় পদ্ধতির ভিত্তিতে, যেমনঃ মাচং (ঝুলন্ত ধরণের পায়খানার স্থানীয় পরিভাষা)। এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামের বেশিরভাগ এলাকায় উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের অভ্যাস ব্যাপক। দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সামাজিক অভ্যাসের কারণে এখানে প্রচলিত স্যানিটেশন প্রযুক্তি স্থাপন খুবই জটিল। জুম চাষ (পাহাড়ের ঢালে চাষাবাদ) করতে বছরের উল্লেখযোগ্য সময় পাহাড়ের বিরাট-সংখ্যক মানুষ নিজেদের গ্রাম ত্যাগ করে। অস্থায়ী এ অভিবাসীরা যথাযথ স্যানিটেশন সুবিধা তৈরি করে না। আশপাশের জনবসতিতে পানিবাহিত রোগ ছড়ানোর ঝুঁকির এটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

স্বাস্থ্যসম্মত (hygienic) **আচরণ**

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস পালন একেবারেই কম। অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র এবং কৃষি ও বনজ সম্পদকে ভিত্তি করে তাঁদের জীবন-জীবিকা গড়ে উঠেছে। অনেক নৃ-গোষ্ঠিতে, বিশেষভাবে বান্দরবান জেলায় সচরাচর মানুষ ও প্রাণী (পশু-পাখি) খুব ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করে। দেখা যায়, প্রাণীদের মল-মূত্র সন্নিকটবর্তী প্রতিবেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। এখানে মলত্যাগের জন্য পায়খানার ব্যবহারে ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। তরুণ শিশুরা পায়খানা ব্যবহার করবে - এটা আশাই করা যায় না। তাদের মল-মূত্র দূষণের কারণ হতে পারে - তা ভাবাই হয় না। MICS ২০০৯-এর সমীক্ষা নির্দেশ করে যে, প্রায় ৬০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মলত্যাগের জন্য কোন না কোন ধরণের পায়খানা ব্যবহার করে। পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় ৯৭ শতাংশ শিশু মলত্যাগ করে খোলা জায়গায়। নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস অনুশীলন করে, বিশেষভাবে মল ত্যাগের পর পানি ও সাবান দিয়ে হাত ধোয় - এমন মানুষের সংখ্যা রাঙ্গামাটিতে প্রায় ৬৪ শতাংশ। এ সংখ্যা খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে যথাক্রমে প্রায় ৫৫ ও ৫৭ শতাংশ। পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধারণ ধরণের সর্বাধিক পায়খানা বাঁশ বা খাগড়ার উপরিকাঠামোসহ জমাটবাধা মাটির পাটাতন বা কংক্রিট স্ল্যাব (পানিরোধক ব্যতীত) দিয়ে তৈরি হয়। বার্তা যোগাযোগের ক্ষেত্রে এখানে ভাষাও অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, কিছু নৃ-জনগোষ্ঠী বাংলা ভাষা জানে না। ফলে বেতার বা টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত জাতীয় স্যানিটেশন প্রচারাভিযান কার্যক্রম থেকে তারা কার্যত বিচ্ছিন্নই থেকে যায়।

৩.১২.৪ সমস্যা ও কর্ম-নির্দেশনা

পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে একটি কার্যপত্র (নম্বর ২) প্রণীত হয়েছে। SDP প্রণয়নকালে পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ায় তৃণমূল পর্যায়ের উপকারভোগী, পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ, ডিপিএইচইসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ ও কারবারির মত স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী নেতৃবৃন্দকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। CHT সহযোগীদের সমন্বয়ে আয়োজিত হয় একটি আঞ্চলিক কর্মশালা। কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত এমন সব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা করা, প্রতিনিয়ত যেগুলোর মুখোমুখি হতে হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীকে। SDP'র জন্য স্থানীয় জনগণের মতামত ও প্রতিবার্তা সংগ্রহ করাও ছিল কর্মশালার অন্যতম উদ্দেশ্য। পরামর্শের ভিত্তিতে চিহ্নিত পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ও এতদসংক্রান্ত কর্ম-নির্দেশনাসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলোঃ

১. **বৈচিত্র্যের স্বীকৃতিঃ** উন্নয়ন কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও যোগাযোগের বৈচিত্র্যকে বিশেষভাবে বিবেচনায় নিতে হবে। জাতীয় নীতিমালা ও কৌশলপত্রসমূহে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে পৃথক অনুচ্ছেদ রাখা হবে;

২. **বাস্তবায়ন ব্যবস্থা:** পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ, ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ও ডিপিএইচইসহ স্থানীয় সরকার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে বণ্টন করা প্রয়োজন। নীতিগতভাবে আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব হবে কর্মসূচি/প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা। যাহোক, হস্তান্তরিত বিষয় হিসেবে ডিপিএইচই'র সহায়তা নিয়ে কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা বর্তমানে আঞ্চলিক পরিষদের আছে। তাই আঞ্চলিক পরিষদের সক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ডিপিএইচই কর্তৃক প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের চলমান দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে পরিষদের কাছে হস্তান্তর করবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ (PSU'র কারিগরী সহায়তা নিয়ে) পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে নিবিড় পরামর্শের মাধ্যমে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি নির্ধারণ করবে;

৩. **স্থানীয় পরিকল্পনা ও সমন্বয়:** স্থানীয় জনগোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, যেমন: পাড়া উন্নয়ন কমিটি, ওয়াটসান কমিটি ও ঐতিহ্যবাহী নেতাদের সাথে পরামর্শ করে অবস্থান-নির্দিষ্ট পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পরিকল্পনা ও উন্নয়নের পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রম সমন্বয় জোরদার করতে হবে। বর্তমানে ডিপিএইচই একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ভবিষ্যত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করছে। বসতির পরিবর্তিত অবস্থা ও এলাকার উন্নয়নের সাথে মানানসই করার জন্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর মাস্টার প্ল্যানটি পর্যালোচনা করার প্রয়োজন হবে;

৪. **প্রযুক্তি নির্বাচন:** পানি সরবরাহের (উদাহরণস্বরূপ, ঝরণা উন্নয়ন ও গ্রাভিটি ফ্লো সিস্টেম) বিকল্প কারিগরী সমাধানের প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। একইসাথে গুণসম্পন্ন হার্ডওয়্যার সরঞ্জামের (পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, উভয়েরই জন্য) সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। পাহাড়ি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও পানি সংগ্রহে অসুবিধাসমূহ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যথাযথ স্যানিটেশন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে, যাতে পানি কম লাগে ও স্থানীয় সম্পদ (পায়খানার গর্তে বাঁশের বেড়া) ব্যবহার করা যায়। যথাযথ প্রযুক্তি নির্বাচনের সময় স্থানীয় সাংস্কৃতিক চাহিদা, যোগাযোগ অসুবিধা ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক বৈচিত্র্যসমূহ বিবেচনা করতে হবে;

৫. **সেবার মান:** পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার যথাযথ মানদণ্ড প্রণয়ন করা। যেমন: ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বসতির ধরণ ও পাহাড়ি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে পানি সংগ্রহের অসুবিধা বিবেচনায় নিয়ে পানি প্রযুক্তি-প্রতি জনসংখ্যা। উদাহরণস্বরূপ, পার্বত্য চট্টগ্রামে পানির উৎস-প্রতি ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২৫ হতে পারে। অর্থাৎ, জাতীয় পর্যায়ে সুপারিশকৃত ব্যবহারকারীর সংখ্যার অর্ধেক;

৬. **স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার:** বান্দরবান জেলার খুবই নিম্ন স্বাস্থ্যাভ্যাসের পটভূমিতে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব প্রদান। আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ কর্মসূচি স্থানীয় প্রেক্ষিত বিবেচনায় গ্রহণ করতে হবে;

৭. **গবেষণা ও উন্নয়ন:** পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং যোগাযোগ অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে লাগসই পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রযুক্তি উন্নয়নে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;

৮. **দূষণ নিয়ন্ত্রণ:** জলাশয়, বিশেষ করে রাঙ্গামাটির কাপ্তাই লেক-এর পরিবেশগত দূষণ নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

৯. **বহু-খাত উন্নয়ন পদ্ধতি:** পানির উৎসের জন্য পরিকল্পনাকালে বহু-খাত উন্নয়ন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা। যেমন: খাগড়াছড়ি ও অন্যান্য উপযোগী স্থানে ক্ষুদ্রাকার বাঁধ নির্মাণ পানি সরবরাহের পাশাপাশি পর্যটন, মৎসক্ষেত্র ও সেচের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

অধ্যায় ৪

আইন, নীতিমালা ও কৌশলপত্রসমূহ

প্রথম অধ্যায়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের বিদ্যমান আইনি কাঠামো, নীতিমালা ও কৌশলপত্রসমূহ সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের কার্যকর পরিচালনায়, বিশেষ করে এসডিপি'র লক্ষ্য অর্জনে এসব বিষয়গুলোকে তাদের যথার্থতার দৃষ্টিকোণ থেকে আরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নতুন আইন, নীতিমালা ও কৌশলপত্রসমূহ প্রণয়ন এবং বিদ্যমানগুলোর সংশোধনের ক্ষেত্রও চিহ্নিত করা হয়েছে। তদানুযায়ী সেসব প্রতিফলিত হয়েছে সেক্টর উন্নয়ন কর্ম-কাঠামোতে।

৪.১ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য আইনি কাঠামো

আইন, অধ্যাদেশ ও অন্যান্য আইনি দলিলসমূহ বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের বিদ্যমান আইনি কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। এগুলোতে বিভিন্ন সেক্টর প্রতিষ্ঠানের কাজ ও দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট আছে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও অধ্যাদেশসমূহের একটি তালিকা সারণি ৪.১-এ উপস্থাপিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহ আইন ও অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন বিধি, প্রবিধান, বাই-লজ ও নির্বাহী আদেশ প্রণয়ন করে। ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত বিভিন্ন বিধি ও প্রবিধানমালা এবং পৌরসভা পানি সরবরাহ মডেল বাই-ল'জ ১৯৯৬ এর উদাহরণ।

বিদ্যমান আইনি কাঠামোর[৫০] পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয় যে:

- সেক্টর সংস্থাসমূহের ভূমিকা ও দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে অধিক্রমন (overlapping) রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: ডিপিএইচই ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (অর্থাৎ, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা) মধ্যে। তাই এলজিডি কর্তৃক বিধি ও প্রবিধান সংশোধন এবং নির্বাহী আদেশ জারির মাধ্যমে স্পষ্টতা ও কার্যকারীতা প্রতিষ্ঠা আবশ্যক;

- এলজিডি'র অধীনস্থ দু'টি লাইন এজেন্সি ডিপিএইচই ও এলজিইডি'র মধ্যেকার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত ভূমিকা ও দায়-দায়িত্বসমূহের অধিকতর ব্যাখ্যা প্রদান ও সহজীকরণ করা দরকার; এবং

- বিদ্যমান স্থানীয় সরকার আইন, ২০০৯ যথাযথ বলবৎ করার এবং এতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও কর্তৃত্ব অর্পণের বিধান রাখার চাহিদা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এলজিডি'র পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হওয়ায় সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলো নিজেরা কর্মী নিয়োগ করতে পারে না। তাছাড়াও পানি সরবরাহের জন্য জলাশয়গুলোর সীমারেখা চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে এলজিডি কর্তৃক সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোকে আরও কর্তৃত্ব প্রদান জরুরি। একইসঙ্গে স্থানীয় জলাশয়গুলোতে পর্যাপ্ত পানি সংগ্রহের নিমিত্তে পৃথক জলাশয় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠাসহ পানি সরবরাহ ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য যথাযথ কর্তৃত্ব অর্পণ প্রয়োজন।

[৫০] UPI (বর্তমানে PSU) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতের প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা, ১৯৯৪ এবং ঢাকা ওয়াসা ও পৌরসভা পানি সরবরাহ শাখা সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদন, ২০০৯ (এডিবি'র ঢাকা ওয়াসার জন্য ব্যবস্থাপনা সহায়তা)।

সারণি ৪.১ পানি ও স্যানিটেশন সেক্টর নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন, অধ্যাদেশ ও অন্যান্য আইনি দলিলপত্র

আইন, অধ্যাদেশ ও অন্যান্য আইনি দলিলপত্র	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সরকারি কার্য বিধিমালা	এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি বিভাগের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। এটি ডিপিএইচইকে গ্রামীণ ও পৌরসভা ঘোষিত হয়নি এমন নগরাঞ্চলে পানি ও স্যানিটেশন সেবাপ্রদানের দায়িত্ব দিয়েছে।
স্থানীয় সরকার আইনসমূহ: - স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ - স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ - উপজেলা পরিষদ আইন, ২০০৯ - ইউনিয়ন পরিষদ আইন, ২০০৯	আইনগুলো বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকারের পানি ও স্যানিটেশন সেবাসহ অন্যান্য দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করেছে। পানি ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত দায়িত্বসমূহ হলো: পানি সরবরাহ ও সংরক্ষণ, স্যানিটেশন ও বর্জ্য নিষ্কাশন এবং পানির উৎসের দূষণ প্রতিরোধ।
ওয়াসা আইন, ১৯৯৬	এতে বাংলাদেশের যে কোন জায়গায় ওয়াসা প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা সরকারকে দেয়া হয়েছে। আইনে ওয়াসাকে পানি সরবরাহ সম্পর্কিত কাজ, তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও পানি নিষ্কাশন ইত্যাদি সম্পাদনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ওয়াসা বোর্ডের গঠন এবং বোর্ড ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মধ্যে দায়িত্বের বণ্টনও আইনে বিশদভাবে উল্লেখ আছে। বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে ওয়াসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭	পরিবেশ আইনের অনুবৃত্তিক্রমে প্রণীত হয়েছে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭। বিধিমালায় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠার এবং পানির গুণ মানসহ পরিবেশের গুণগত মান নির্ধারণের ব্যবস্থা রয়েছে।
জনস্বাস্থ্য ও হাইজিন সম্পর্কিত আইন ও অধ্যাদেশসমূহ: - দন্ডবিধি, ১৮৬০ - জনস্বাস্থ্য (জরুরি বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৪৪ - বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৬ - কারখানা আইন, ১৯৬৫	বিভিন্ন আইনি দলিলে জনস্বাস্থ্যজনিত উদ্বেগের বিষয়গুলোতে আলোকপাত করা হয়েছে এবং স্থানীয়ভাবে সেগুলো স্থানীয় সরকার সত্তাসমূহের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত।

কিছু আইন ও দলিল বর্তমান সময়ের চাহিদা পূরণের জন্য সংশোধন প্রয়োজন। উদাহরণ হিসেবে ওয়াসা আইন, ১৯৯৬ মতে ওয়াসাসমূহকে কোন অর্থবছরে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে পানির শুল্ক বার্ষিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধির ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এর বেশি শুল্ক বাড়াতে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন নিতে হবে। বর্ধিত ব্যয় মেটানো ও কর্মকাণ্ড আর্থিকভাবে টেকসই করতে ওয়াসাগুলো পানির শুল্ক ১০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর ক্ষমতা দেয়ার প্রস্তাব করেছে। অনুরূপভাবে ১৯৯৬ সালের মডেল বাই-ল'টি পৌরসভা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭-এর অধীনে প্রণীত। কিন্তু, নতুন স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এ পানি সরবরাহ বিষয়ে বাই-ল' করার কোন সুযোগ নেই। এর বদলে আইনে প্রবিধানমালা প্রণয়নের ব্যবস্থা আছে।

সেক্টর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার জন্য স্পষ্টতঃই নতুন আইন, প্রবিধান ও অন্যান্য আইনি দলিল প্রণয়নের আবশ্যকতা রয়েছে। অন্যথায় বিদ্যমানগুলো সংশোধন করতে হবে। পানি সরবরাহ সেক্টরের কর্মকাণ্ড বৃহত্তর পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা তথা ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনার আওতার মধ্যে ও তার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও শক্তিশালীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুচ্ছেদ ৩.৩-এ বিশদভাবে আলোচিত।

৪.১.১ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রণয়নাধীন আইন ও প্রবিধানসমূহ

প্রথমে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে বিপুল পরিমাণ পানি সরবরাহের উৎস হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ পানি-সংশ্লিষ্ট আইন ও প্রবিধানসমূহ এবং তৎপরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত প্রবিধানগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশ পানি আইন

ওয়াসা আইন, ১৯৯৬ অনুযায়ী ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী নগরীসমূহে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত বর্তমানে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার কোন সুসম্বদ্ধ আইনি কাঠামো নেই। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) আইন, ২০০০ ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে দায়িত্ব প্রদান করেছে। পানিসম্পদ উন্নয়নের জন্য নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনের দায়িত্ব পানিসম্পদ উন্নয়ন আইন, ১৯৯২ অনুযায়ী পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার (WARPO)। ভূমি মন্ত্রণালয় নদীর মালিক এবং নদীতে কোন কাঠামো যেমন, নৌকা অবতরণ জেটি নির্মাণের অনুমতি দিয়ে থাকে। যাহোক, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি উত্তোলনে কোন কার্যকর প্রবিধান বর্তমানে নেই।

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় (MoWR) জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৮ অনুযায়ী প্রবিধানমালা তৈরির জন্য "বাংলাদেশ পানি আইন"-এর খসড়া তৈরি করেছে। খসড়া আইনের (২০০৯) বর্তমান সংস্করণ মতে এটা, "পানিসম্পদের সমন্বিত, ন্যায্য ও টেকসই ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও ব্যবহার এবং এর সংরক্ষণ বা সুরক্ষা সহজ ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের পানিসম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করবে"। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে খসড়া আইনটি মালিকানা, পানির জবর দখল এবং গৃহস্থালী ও পৌর ব্যবহারসহ পানি ব্যবহার অধিকার বর্ণনা করেছে। যাহোক, খসড়া আইনে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। তবে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশদ গুরুত্ব প্রদান করা আবশ্যক।

পানি আইনে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজনঃ

- ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ ও পরিমাণ, উভয় বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য 'পানি চাপ এলাকা'র ধারণাটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া। এতে: ১) পৌর বা সেচের পানি উত্তোলনের ফলে পানিস্তর নেমে যাওয়া; ২) লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বা আর্সেনিক সংক্রমণ; ও ৩) শিল্প ও কৃষি-রাসায়নিক দূষণ বিষয়ে আলোকপাত করা;
- পানি উত্তোলনে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। কিছু সুনির্দিষ্ট ধরণের পানি উত্তোলন (উদাহরণস্বরূপ, দেশীয় হস্তচালিত নলকূপ)কে রেয়াত দিয়ে এটা সময়-নির্দিষ্ট লাইসেন্স প্রদানের অনুমতি দেবে;
- কূপ খননের লাইসেন্সিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। কিছু সুনির্দিষ্ট ধরণের খনন প্রযুক্তি বা আকারের কূপকে রেয়াত দিয়ে এটা সময়-নির্দিষ্ট লাইসেন্স প্রদানের অনুমতি দেবে;
- পানি সরবরাহে দূষণ প্রতিরোধে বর্তমান ও ভবিষ্যত ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসেবে উৎস সুরক্ষা-অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা;
- ভূ-গর্ভে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিমভাবে পানি পুনঃভরাটের (recharge) জন্য বর্ষাকালে পানিতে ভরপুর বৃহৎ জলাশয়গুলো রক্ষা করা; ও
- দূষণকারী কর্তৃক ব্যয়বহন নীতির ভিত্তিতে ভূ-গর্ভস্থ দূষিত পানিকে বিশুদ্ধ করতে আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ নিয়ন্ত্রণ

খসড়া পানি আইনে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি-সংক্রান্ত প্রবিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং স্বল্প পরিসরে এসেছে ভূ-গর্ভস্থ পানির বিষয়টি। কিন্তু পানি সরবরাহে উৎসটির ব্যবহার গভীরভাবে সম্পর্কিত হওয়ায় এ অনুচ্ছেদে ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদের নিয়ন্ত্রণ বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অধিকন্তু, কৃষি এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর কর্তৃক ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রতিযোগিতামূলক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বকে আরো জোরালো করেছে। বিবেচ্য পানি আইনের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানিও নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। চিত্র ৪.১ অনুযায়ী ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণকে দু'টি বৃহৎ কর্মকাণ্ডে বিভক্ত করা যেতে পারেঃ

সম্পদ নিয়ন্ত্রণ - ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন ও সুরক্ষায় প্রবিধানমালা প্রণয়ন ও বলবৎকরণ এবং প্রবিধান প্রতিপালনের বিষয়গুলো সার্বক্ষণিকভাবে পরিবীক্ষণ;

পানি উত্তোলন ব্যবস্থাপনা - পানি উত্তোলনের লাইসেন্স প্রদান, প্রকৃত পানি উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ, পানি উত্তোলনের পরিমাণ, পানিস্তর ও পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ এবং সম্ভাব্য দূষণ থেকে পানির উৎস রক্ষা।

এ দু'টি নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন সংস্থাসমূহের ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব নিচের চিত্রে উল্লেখ করা হলো:

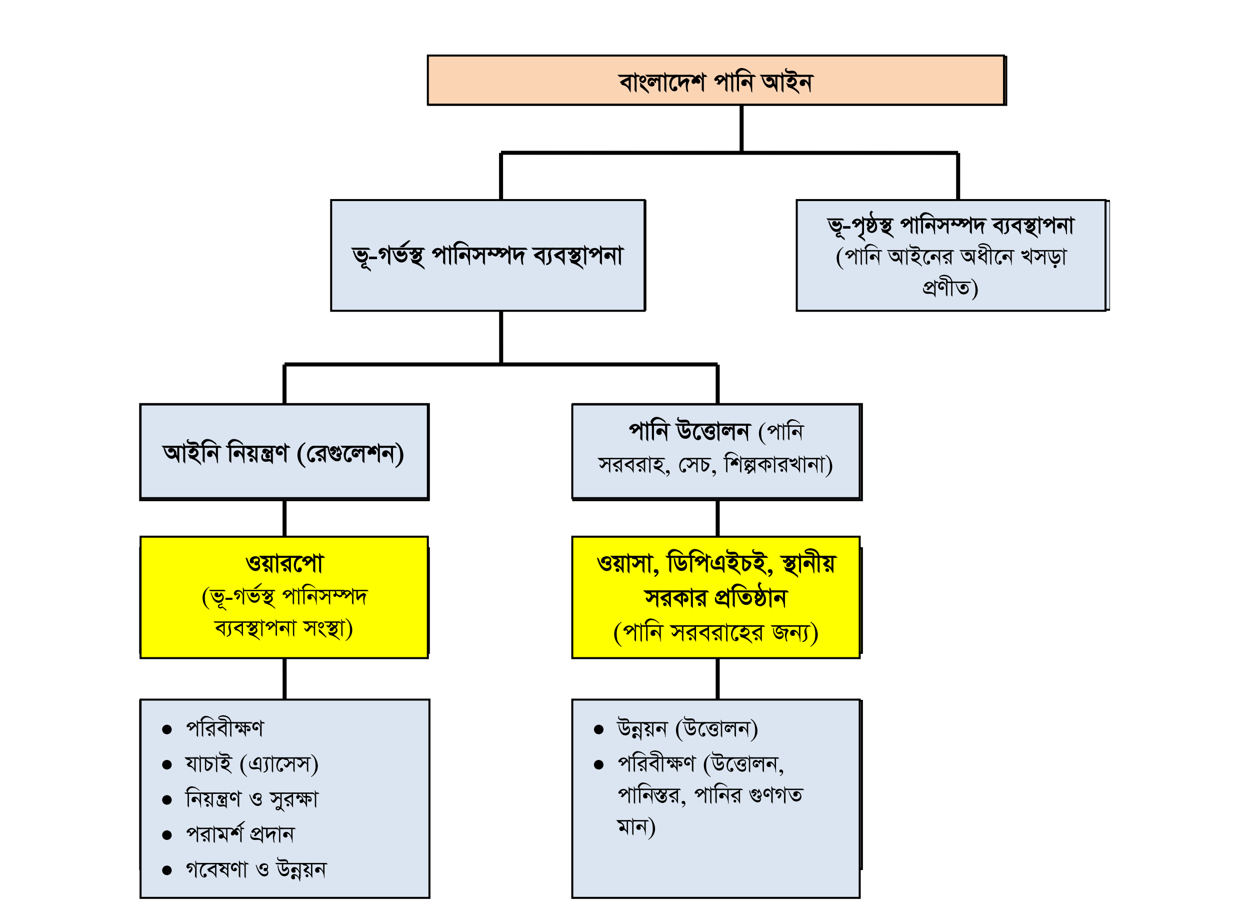

চিত্র ৪.১ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০০৯ এর আওতায় ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রম, ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব বিভাজন।

সম্পদ নিয়ন্ত্রণ: একটি মৌলিক নীতি হলো, সম্পদ নিয়ন্ত্রণকে পানি উত্তোলন ব্যবস্থাপনা থেকে আলাদা রাখতে হবে। এটা পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের (MoWR) দায়িত্বে, কিন্তু তা পানি উত্তোলনের নির্বাহী কর্তৃত্বসম্পন্ন সংস্থা থেকে পৃথক থাকবে।

বর্তমানে, সম্পদ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালনকারী নিকটতম প্রতিষ্ঠানটি হলো পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO)। পরিকল্পনা ও কর্মী সংস্থানের মধ্যেই এর দায়িত্ব সীমাবদ্ধ। নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য এর সম্পদ একেবারেই অপর্যাপ্ত। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পানিবিদ্যা অনুবিভাগ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি সার্কেল, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ভূ-গর্ভস্থ পানি পরিবীক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। বিভাগটি বেশ শক্তিশালী, কিন্তু পানি উত্তোলন থেকে এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পৃথকীকরণ নীতির কারণে এর প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান বেমানান। সম্পদ নিয়ন্ত্রণের জন্য আরেকটি বিকল্প ব্যবস্থা হলো একটি পৃথক ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা। নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও একে কার্যকর করা বেশ জটিল। তা সত্ত্বেও, ওয়ারপোকে পরিকল্পনা কাজের অতিরিক্ত সম্পদ-নিয়ন্ত্রক হিসেবে শক্তিশালী করা একটি বাস্তব সমাধান হতে পারে। এজন্য ওয়ারপো'র নতুন জনবল, প্রশিক্ষণ, কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ক্ষমতার্পণ প্রয়োজন হবে। প্রস্তাবিত পানি আইনে ওয়ারপো'র অতিরিক্ত দায়িত্বের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

উত্তোলন ব্যবস্থাপনা: বিভিন্ন সংস্থা, যেমন: ডিপিএইচই, সকল ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও গ্রামীণ পাইপবাহিত পানি সরবরাহ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গৃহস্থালীতে পানি সরবরাহের জন্য পানি উত্তোলনে নিয়োজিত। তারা ওয়ারপো নির্ধারিত নির্দেশিকার আওতায় পরিচালিত হয়ে থাকে। সংস্থাগুলো পানি উত্তোলনের পরিমাণ, পানিস্তর ও গুণগত মান এবং দূষণ থেকে পানির উৎস সুরক্ষা কার্যক্রমের পরিবীক্ষণের ব্যবস্থাও গ্রহণ করবে। বহুল অভিপ্রেত জাতীয় ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্রে বেসরকারি সেচ ও পানি সরবরাহসহ বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা ও দায়-দায়িত্বসমূহ বিশদভাবে উল্লেখ থাকবে।

জাতীয় ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র

একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃসেক্টর বিষয় হচ্ছে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা। এটি কৃষি, পানিসম্পদ এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরসমূহের সাথে পরস্পর-সম্পর্কিত (cross-cutting) বিষয়। তাই, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উচিত জাতীয় ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র প্রণয়ন করা। কৌশলপত্রটি আদর্শ অবস্থায় সংশোধিত পানি আইনের কাঠামোর আওতাধীন থাকবে। আশা করা যায়, এতে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনার সমস্যাগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আশু নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে পানি আইন সংশোধন ও বিধিবদ্ধকরণের সাথে সাথেই ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্রের খসড়া প্রণীত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রক্রিয়াটি শুরু হলে কিছু আবশ্যিক নিয়ন্ত্রণমূলক উপাদান প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত শুরুর জন্য সহায়ক হবে।

ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য হবে উৎসটির যথাযথ ব্যবহার, বিভিন্ন ব্যবহারকারীর মধ্যে পানির সুষম বণ্টন নিশ্চিত ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উন্নয়ন কার্যক্রম সহজতর করা। এতে সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও পানি নিরাপত্তা কাঠামোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হবে। এছাড়াও অতিমাত্রায় পানি উত্তোলন ও দূষণের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রবিধান ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করবে। চমৎকার একটি প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন মোর্চা (institutional development platform) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এটি এমন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করবে, যেখানে সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে এবং যুগপৎভাবে জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন ঘটবে।

৪.১.২ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য প্রস্তাবিত নতুন আইন ও প্রবিধানমালা

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য নিম্নোক্ত দু'টি ক্ষেত্রে আশু সংস্কার প্রয়োজন:

- সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর (যেমন: ওয়াসা, ডিপিএইচই, পৌরসভা পানি সরবরাহ শাখা, বেসরকারি সেবা প্রদানকারী) প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক উন্নয়ন;[৫১] ও
- নিয়ন্ত্রণমূলক কর্ম-কাঠামো (regulatory framework) প্রতিষ্ঠা করা।

উপর্যুক্ত দু'টি বিষয় ব্যাপকভাবে পরস্পর-বিজড়িত (inter-winned)। সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ব্যতীরেকে নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো কখনও সফল হতে পারে না। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাব্যবস্থা নিশ্চিত করা। সেগুলো বেসরকারি বা সরকারি যে খাতেরই হোক না কেন। নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোর প্রধান নীতি হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতিমালা, প্রবিধান ও সেবা-বিতরণ কার্যক্রমের সুস্পষ্ট পৃথকীকরণ। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, এ নীতির প্রতি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর সংস্থাগুলোর দৃঢ় আনুগত্য বাস্তবক্ষেত্রে ফলদায়ক প্রভাব বয়ে আনতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ: এটি শুল্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বিরূপ প্রভাব থেকে সরকারি খাতের সেবা প্রদানকারীদের রক্ষা করতে পারে। ফলে তা আর্থিকভাবে তাদেরকে টেকসই হতে সহায়তা করে। অন্যদিকে, একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থা শুল্ক-বৈষম্যমূলক বা

[৫১] অধ্যায় ৫-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নিষেধাজ্ঞামূলক নয়, বরং তা ভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষা অথবা ভর্তুকি সহায়তা ব্যবস্থার দ্বারা দরিদ্র মানুষকে/জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে পারে।

পানি সেবা (Water Services) আইন

নিয়ন্ত্রক কর্ম-কাঠামো তৈরি করার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে পানি সেবা আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার বিভাগ আইনটির খসড়া তৈরি করতে পারে। আইনটি পানি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (পরে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে) গঠনের কাজকেও সহজ করবে। প্রথম পানি সেবা আইনটি তুলনামূলকভাবে সহজ রাখা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবস্থাটি একবার চালু হয়ে গেলে নিশ্চিতভাবেই বহুবছরের অভিজ্ঞতায় তা আধুনিকায়ন করার প্রয়োজন হবে। তদুপরি, প্রথম আইনটিতে সরকারি সেবা প্রদানকারীদের (ওয়াসা, পৌরসভা পানি সরবরাহ শাখা, সিটি কর্পোরেশন) বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। কারণ, নিকট ভবিষ্যতে অগ্রগামী বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের (যেমন: পূর্ণ কনসেশনে) সম্ভাবনা বেশ কম।

পানি সেবা আইনে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এমন বিষয়সমূহের রূপরেখা নিচে দেয়া হলো:

- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাসুবিধার জন্য একটি সার্বিক কর্ম-কাঠামো;
- বিভিন্ন সত্তা বা প্রতিষ্ঠানের (entities) দায়-দায়িত্বসমূহ: নীতি-নির্ধারক, নিয়ন্ত্রক এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানকারী;
- সেবার মান ও পানি সরবরাহের শুল্ক নির্ধারণ;
- ভোক্তা ইন্টারফেস ও তথ্য;
- বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ;
- অপরাধসমূহ, আইন বলবৎকরণ, বিরোধ নিরসন, আপীল প্রক্রিয়া-পদ্ধতি এবং কারিগরি ও আর্থিক মানদণ্ড।

পানি সেবা নিয়ন্ত্রণ

নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্য হলো সহযোগীদের মধ্যে ন্যায্যতার লক্ষ্য অর্জন করা, প্রধানতঃ ভোক্তা ও সেবাদানকারীদের মধ্যে (বক্স ৪.১ দেখুন)।

বক্স ৪.১ তিনটি প্রধান সহযোগী: নীতি নির্ধারক, সেবা প্রদানকারী ও ভোক্তার মধ্যেকার জবাবদিহিতার সম্পর্ক

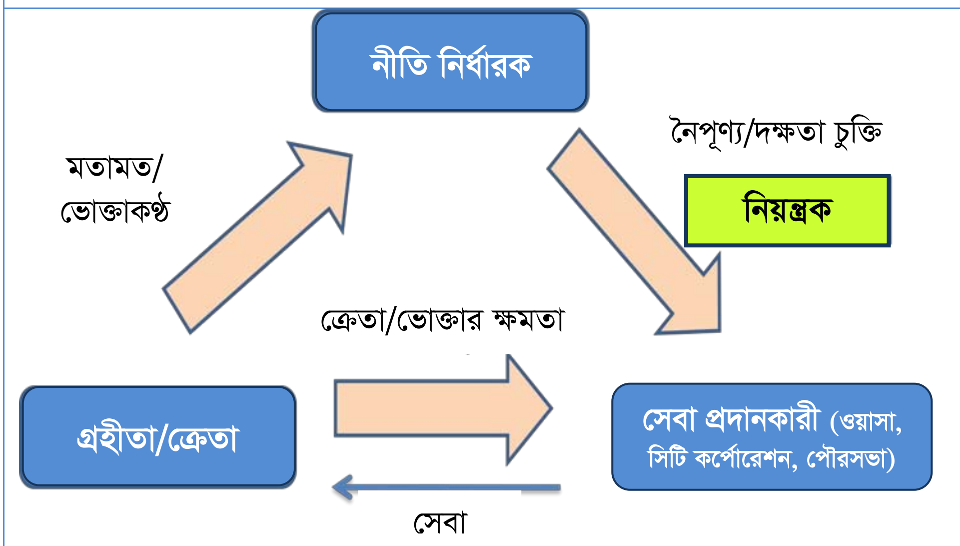

সূত্র: বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৪, বিশ্বব্যাংক হতে গ্রন্থিত ।

নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্য হলো সহযোগীদের মধ্যে ন্যায্যতার লক্ষ্য অর্জন করা, প্রধানতঃ ভোক্তা ও সেবা দানকারীদের মধ্যে।

নীতি-নির্ধারক (মন্ত্রণালয়, সিসি ও পৌরসভা)	√ সেক্টর নীতি নির্ধারণ √ সেক্টর পরিকল্পনা √ বিনিয়োগ ও ভর্তুকি	*নীতি নির্ধারক, সেবা প্রদানকারী, ভোক্তা ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা ও দায়-দায়িত্বসমূহ সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।*
নিয়ন্ত্রক (স্বতন্ত্র/স্বাধীন)	√ শুল্ক, সেবা, মান, ক্রেতা-সম্পর্ক বিষয়ে বিধিমালা ও প্রবিধান √ প্রবিধান ও মানদণ্ড বলবৎকরণ	
সেবা-প্রদানকারী (যেমন, ওয়াসা ও	√ ক্রেতা বা ভোক্তার জন্য সেবাসুবিধার ধরণ √ বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন √ বিধিবিধান প্রতিপালন √ ভোক্তা অধিকার ও দায়-দায়িত্বসহ চুক্তির শর্তাবলী প্রতিপালন	
ক্রেতা/ভোক্তা	√ শুল্ক পরিশোধ √ ক্রেতা/ভোক্তা ফোরামে অংশগ্রহণ √ পানিসম্পদ সংরক্ষণ	

সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে:

- গ্রহণযোগ্য সেবার মান প্রতিপালন নিশ্চিত করা;
- সেবার মান অর্জনে শুল্ক নির্ধারণ করা, যা সেবা প্রদানকারীদের যথেষ্ট রাজস্ব দিতে পারে;
- কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, সেবাদানকারীরা সেবার মান প্রতিপালন করছে কী না তা দেখা, অন্যথায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা; ও
- বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান।

এসডিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এডিবি'র অর্থায়নে পরিচালিত একটি সমীক্ষায় (২০০৯) বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ কর্ম-কাঠামো প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। সমীক্ষাটি অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশে জ্বালানী ও টেলিযোগাযোগ সেক্টরে বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং আন্তর্জাতিক, সুনির্দিষ্টভাবে আঞ্চলিক দেশগুলোর অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে (বক্স ৪.২ দেখুন)।

বক্স ৪.২ কার্যকর নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্বশর্তসমূহ বিষয়ে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা

১. *অনেকগুলো নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের ঘন ঘন কর্ম-সম্পাদন বৈধতার প্রয়োজন নেই। অনেক দেশে স্বল্প সংখ্যক নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানসহ নিয়ামক সংস্থা রয়েছে। নেপাল, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোন নিয়ামকের অধীনে ৩০টির বেশি সেবা প্রতিষ্ঠান নেই।*

২. *নিয়ামক সংস্থার অবশ্যই কিছু "কার্যকর" স্বাধীনতা থাকতে হবে। স্বাধীন নিয়ামক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির প্রধান যুক্তি হচ্ছে সেক্টরকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপজনিত বিরূপ প্রভাব থেকে রক্ষা করা। যদি এ সব নিয়ামক সংস্থা সব সময় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের আজ্ঞানুবর্তী থাকে, তখন এর টিকে থাকার মূল্য সামান্যই হয়।*

৩. *অবশ্যই নিজস্ব নিয়ম-কানুন/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকতে হবে। এর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, সেবা কার্যকর করার উপায় ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্ম-সম্পাদন মানদণ্ড থাকতে হবে। ক্ষমতার মধ্যে অবশ্যই অনুমতিপত্র বাতিল ও জরিমানা দণ্ড আরোপের বিষয়ও থাকতে হবে। যদি এর হাতে এরূপ কোন বিধান না থাকে, তা হলে কেউ একে অনুসরণ করবে না।*

৪. *অবশ্যই প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ জনবল থাকতে হবে।*

সূত্র: ADB'র রেগুলেটরী বিশেষজ্ঞ পরামর্শক, Antonio R. De Vera কর্তৃক বাংলাদেশের জন্য একটি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর সুপারিশ, নভেম্বর ২০০৯।

সমীক্ষাটি এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, একটি পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রতিষ্ঠা বর্তমান পর্যায়ে অকালিক (premature) হবে। নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রতিষ্ঠা পর্যায়ক্রমে ও দু'টি ধাপে সংগঠিত হবে:

১. প্রথম পর্যায়ে এলজিডিতে **পানি সরবরাহ কোষ** (বিদ্যুত কোষের অনুরূপ) স্থাপন করা হবে। এর দায়িত্ব হবে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদান এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য সেক্টরে উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা। প্রতিষ্ঠার সময় কমিয়ে আনতে এবং পলিসি সাপোর্ট ইউনিটের (PSU) কাজের সাথে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানকল্পে পানি কোষকে PSU-তে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, কারণ এটি নীতিমালা বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত; এবং

২. দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হবে একটি স্বাধীন **পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিয়ন্ত্রণ কমিশন** প্রতিষ্ঠার কাজ। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ তিন বা পাঁচ বছর পর শুরু হতে পারে। কারণ, ততদিনে কমিশন প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা প্রমাণে সেক্টরের অবস্থা বেশ সহায়ক হবে।

নিম্নবর্ণিত প্রেক্ষিতে পানি কোষের কর্মকাণ্ড হবে:

উপযুক্ত **সেক্টর পরিবেশ তৈরি করা: (১)** প্রাতিষ্ঠানিক ও কার্যকরভাবে বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক সংস্কারের পন্থা অনুসরণ করা। মানসম্মত বাণিজ্যিক অনুশীলন, বিলিং ও আদায় ব্যবস্থা নির্ধারণ এ সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হবে; (২) সকল ওয়াসার ও পৌরসভার পানি সরবরাহ শাখার কার্যকর স্বায়ত্তশাসন বৃদ্ধির জন্য আইনগত সংস্কারের পন্থা অবলম্বন; (৩) সমীক্ষা পরিচালনা করা, যেমন: সেবা প্রতিষ্ঠানের ভর্তুকি সহায়তা এবং সেগুলোকে আর্থিকভাবে উপযোগী করতে আঞ্চলিক পর্যায়ে সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের যৌক্তিকীকরণ; ও (৪) পানি সেবা আইনের খসড়া তৈরি ও বিধিবদ্ধকরণে সহায়তা প্রদান।

নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত ভূমিকা পালন: (১) বছরভিত্তিতে পানি নিরাপত্তা কর্ম-কাঠামো (water safety framework) বিধিমালাসহ সেবা ও কর্ম-সম্পাদন মানদণ্ড প্রণয়ন (একটি "সময় পরিলেখ বা টাইম প্রোফাইল"); (২) প্রতিবেদন, কর্মপরিকল্পনা এবং কর্ম সম্পাদনের লাগসই প্রধান প্রধান নির্দেশক নির্ধারণের জন্য ছক প্রণয়ন; ও (৩) পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা, সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও বৈধতা প্রদান/প্রতিপাদন (validate) করা, তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা ও সেবা প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম যোগ্যতা (benchmark) নির্ধারণ করা।

নগরাঞ্চলে সকল পাইপবাহিত পানি সরবরাহ প্রকল্প নিয়ন্ত্রণ কমিশনের আওতায় থাকবে। নিয়ন্ত্রণ শুরু করার জন্য সকল ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন ও বড় বড় পৌরসভাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ডিপিএইচই কমিশনের নির্দেশনায় নগরভিত্তিক বর্ধিষ্ণু কেন্দ্রগুলোতে (growth centres) ও গ্রামাঞ্চলে পাইপবাহিত পানি সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করবে। একইভাবে কাজ করবে যেখানে সংস্থাটি সরাসরি সেবা প্রদানের সাথে জড়িত নয়, সেখানে অন্যান্য গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পে।

৪.২ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য জাতীয় নীতিমালা ও কৌশলপত্রসমূহ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর পরিচালনার নীতিমালা ও কৌশলপত্রসমূহ প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। নতুন নীতিমালা ও কৌশলপত্রের চাহিদা যাচাই বা বিদ্যমানগুলোর সংশোধন বিষয়ে আরও বিশ্লেষণ নিচে উল্লেখ করা হলো।

৪.২.১ জাতীয় নীতিমালাসমূহ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে বর্তমানে দু'টি নীতিমালা বিদ্যমান:

- জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা (NPSWSS) ১৯৯৮; ও

- জাতীয় আর্সেনিক নিরসন নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (NAMIP) ২০০৪।

নিচে বর্তমান ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় নীতিমালা দু'টির যথার্থতা বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা (NPSWSS), ১৯৯৮

- এটি নলকূপ-প্রতি ব্যবহারকারীর গড় কভারেজের প্রেক্ষিতে গ্রামীণ পানি সরবরাহ কভারেজ লক্ষ্যমাত্রা এবং নগর এলাকায় শতকরা হারে সার্বিক কভারেজ নির্ধারণ করেছে। তবে সেবার গুণের দিক থেকে গ্রামীণ ও নগর, উভয় এলাকার কভারেজ স্তর বিবেচনা করা হয়নি;
- এতে কভারেজ স্তরের লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এতে কোন সময়সীমা বা সম্পদ-লভ্যতার বিষয়ে কিছুই উল্লেখ নেই;
- নীতিমালায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের উল্লেখ আছে। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণের প্রকৃত প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি;
- এটি বিশেষতঃ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আলোকপাত করেনি। তবে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় (NWMP) ভূ–গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের (সেচের জন্য) জন্য নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর সাধারণ প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে প্রস্তাব রাখা হয়েছে;
- নীতিমালায় সরকারি সংস্থা, বেসরকারি খাত ও এনজিও'র ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব বিশদভাবে বর্ণিত আছে। এটা ডিপিএইচইকে নেতৃস্থানীয় সেক্টর সংস্থা হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অঙ্গ/বিভাগ আছে দাতা-সহায়তায় বাস্তবায়িত এমন প্রকল্পে এলজিইডি'র ভূমিকা রাখার প্রস্তাব করেছে। যাহোক, সরকারি সংস্থা (ডিপিএইচই, এলজিইডি) ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন)-এর মধ্যেকার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাটি নীতিমালায় কেবলমাত্র প্রস্তাবমূলক। পরবর্তীতে জারিকৃত কৌশলপত্র বা সরকারি নির্দেশনাসমূহে এদের ভূমিকা ও দায়-দায়িত্বসমূহ পরিষ্কাভাবে নির্ধারিত হয়নি;
- এতে জনগোষ্ঠী থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন সহযোগীর মধ্যে সুনির্ধারিত সমন্বয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়নি; এবং
- প্রায় এক দশকেরও বেশি আগে এ নীতিমালা প্রণীত। পরবর্তীতে জলবায়ু পরিবর্তন, পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার মত উদ্ভুত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং স্বাস্থ্যসম্মত আচার প্রসারে বর্ধিত জোর দেয়ার বিষয় এতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

জাতীয় আর্সেনিক নিরসন নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (NAMIP) ২০০৪

এটি আর্সেনিক সমস্যা বিষয়ে তৎকালীন জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রণীত। যাহোক, বর্তমানে এ সমস্যা সম্পর্কে অনেক বেশি জ্ঞান ও স্পষ্টতা বিদ্যমান, যা নীতিমালায় একীভূত করা আবশ্যক। আর্সেনিক সমস্যা পৃথকভাবে আলোচিত হয়েছে (পানির মান সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৩.৪ দ্রষ্টব্য)।

জাতীয় খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা (NDWSSP), ১৯৯৮

নীতিমালাটির (NPSWSS) বাস্তবায়নে অধিকতর অগ্রগতি অর্জন সম্ভব ছিল, যদি এবিষয়ে সুনির্দিষ্ট সময়কাঠামো, আর্থিক বরাদ্দ ও সরকারি নির্দেশনা এতে সংযোজিত থাকতো। অধিকন্তু, এক দশকেরও বেশি আগে নীতিমালাটি প্রণীত। জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার মত সেক্টরের নতুন সমস্যা এতে প্রতিফলিত হয়নি। তবুও, লক্ষণীয় যে নীতিমালাটিতে সাধারণভাবে সেক্টরের অনিষ্পন্ন কিছু সমস্যা বিবেচিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও, নীতিমালাটি নমনীয় এবং অনিষ্পন্ন ও নতুন সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণকে অনুৎসাহিত করেনি।

বাস্তব কারণেই এ মুহূর্তে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন বা বিদ্যমানটির সংশোধন দরকার নেই। তাই NPSWSS অপরিবর্তিত থাকতে পারে। কিন্তু, সেক্টরের বিদ্যমান ও উদ্ভুত চ্যালেঞ্জসমূহ (নিচে আলোচিত) মোকাবিলার জন্য এর আওতায় কিছু নতুন কৌশল প্রণয়ন প্রয়োজন।

জাতীয় আর্সেনিক নিরসন নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (NPAMIP) ২০০৪

খাবার পানিতে আর্সেনিক সমস্যাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় আর্সেনিক নিরসন নীতিমালা (NPAM), ২০০৪ ও বাংলাদেশে আর্সেনিক নিরসন বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (IPAM), ২০০৪ গ্রহণ করে। নীতিমালায় পানীয় জল, স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতে আর্সেনিক নিরসন নির্দেশিকা প্রদান করা হয়েছে। ২০০৪ থেকে এ পর্যন্ত বহু গবেষণা ও বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে আর্সেনিক সংক্রমণ, এর ঝুঁকি ও নিরসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান-গরিমা।

NPAMIP, ২০০৪ বিষয়ে (WSP, ২০০৯) একটি পর্যালোচনায় সুপারিশ করা হয়েছে যে, জাতীয় আর্সেনিক নিরসন নীতিমালা ২০০৪ অক্ষত থাকতে পারে। তবে, এর অনুষঙ্গী বাস্তবায়ন পরিকল্পনাটি পৃথক ও পুনরোন্নয়ন করা উচিত।[৫২] চিত্র ৪.২ মতে প্রতিটি প্রধান মন্ত্রণালয় - কৃষি, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার (পানি সরবরাহের জন্য) ও পানি সম্পদ - আর্সেনিক নিরসনে পৃথক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এ সুপারিশে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত জাতীয় ফোরাম। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে এটি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এ প্রেরণ করা দরকার।

বিশ্বব্যাংকের পানি ও স্যানিটেশন কর্মসূচি (WSP) তাদের পর্যালোচনাকালে পানি সরবরাহের জন্য আর্সেনিক নিরসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনার (IPAM-WS) একটি খসড়া প্রণয়ন করে। সেক্টর সহযোগীবৃন্দ কর্তৃক খসড়াটি পর্যালোচনা এবং এলজিডি কর্তৃক আর্সেনিক সংক্রান্ত সচিব কমিটি বা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা দরকার। বাস্তবায়ন পরিকল্পনাটি হওয়া দরকার সম্প্রতি জাইকা পরিচালিত সমীক্ষার (২০০৯) সুপারিশ অনুযায়ী।

WSP পর্যালোচনার সুপারিশ মতে সেক্টরসমূহের মধ্যে আর্সেনিক সমস্যার সমন্বয় আর্সেনিক বিষয়ক সচিব কমিটির মাধ্যমে হওয়া উচিত। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত আর্সেনিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অর্থায়নের এবং ঐ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উন্নত সমন্বয়ের জন্য একটি আর্সেনিক নিরসন তহবিলও গঠন করা যেতে পারে। এও সুপারিশ করা হচ্ছে যে, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে কমিটির কর্মপরিধি বাড়ানো এবং ”পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সচিব কমিটি” হিসেবে কমিটির পুনঃনামকরণ করা যেতে পারে।

---

[৫২] বাংলাদেশে আর্সেনিক নিরসন বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (IPAM): আর্সেনিক নিরসন বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সংশোধনের জন্য সুপারিশ (IPAM ২০০৯), Peter Ravenscroft ও কাজী মতিন আহমেদ, WSP, ২০০৯।

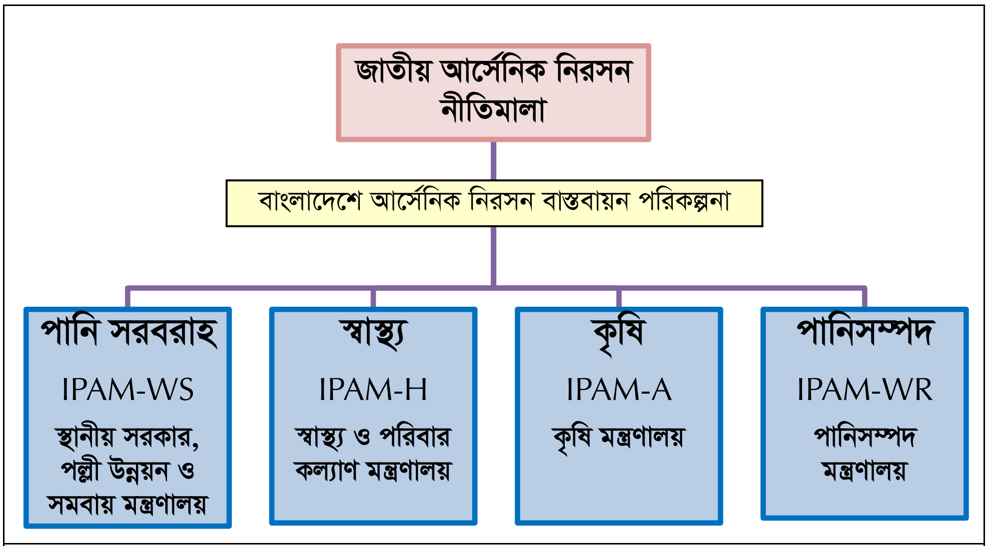

চিত্র ৪.২ আর্সেনিক নিরসনের জন্য নীতিমালা ও পরিকল্পনাসমূহের সংগঠন

৪.২.২ জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র

উপর্যুক্ত নীতিমালা কাঠামোর অধীনে সেক্টরের সুনির্দিষ্ট সমস্যা বা বিষয়সমূহ মোকাবিলার জন্য কিছু নতুন কৌশলপত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। অন্যদিকে দু'টি বিদ্যমান কৌশলপত্রের সংশোধন ও হালনাগাদ করা প্রয়োজন। কৌশলপত্রগুলো জাতীয়, সেক্টর ও সাব-সেক্টর পর্যায়ের।

যে দু'টি কৌশলপত্র সংশোধন ও হালনাগাদ করা দরকার সেগুলো হলো:

ক) জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্র (NSS), ২০০৫; ও
খ) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক দরিদ্র-সহায়ক কৌশলপত্র (PPSWSS), ২০০৫।

প্রণয়নাধীন জাতীয় কৌশলপত্রসমূহ:

গ) জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যয়-বণ্টন কৌশলপত্র;
ঘ) জাতীয় দুর্গম এলাকা ও জনগোষ্ঠীর জন্য কৌশলপত্র;
ঙ) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক জাতীয় স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রসার কৌশলপত্র।

তৎসত্ত্বেও, সেক্টরের সকল সমস্যা বা বিষয় বিদ্যমান বা পরিকল্পিত কৌশলপত্রের আওতার মধ্যে আসেনি। উদাহরণস্বরূপ, স্যানিটেশনের জন্য কৌশলপত্র আছে, কিন্তু পানি সরবরাহের জন্য নেই।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে অনেকগুলো কৌশলপত্রের উপস্থিতি প্রায়শঃই গ্রামীণ ও নগর এলাকায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নকালে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে এটা কর্মীদের জন্যও বাড়তি ঝামেলা। কারণ, তাঁদেরকে অনেকগুলো কৌশলপত্র পর্যালোচনা ও অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়। তাই বিদ্যমান ও প্রণয়নাধীন কৌশলপত্রসমূহ সহজতর এবং দু'টি সাব- সেক্টরের জন্য নিচের দু'টি সুনির্দিষ্ট কৌশলপত্রে পুনর্গঠন করা আবশ্যক:

- জাতীয় নগর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র; ও
- জাতীয় গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র।

যদিও উদীয়মান সমস্যার উপযোগী করতে কৌশলপত্রগুলো বেশ নমনীয় হওয়া উচিত, তদুপরি সেগুলো প্রতি পাঁচবছর অন্তর ন্যূনতম একবার পর্যালোচিত ও হালনাগাদকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কৌশলপত্রগুলো সরকারি সংস্থা, এনজিও ও বেসরকারি খাতসহ সকল সহযোগী কর্তৃক অনুসৃত হবে। উপরে বর্ণিত কৌশলপত্রের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে এলজিডি, ডিপিএইচই, সকল ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাকে নিয়ে আয়োজিত পাঁচটি একান্ত কর্মশালায় প্রধান প্রধান সহযোগীদের সাথে আলোচনা হয়েছে ও তাঁরা একটি ঐকমত্যে উপণীত হয়েছে (পরিশিষ্ট ৬ দেখুন)।

জাতীয় নগর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের উন্নয়নে কৌশলপত্রটি এলজিডি, ডিপিএইচই, এলজিইডি, সকল ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করবে। এটি মাইলফলকসহ সংস্কার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি করবে। কৌশলপত্রের কিছু উপাদান সাধারণ প্রকৃতির ও নগরাঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য। অন্য উপাদানগুলো ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা-নির্দিষ্ট। প্রশাসনিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অনন্য বৈশিষ্ট্যের হলেও এলাকাটির জন্যও সুনির্দিষ্ট উপাদানেরও আবশ্যকতা আছে। এগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

সাধারণঃ

১. পরিচালনাগত ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ: ক) ২০১৫ ও ২০২০ সনের মধ্যে হিসাব-বহির্ভুত পানির (UfW) পরিমাণ যথাক্রমে কমপক্ষে ২৫ ও ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা; খ) অবৈধ সংযোগ ও লাইনে ছিদ্র চিহ্নিতকরণ ও এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অপচয় নিয়ন্ত্রণ; গ) পুরোনো ও ত্রুটিপূর্ণ পাইপলাইন প্রতিস্থাপন; ও ঘ) উৎস ও জোনে বাল্ক মিটার স্থাপনসহ বিতরণ জোন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন;
২. পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনাসহ কর্মসূচি পরিকল্পনা এবং পরিচালনা ও সংরক্ষণে জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা;
৩. নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান;
৪. সকল ভোক্তার জন্য পানির মিটার স্থাপন ও সেবার প্রকৃত ব্যয় প্রতিফলিত করতে প্রগতিশীল পানি শুল্কব্যবস্থা (progressive tariff structure) প্রতিষ্ঠা করা। যদিও দরিদ্রদের জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রদান করা হবে;
৫. সকল সেক্টর সহযোগী কর্তৃক WASH প্রসারের জন্য IEC নির্দেশিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করা;
৬. বহুমুখী চাহিদা পূরণে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম (R&D) পরিচালনা;
৭. জনগোষ্ঠী, স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা;
৮. পরিবেশ সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ-খাইয়ে নেয়া ও দুর্যোগ সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির জন্য সেক্টর প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি; ও
৯. ভবিষ্যতে ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণের জন্য বেসরকারি খাতকে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা।

ওয়াসা নির্দিষ্টঃ

১. পরিচালনা ও সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করতে অংশীদারিত্বমূলক কাঠামো চুক্তি বাস্তবায়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা উন্নয়ন ও সেবাপ্রদান ব্যবস্থা বজায় রাখা।

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা নির্দিষ্টঃ

১. বেইজলাইন জরিপ পরিচালনা ও নিয়মিত হালনাগাদ করে একটি তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা;
২. পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার মানোন্নয়নে একটি নিবেদিত তহবিল প্রতিষ্ঠা করা। সেবাদানকারীদের কর্মসম্পাদন হবে তহবিলে অভিগম্যতার ভিত্তি;
৩. নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহকে ডিপিএইচই'র সহায়তা প্রদান: ক) ভূমিব্যবহার পরিকল্পনাসহ একটি মাস্টার পরিকল্পনা প্রণয়ন; খ) পরিচালনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সামর্থ্য বৃদ্ধি; গ) পানির

মিটার স্থাপন; ঘ) পাইপলাইন মেরামত, অপচয় ও লিকেজ নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সরবরাহব্যবস্থা উন্নতকরণ; ঙ) ভোক্তার সেবা প্রদান (customer care service) ও গ্রাহক সম্পর্ক উন্নয়ন; ও চ) সেপটিক ট্যাংক ও গর্ত পায়খানা হতে গাদ/বর্জ্য অপসারণ (sludge disposal) ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;

৪. সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ক্ষমতা প্রদানসহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পানি ও স্যানিটেশন শুল্ক আদায়ে আউটসোর্সিং ব্যবস্থা প্রবর্তন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম নির্দিষ্ট:

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম-নির্দিষ্ট কৌশলগত দিকগুলো অনুচ্ছেদ ৩.১২.৪-এ বর্ণিত এবং এগুলো কৌশলপত্র প্রণয়নের সময় বিবেচনা করতে হবে।

জাতীয় গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র

নগর উপখাতের মত গ্রামীণ উপখাতেও ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট (focused) উন্নয়নের জন্য একটি উপযোগী কৌশলপত্র প্রয়োজন। গ্রামীণ কৌশলপত্রের নিম্নে প্রদত্ত উপাদানগুলো সাধারণ প্রকৃতির। উপরের বর্ণনানুযায়ী গ্রামীণ কৌশলপত্রের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামভিত্তিক উপাদানগুলোও বিবেচনা করা হবে। উপাদানগুলো নিম্নরূপ:

১. ডিপিএইচই-জাইকা পরিচালিত সমীক্ষা ২০১০-এর মাধ্যমে চিহ্নিত উচ্চ আর্সেনিক সংক্রমিত এলাকায় অবিলম্বে নিরসনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
২. গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনে প্রধান ভূমিকা-পালনকারী হিসেবে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদান অব্যাহত রাখা;
৩. ইউনিয়ন পরিষদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
৪. প্রধানতঃ দু'ধরণের পানি ও স্যানিটেশন চাহিদা পূরণে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন: ক) যেসব সমস্যা ভৌগলিকভাবে ব্যাপক বিস্তৃত (যেমন, আর্সেনিক ও ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর নেমে যাওয়া), ও খ) বিভিন্ন সমস্যাভিত্তিক (যেমন, দুর্গম এলাকা ও নাজুক জনগোষ্ঠী);
৫. সকল সেক্টর সহযোগী কর্তৃক WASH প্রসারের জন্য IEC নির্দেশিকার প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;
৬. গ্রামীণ এলাকায় ডিপিএইচই কর্তৃক সরাসরি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন ২০১৫ সনের মধ্যে প্রত্যাহার নিশ্চিতকরণ। কিন্তু, কেবলমাত্র গ্রামীণ পাইপবাহিত পানি সরবরাহ এলাকা, আর্সেনিক সংক্রমিত এলাকা ও দুর্গম এলাকার মত কৌশলগত সংকটাপন্ন এলাকায় সম্পৃক্ততা অব্যাহত রাখার অনুমতি প্রদান;
৭. সরকারি সংস্থা, এনজিও বা বেসরকারি খাতের মাধ্যমে ইউনিয়ন এলাকায় বাস্তবায়িত সকল পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প ইউনিয়ন **ওয়াটসান** কমিটি/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন নিশ্চিতকরণ। এছাড়াও পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ। উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনাসমূহ উপজেলা ওয়াটসান কমিটি/উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পরীক্ষিত ও মূল্যায়িত হবে;
৮. বহুমুখী চাহিদা পূরণে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) পরিচালনা;
৯. জনগোষ্ঠী, স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা; ও
১০. পরিবেশ সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ-খাইয়ে নেয়া ও দুর্যোগ সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির জন্য সেক্টর প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৪.৩ নতুন সেক্টর উন্নয়ন কর্ম-কাঠামো

চিত্র ১.২-এ বিদ্যমান আইন, নীতিমালা, কৌশলপত্র ও পরিকল্পনাসমূহ সমন্বয়ে প্রণীত বর্তমান সেক্টর উন্নয়ন কর্ম-কাঠামো উপস্থাপিত হয়েছে। এসডিপি'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন নতুন বা সংশোধিত আইন, নীতিমালা, কৌশলপত্র ও পরিকল্পনাসহ অভিপ্রেত সেক্টর উন্নয়ন কর্ম-কাঠামো চিত্র ৪.৩-এ দেখানো হলো। পারস্পরিক তুলনার উদ্দেশ্যেও বিদ্যমানগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে।

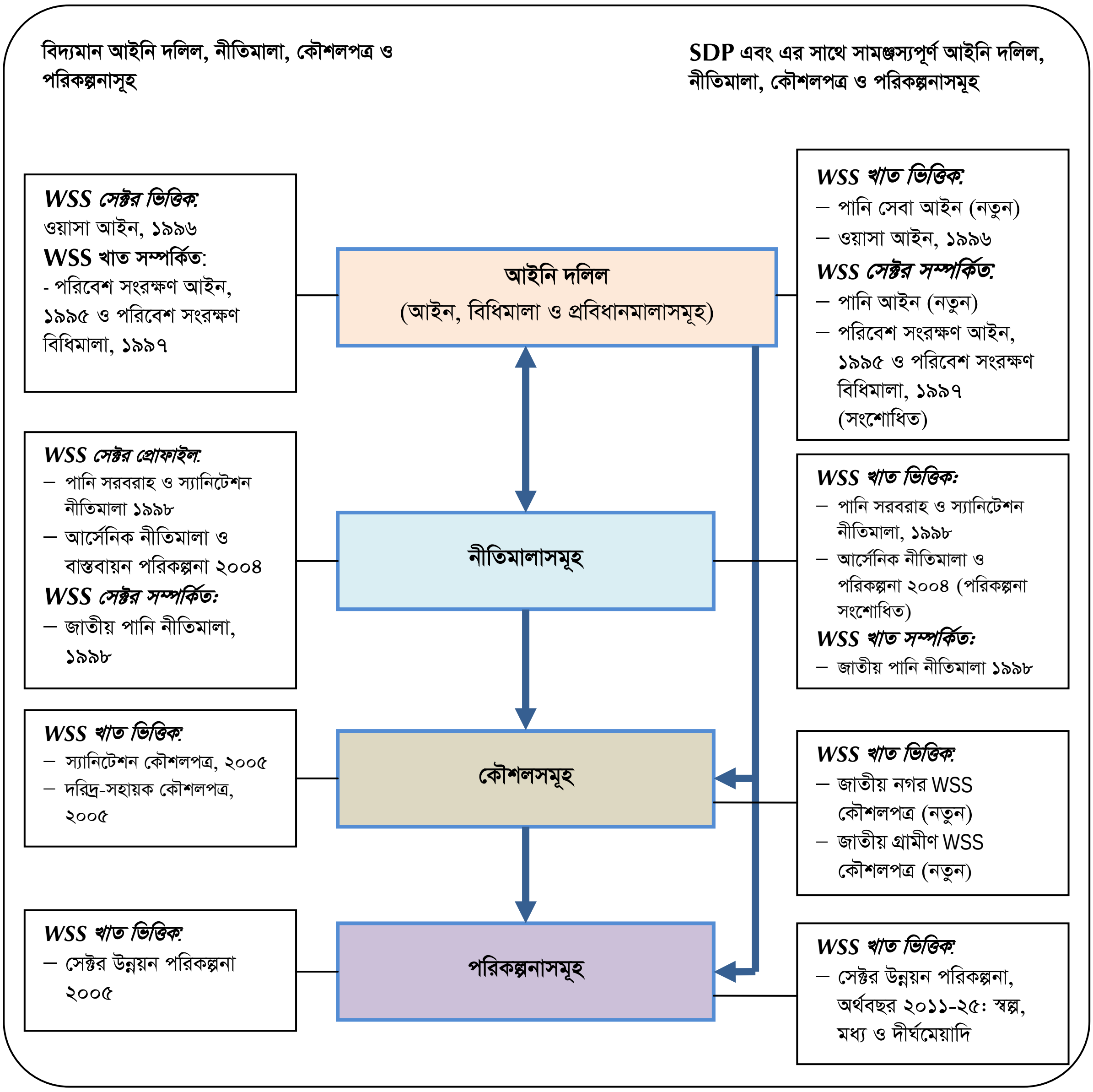

চিত্র ৪.৩ অভিপ্রেত সেক্টর উন্নয়ন কর্ম-কাঠামো

অধ্যায় ৫

সেক্টরের সামর্থ্য বৃদ্ধি

সক্ষমতা বৃদ্ধি পরিবেশ, সংগঠন ও ব্যক্তি এ তিনটি পর্যায়ে হস্তক্ষেপ বা মধ্যবর্তিতার সাথে সম্পর্কিত। এ অধ্যায়ে সামর্থ্য বৃদ্ধির সংজ্ঞা ও তিন পর্যায়ের হস্তক্ষেপের ব্যাখ্যা প্রদান এবং এলজিডি ও এর অধীনস্থ সংস্থাগুলোর সামর্থ্য বৃদ্ধি বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। খুব সংক্ষেপে অধ্যায়টি বিভিন্ন সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো বর্ণনা, বর্তমান ও ভবিষ্যত কার্যক্রমের বিবরণ প্রদান এবং সংগঠন ও ব্যক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রযোজ্য কর্মকাণ্ড উপস্থাপন করেছে। আশা করা যাচ্ছে যে, এনজিও ও বেসরকারি খাতের মত সেক্টরের অন্যান্য সংস্থাগুলোও এসডিপিতে তাদের জন্য সুপারিশকৃত দায়-দায়িত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে নিজেদের সামর্থ্য বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৫.১ সংজ্ঞা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির স্তর

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি'র (UNDP ২০০৭) সংজ্ঞা অনুযায়ী, সামর্থ্য হলো "স্থায়িত্বশীল পদ্ধতিতে কর্মসম্পাদন, সমস্যা সমাধান এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও অর্জনের জন্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সমাজের সক্ষমতা।"[৫৩] এ সংজ্ঞানুসারে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে তিন-পর্যায়ের কার্যক্রম বিবেচিত হবে:

- পরিবেশ;
- সংগঠন; ও
- ব্যক্তি।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে পরিবেশ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম, যেমন: আইনগত ও নীতিগত কাঠামোসমূহ চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর বহির্ভূত অন্যান্য পরিবেশ পর্যায়ের বিবেচ্য বিষয়সমূহ, যেমন: অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইনি উপাদানগুলোও সেক্টরের সাফল্যের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। সামর্থ্য বৃদ্ধি কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সময় এগুলো বিবেচনা করতে হবে। পরিবেশ-সংক্রান্ত উপাদানগুলোর মধ্যে সুশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সংবেদনশীলতা ও দক্ষতার নীতির ভিত্তিতে আরও ভাল উন্নয়ন ফলাফল অর্জনের জন্য সুশাসনের প্রসারকে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সুনির্দিষ্টভাবে NSAPR-II (অর্থবছর ২০০৯-১১) মতে, সুশাসন প্রসারে আবশ্যক এমন ১০টি ক্ষেত্রের তালিকা সরকার চিহ্নিত করেছে। সেগুলো হলো: (১) সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সংসদীয় পদ্ধতি উন্নত করা; (২) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ; (৩) সিভিল সার্ভিস সংস্কারের মাধ্যমে জনসেবা পদ্ধতিসমূহ পুনর্গঠন ও শক্তিশালীকরণ; (৪) বিশেষতঃ দরিদ্র, নারী ও অন্যান্য নাজুক জনগোষ্ঠীর জন্য আইনি ও বিচারিক ব্যবস্থার সংস্কারসাধন; (৫) তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর (e-governance) শাসনব্যবস্থার প্রসার; (৬) দুর্নীতি দমন; (৭) মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ; (৮) সম্প্রতি প্রণীত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ভিত্তিতে তথ্যে গণ-অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ; (৯) প্রকল্প বাস্তবায়ন সামর্থ্য বৃদ্ধি; ও (১০) সেক্টরাল সুশাসন[৫৪] উন্নত করা।

[৫৩] সামর্থ্য যাচাই পদ্ধতি ব্যবহারকারী নির্দেশিকা, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), মে ২০০৭।

[৫৪] স্টেপ টুয়ার্ডস চেঞ্জ বা পরিবর্তনমুখী পদক্ষেপ: জাতীয় দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র-২ (সংশোধিত), অর্থবছর ২০০৯-১১, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ডিসেম্বর ২০০৯ এবং বাংলাদেশ কান্ট্রি সহায়তা কৌশলপত্র ২০১১-২০১৪, বিশ্বব্যাংক, আগষ্ট ২০১০।

বক্স ৫.১ সামর্থ্য বৃদ্ধির স্তরসমূহ

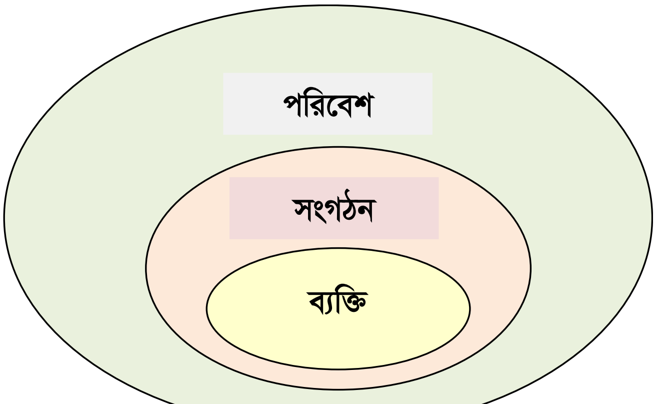

(ইউনেস্কো-সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউট, আফ্রিকা ২০০৬ কর্তৃক প্রণীত সামর্থ্য বৃদ্ধি কাঠামো থেকে নেয়া)

সক্ষমতার স্তর	সামর্থ্যের সংজ্ঞা ও উপাদানসমূহ যেগুলোর ভিত্তিতে সামর্থ্য বৃদ্ধি ঘটে
পরিবেশ	***ব্যক্তি ও সংগঠন পর্যায়ে সামর্থ্যের বহিঃপ্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও অবস্থা।*** কোন একটি প্রতিষ্ঠানের বাইরে নীতি ও কৌশলপত্রসমূহ তৈরি/বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও কাঠামো এর অন্তর্ভুক্ত। এতে পরিবেশের অনেকগুলো দিক থাকে। যেমন: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, প্রশাসনিক, আইনগত, প্রযুক্তিগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব বণ্টন। এগুলো সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টার কার্যকারিতা ও স্থায়িত্বশীলতাকে লক্ষণীয়ভাবে প্রভাবিত করে।
সংগঠন	***সংগঠনের কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করবে এমন যে কোন কিছুকে বোঝায়।*** এর মধ্যে আছে: মানবসম্পদ (সংগঠনে ব্যক্তির সামর্থ্য); ভৌতসম্পদ (সুবিধাদি, সাজ-সরঞ্জাম ও বস্তু) ও পুঁজি; বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ, ব্যবস্থাপনা, পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা (যেমন: সমস্যা সমাধান দক্ষতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও যোগাযোগ); আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ (উদাহরণস্বরূপ, নেটওয়ার্ক ও অংশীদারিত্ব); আর্থিক উৎসাহ ও পুরস্কার ব্যবস্থা; সংগঠনগত সংস্কৃতি ও নেতৃত্ব।
ব্যক্তি (বা মানবসম্পদ উন্নয়ন)	***কোন একজন ব্যক্তির নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করে উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও তা অর্জন করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা।*** ব্যক্তিগত সামর্থ্য বৃদ্ধি বলতে মানবসম্পদ উন্নয়নকে বুঝায়। এর মধ্যে জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাস্থ্য ও সচেতনতা অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন উপায়ে, যেমন: আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক ও/বা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কাজের মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এর উন্নয়ন হতে পারে।

পরের অনুচ্ছেদগুলোতে এলজিডি এবং এর অধীনস্থ সংস্থা (সরকারি ও স্থানীয় সরকার) ও ব্যক্তিগণের সামর্থ্য বৃদ্ধি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেক্টরের অন্যান্য সংস্থা, যেমন: এনজিওসমূহ ও বেসরকারি খাতের ক্ষেত্রে আশা করা যায় যে, তারা এসডিপিতে প্রদত্ত নির্দেশনা বা সুপারিশ অনুযায়ী নিজেদের সামর্থ্য বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৫.২ সংগঠন ও ব্যক্তির সামর্থ্য বৃদ্ধি

এসডিপি প্রণয়নকালে সামর্থ্য বৃদ্ধির দু'টি প্রধান নীতি বিবেচিত হয়, যথা: (ক) সংগঠনসমূহ কর্তৃক মালিকানার গুরুত্বকে জোরালো করা; ও খ) সামর্থ্য বৃদ্ধিকে দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া[৫৫] হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া। তদানুযায়ী, সেক্টরের প্রধান সংস্থাগুলোর সাথে নিবিড় পরামর্শমূলক আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যত ভূমিকা, দায়-দায়িত্ব এবং সামর্থ্য বৃদ্ধির চাহিদা সম্পর্কে সমঝোতা হয় (পরিশিষ্ট ৬-এ সেক্টর সংস্থাগুলোর সমঝোতা বিবৃতিতে বিস্তারিত দেখুন)। পরের অনুচ্ছেদগুলোতে স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহ (সরকারি ও স্থানীয় সরকার) ও ব্যক্তিগণের সামর্থ্য বৃদ্ধি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

[৫৫] ইউনেস্কো-সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউট, আফ্রিকা ২০০৬।

৫.২.১ সরকারি সংস্থাগুলোর সাংগঠনিক কাঠামো

সেক্টরকে নীতি-নির্দেশনা দেয়ার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) সার্বিকভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এলজিডি তার অধীনস্থ সংস্থাগুলোর মাধ্যমে নীতিমালা, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়নও পরিবীক্ষণ করে থাকে।

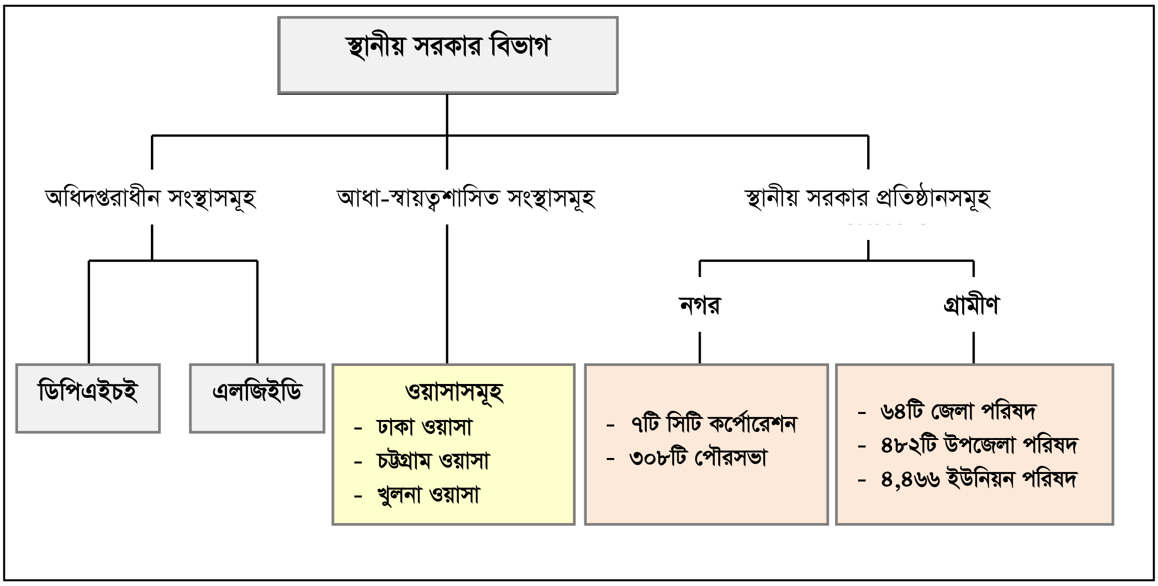

চিত্র ৫.১: স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর অধীনস্থ সংস্থাগুলোর সাংগঠনিক কাঠামো

এলজিডি'র অধীনে তিন ধরণের সংস্থা আছে, যথা: (১) ডিপিএইচই ও এলজিইডি সমন্বয়ে অধিদপ্তরাধীন সংস্থাসমূহ (line agencies); (২) আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহ, যেমন: তিনটি ওয়াসা; এবং (৩) গ্রামীণ ও নগরাঞ্চলের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ। পানি ও স্যানিটেশনে জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে ডিপিএইচই নগর ও গ্রামাঞ্চলে সম্পৃক্ত। ওয়াসাসমূহ, নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে (সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ) ও এলজিইডি নগরাঞ্চলে কাজ করে। ৭টি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা সিটি কর্পোরেশনগুলো পানি ও স্যানিটেশনের কাজ দেখে না। কারণ এসব নগরীতে ওয়াসা আছে। সম্প্রতি রাজশাহী নগরীতেও ওয়াসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাম এলাকায় সহায়তা যোগান দেয় (মূলতঃ উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ, বর্তমানে জেলা পরিষদ কার্যকর নেই)।

৫.২.২ স্থানীয় সরকার বিভাগ (LGD)

কাঠামো ও কর্মকাণ্ড

সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, আর্থিক সমাবেশ ও বরাদ্দসহ অনেকগুলো কাজ করে থাকে এলজিডি। সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কার্যকর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নির্দেশিকাসমূহ ও কার্যবিধি প্রণয়নের পাশাপাশি সেগুলোর বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এলজিডি'র গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অধিকন্তু, এলজিডি নীতিগত সিদ্ধান্ত, সেক্টর বরাদ্দ ও তহবিল সংস্থানের কাজগুলোতে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে মতবিনিময় করে। এছাড়াও মতবিনিময় হয় প্রকল্প প্রাক-মূল্যায়ন (appraisal), অনুমোদন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে। এটি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর কর্মসূচির জন্য সম্পদ সমাবেশে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ERD) মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমঝোতা করে। একজন সচিবের নেতৃত্বে চারটি অনুবিভাগের মাধ্যমে এলজিডি পরিচালিত হয়। প্রতিটি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একজন যুগ্ম-সচিব। অনুবিভাগগুলোর অধীনস্থ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নরূপ:

- প্রশাসনিক অনুবিভাগ: প্রশাসন ও অডিট এবং জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ;
- উন্নয়ন অনুবিভাগ: সিটি কর্পোরেশনসমূহ, পৌরসভাসমূহ ও এলজিইডি;
- পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও পরিদর্শন অনুবিভাগ; এবং
- পানি সরবরাহ অনুবিভাগ: ডিপিএইচই, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী ওয়াসাসমূহ।

একজন প্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বে PSU পানি সরবরাহ অনুবিভাগের অধীনে ন্যস্ত। এটি বর্তমানে প্রকল্প হিসেবে পরিচালিত (ডানিডা'র আর্থিক সহায়তায়) হচ্ছে। এলজিডি ২০১৪ সনের মধ্যে PSUকে স্থায়ী ইউনিটরূপে অঙ্গীভূত করে নিতে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে। হাইসাওয়া'র ন্যায় উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্পও বাস্তবায়ন করছে এলজিডি। হাইসাওয়া ফাণ্ড বাংলাদেশ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত এবং একটি নিবেদিত তহবিলের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অর্থায়ন করে থাকে।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত এলজিডি'র বর্তমান ও ভবিষ্যত কার্যক্রম নিচে উল্লেখ করা হলো:

বর্তমান কর্মকাণ্ড	**ভবিষ্যত কর্মকাণ্ড**
• নীতিমালা ও কৌশলসমূহ প্রণয়ন এবং সেক্টর সমন্বয় ও পরিবীক্ষণসহ সেক্টরের সার্বিক পরিচালনা; • অধীনস্থ সংস্থা/এজেন্সি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রশাসনিক ও নীতিগত সহায়তা প্রদান।	• এনজিও ও বেসরকারি খাতসহ সেক্টর সহযোগীদের কার্যক্রমের অধিকতর সমন্বয় ও সহায়তার মাধ্যমে সার্বিক পরিচালনা অব্যাহত রাখা; • অধীনস্থ এজেন্সি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রশাসনিক ও নীতিগত সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা; • SDP বাস্তবায়নের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের কাঠামোগত উন্নয়ন পরিচালনা ও সহায়তা করা।

এলজিডি'র সামর্থ্য বৃদ্ধি পরিকল্পনা

উপর্যুক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা প্রয়োজন:

- সমঝোতা অনুযায়ী ২০১৪ সনের মধ্যে PSUকে এলজিডি'র স্থায়ী সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত করা;
- SDP বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণকে শক্তিশালীকরণ;
- সেক্টর এজেন্সিসমূহের (ডিপিএইচই, এলজিইডি ও ওয়াসাসমূহ) কাছে যতটুকু সম্ভব প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ;
- বর্তমান ও ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য সেক্টর এজেন্সিসমূহ, বিশেষ করে ডিপিএইচই'র পুনর্গঠন ও কর্মী সংস্থানে সহায়তা প্রদান; ও
- সেক্টর ওয়াইড এ্যাপ্রোচ (SWAp) শুরুর মাধ্যমে অর্থায়ন, বাস্তবায়ন, প্রতিবেদন ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসকরণ।

৫.২.৩ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE)

কাঠামো ও কর্মকাণ্ড

NPSDWSS অনুযায়ী ডিপিএইচই পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে জাতীয় ফোকাল এজেন্সি। এটি ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত গ্রামীণ ও নগর এলাকায় পানি ও স্যানিটেশন সুবিধাদির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে জড়িত। ডিপিএইচই সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করে। জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপজেলা পর্যায়ে উপ-সহকারী প্রকৌশলীর মাধ্যমে তৃণমূলের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখে

ডিপিএইচই। প্রত্যেক উপজেলায় এর চারজন করে নলকূপ মিস্ত্রিও (ম্যাকানিক) আছে। নভেম্বর ২০০৯-এর নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী, ডিপিএইচই'র মঞ্জুরিকৃত জনবল হচ্ছে ৭,০৫২ জন। এর মধ্যে ৪৪৪ জন প্রথম শ্রেণীর প্রকৌশলী, ৬৫২ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রকৌশলী (উপ-সহকারী প্রকৌশলী)। মঞ্জুরিকৃত পদের মধ্যে ২৪২ জন প্রথম শ্রেণীর প্রকৌশলীসহ (সহকারী প্রকৌশলী) সম্প্রতি অনুমোদিত (নতুন অর্গানোগ্রাম) ৩৬৩ জন নতুন কর্মীও আছে। একজন সহকারী প্রকৌশলী দু'টি বা তিনটি উপজেলার দায়িত্বে থাকবেন। নতুন কর্মী নিয়োগ এখনো প্রক্রিয়াধীন হলেও, সাম্প্রতিক জনবল বৃদ্ধি ডিপিএইচই'র মাঠ পর্যায়ের শক্তিকে জোরদার করতে সক্ষম হবে।

ডিপিএইচই'র বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ডসমূহ:

বর্তমান কর্মকাণ্ড	ভবিষ্যত কর্মকাণ্ড
জাতীয় • নিরাপদ পানির উৎসের জন্য পানি ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ; • এটি সীমিতভাবে পানির মান পরিবীক্ষণ এবং উপযোগী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রযুক্তির জন্য R&D কার্যক্রম পরিচালনা করে।	**জাতীয়** • নিরাপদ পানির উৎসের জন্য পানি ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা; • ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর, পানির মান পরিবীক্ষণ ও পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনাসহ জাতীয় পানির মান পরিবীক্ষণ ও সার্ভিলেন্স করা, R&D কার্যক্রম শক্তিশালী করা এবং জনসচেতনতামূলক প্রচার কাজ চালানো; • স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পরামর্শক্রমে কৌশলগতভাবে দুর্গম এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন; • জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন তথ্যভান্ডার হালনাগাদকরণ ও সংরক্ষণ; • এলজিডি'র পক্ষে ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ উৎসের পানি ব্যবহারে পরামর্শ প্রদান ও পরিবীক্ষণ।
নগর • স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যৌথভাবে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন।	**নগর** • পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে এবং পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনাসহ ব্যবস্থাদি দক্ষভাবে পরিচালনায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা প্রদান; • সেবার মান নির্ধারণে ও সেবার স্তর পরিবীক্ষণে এলজিডি/নিয়ামক সংস্থাকে সহায়তা করা।
গ্রামীণ • ইউনিয়ন পরিষদের পরামর্শক্রমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন	**গ্রামীণ** • ইউনিয়ন পরিষদের পরামর্শক্রমে কেবলমাত্র দুর্গম এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন; • জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শক্রমে স্কীম প্রণয়ন ও এ্যাপ্রেইজিং-এর মত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত কাজগুলোতে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান; • উন্নত স্যানিটেশন ও পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার মত সেবাসমূহের মান উন্নয়নে সহায়তা দেয়া; • ব্যবসা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি নির্বাচনে কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি খাত ও ব্যক্তিগণকে সহায়তা করা ।

নেতৃস্থানীয় সেক্টর এজেন্সি হিসেবে, সেক্টরের টেকসই উন্নয়নে ডিপিএইচই'র সাংগঠনিক শক্তি মুখ্য বিষয়। ২০০৯ সনে অনুমোদিত ডিপিএইচই'র সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনায় নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে পুনরোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে:

- নতুন কাঠামোটি পুরাতনটিরই অধিকতর বর্ধিত সংস্করণ মাত্র। বিগত চার দশক ধরে ব্যাপক গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচিকে সহায়তা প্রদানের জন্য এটি পর্যায়ক্রমে গড়ে তোলা হয়েছিল। নতুন কাঠামোটি নগর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচির (যেমন, নগর সেবা ব্যবস্থাপনা) বিদ্যমান ও ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় কর্মী সংস্থান ও দক্ষতার বিষয়ে পর্যাপ্ত দৃষ্টি দেয় নি;
- অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পানিসম্পদ) ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নকশা)-এর নতুন পদে নিয়োগের সাথে সাথে সদর দপ্তরের পরিকল্পনা ও অনুসন্ধান সামর্থ্য বেড়েছে। কিন্তু, নতুন অর্গানোগ্রামে R&D বিভাগকে শক্তিশালী না করে বরং বাদ দেয়াটা একটি গুরুতর ত্রুটি;
- পুরানোটির মত নতুন কাঠামো "সিভিল ইঞ্জিনিয়ার" আধিক্য নির্ভর। অন্য বিষয়জ্ঞান থেকে (discipline) খুবই সীমিত সংখ্যক কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (যেমনঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিকল্পনা সার্কেলের অধীনে একটি উর্ধ্বতন সামাজিক উন্নয়ন কর্মকর্তা, তিনটি সামাজিক উন্নয়ন কর্মকর্তা ও দু'টি সহকারী (?) মহিলা উন্নয়ন কর্মকর্তা)। কাজের পরিধি ও পদ্ধতি বিষয়ে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য অর্থনীতিবিদ ও হাইজিন বিশেষজ্ঞের মত পদগুলো সমন্বয়ে বহুমুখী বিষয়ভিত্তিক দল গঠনের উদ্দেশ্যটি কার্যত হারিয়ে গেছে; এবং
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও পানির মান বিশ্লেষণ কাঠামো এবং পদগুলো আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

ডিপিএইচই ও এর কর্মীদের সামর্থ্য বৃদ্ধি পরিকল্পনা

উপর্যুক্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেয়া প্রয়োজনঃ

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশেষতঃ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাকে সহায়তা দিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ডিপিএইচই'র সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করা। নতুনভাবে অনুমোদিত সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নগর পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে;
- বিবেচিত নতুন কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার স্বার্থে বিদ্যমান কর্মীদের পর্যায়ক্রমিকভাবে পুনর্নিয়োগ দান। মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের অধিকতর প্রচারণামূলক কাজে সম্পৃক্ত করতে তাঁদের দায়িত্ব সনদ (charter) সংশোধন করা। যেমনঃ মেকানিকদের পদবী ও দায়িত্ব পরিবর্তন করে ডব্লিউএসএস মোটিভেটর রাখা যেতে পারে;
- কৌশলপত্র মতে, ২০১৫ সন থেকে প্রত্যক্ষভাবে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয়া। কিন্তু, ২০২০ সন পর্যন্ত গ্রামীণ পাইপবাহিত পানি, আর্সেনিক দূষণ, পানি দুষ্প্রাপ্য ও বন্যা প্রবণ এবং কৌশলগত দুর্গম এলাকায় স্যানিটেশন, ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- দক্ষতার সাথে দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা, পদ্ধতি ও কার্যবিধি প্রণয়ন করা; এবং
- সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নিজস্ব সামর্থ্য উন্নয়নে একটি সমন্বিত মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ। এর মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা প্রদান ও সামর্থ্য বৃদ্ধিও অন্তর্ভুক্ত। এতোদুদ্দেশ্যে নবসৃষ্ট মানবসম্পদ উন্নয়ন সার্কেলটি কার্যকর হতে পারে।

৫.২.৪ পানি সরবরাহ ও পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (WASAs)

কাঠামো ও কর্মকাণ্ড

বৃহৎ নগরীগুলোর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাসুবিধার চাহিদা মেটাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ, ১৯৬৩ বলে ঢাকা ও চট্টগ্রাম নগরীতে প্রথম ওয়াসা প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল সংস্থাগুলো ভিন্ন আইনে পরিচালিত করা। কারণ, বাণিজ্যিক অনুশীলন অনুসারী সেবাদান প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার জন্য সরকারি আইন নমনীয় বিবেচিত হয়নি। যাহোক, এগুলোর ব্যবস্থাপনায় ছিল সরকার নিয়ুক্ত কর্মকর্তাগণ। এরা প্রধানতঃ সরকারি বিধি ও প্রবিধানমালা অনুযায়ী কাজ করতো। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রত্যাশিত বাণিজ্যিক দক্ষতা অর্জিত হয়নি। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার প্রনিধিত্বকারী সদস্য সমন্বয়ে গঠিত বোর্ডের মাধ্যমে ওয়াসাকে পরিচালনায় অধিকতর স্বায়ত্তশাসন দিতে ওয়াসা আইন, ১৯৯৬ পাস করা হয়। এখন পর্যন্ত উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা,

অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ বাণিজ্যিক নির্দেশনা ও শর্তাবলীর ভিত্তিতে সংস্থার বাইরে থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। সরকারি কর্মীদের বেতন কাঠামো অনুযায়ী নির্ধারিত হয় অন্যান্য স্তরের কর্মীদের বেতন ও সুবিধাদি। এতে ভালো কাজের জন্য কোন প্রকার আর্থিক উৎসাহমূলক প্রণোদনা নেই। ২০০৮ সনে খুলনা ওয়াসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকার ২০১০ সনে রাজশাহীতেও একটি ওয়াসা গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। কিন্তু, এটি এখন কার্যকর হবার অপেক্ষায়।

ওয়াসাসমূহের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রধান প্রধান দায়-দায়িত্ব নিম্নরূপ:

বর্তমান কর্মকাণ্ড	**ভবিষ্যত কর্মকাণ্ড**
• ওয়াসাসমূহ পরিচালনা করা, যেখানে কারিগরি ও আর্থিক বিষয়গুলোর উন্নয়ন প্রয়োজন।	• এলজিডি/পানি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত এবং সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিবীক্ষিত সেবার গুণ ও মানদণ্ড অনুযায়ী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদান; • গ্রাহক সেবা (customer care) ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সেবা নিশ্চিত করা; • উত্তম কারিগরি ও বাণিজ্যিক অনুশীলন অনুসরণ করে পানি সরবরাহ শাখা (কনজারভেন্সি শাখাও) পরিচালনা করা; ও • কিছু সেবা প্রদানে বেসরকারি খাত ও এনজিওদের সহযোগী করা।

ওয়াসাসমূহ ও তাদের কর্মীদের জন্য সামর্থ্য-বৃদ্ধি পরিকল্পনা

বাংলাদেশ সরকার ও কিছু উন্নয়ন সহযোগী ইতোমধ্যে সম্মত বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও কর্ম-পরিকল্পনাসহ একটি অংশীদারিত্বমূলক কর্ম-কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এছাড়াও কর্ম-পরিকল্পনায় ওয়াসাগুলোর সাংগঠনিক কাঠামো, কারিগরী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত। সম্মত কর্মকাণ্ডসমূহ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে সময়-কাঠামোসহ একটি নীতি কাঠামোও (policy matrix) তৈরি করা হয়েছে। এতদপ্রেক্ষিতে সম্মত অংশীদারিত্বমূলক কর্ম-কাঠামো বাস্তবায়নের (বা অনুসরণের) সুপারিশ করা হচ্ছে।

৫.২.৫ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা

কাঠামো ও কর্মকাণ্ড

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার অন্যতম বাধ্যতামূলক দায়িত্ব। অতীতে, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প এককভাবে ডিপিএইচই কর্তৃক বাস্তবায়িত হতো। কিন্তু, পর্যায়ক্রমে বেশি বেশি দায়িত্বসমূহ হস্তান্তরের কারণে পন্থার পরিবর্তন হয়েছে এবং প্রকল্পগুলো যৌথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ডিপিএইচই পরিশোধন প্লান্ট, উৎপাদন নলকূপ ও সঞ্চালন লাইনের মত তুলনামূলকভাবে অধিকতর উচ্চমার্গের (sophisticated) কারিগরী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। অন্যদিকে, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ পাইপড্ নেটওয়ার্ক বাস্তবায়ন করে। এলজিইডিও দাতা সহায়তাপুষ্ট কিছু নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ডিপিএইচই'র মত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। পদ্ধতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর দায়িত্ব। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার পানি সরবরাহ শাখা কর্তৃক পানি সরবরাহ এবং কনজারভেন্সি শাখা কর্তৃক স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উভয় শাখাই প্রকৌশল বিভাগের অধীনে কাজ করে।

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা সংক্রান্ত স্থানীয় সরকার আইন তাদেরকে কর্মী নিয়োগ ও পানির শুল্ক নির্ধারণের ক্ষমতা দিয়েছে (অনুচ্ছেদ ৪.১ দ্রষ্টব্য)। অথচ হয় এলজিডি'র অনুমোদনের প্রয়োজনে অথবা নিজেদের উদাসীনতার কারণে এ ক্ষমতা পুরোপুরি প্রয়োগ হয় না।

কার্যকর সেবা প্রদান ও এর স্থায়িত্বশীলতার ক্ষেত্রে প্রধান উদ্বেগের বিষয় হলো পানি শাখাসমূহের কাজে স্বায়ত্ত্বশাসনের অনুপস্থিতি ও তাদের নিম্নসামর্থ্য (অনুচ্ছেদ ২.৫ দেখুন)। আকারে যে যত বেশি ছোট, তার তত বেশি সামর্থ্য বৃদ্ধির সহায়তা প্রয়োজন।

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের বিদ্যমান ও ভবিষ্যত প্রধান প্রধান দায়-দায়িত্ব নিম্নরূপঃ

বর্তমান কর্মকাণ্ড	ভবিষ্যত কর্মকাণ্ড
• ডিপিএইচই'র সাথে যৌথভাবে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন; ও • পদ্ধতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	• এলজিডি/পানি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সেবার গুণ ও মানদণ্ড অনুযায়ী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদান; • গ্রাহক সেবা (customer care) ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সেবা নিশ্চিত করা; • উত্তম কারিগরি ও বাণিজ্যিক চর্চা অনুসরণ করে পানি সরবরাহ শাখা পরিচালনা করা; • কিছু সেবা প্রদানে বেসরকারি খাত ও এনজিওদের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এবং তাদের কর্মীদের সামর্থ্য-বৃদ্ধি পরিকল্পনা

উপর্যুক্ত কর্মকাণ্ডসমূহ সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনঃ

- পানি সরবরাহ শাখার কাজে নির্দিষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় হয় একটি স্বায়ত্ত্বশাসিত পানি শাখা অথবা শাখাটির পরিচালনা তত্ত্বাবধান করতে বাইরের প্রতিনিধি সমন্বয়ে অন্ততঃপক্ষে একটি তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এটা করা যেতে পারে। এই পানি সরবরাহ শাখার কার্যাবলী যে কোন ধরণের গুণমানের সেবাচুক্তির মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করা উচিত;
- প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার পানি ও স্যানিটেশন শাখার কর্মী পদায়ন ও নিয়োগদান সম্পর্কিত প্রবিধানমালা (স্থানীয় সরকার আইন, ২০০৯-এর আওতায়) অনুমোদন করা;
- কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং উন্নত পদ্ধতি ও নিয়মকানুন প্রবর্তনের মাধ্যমে কার্যপ্রণালী ও হিসাব ব্যবস্থাপনা উন্নত করা;
- TLCC ও ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদেরকে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কাজে সম্পৃক্ত করা;
- কারিগরী সহায়তা, পানির গুণাগুণ ও সেবার মানদণ্ড নির্ধারণ এবং পরিবীক্ষণের জন্য ডিপিএইচই ও অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতা করা; এবং
- সভা আয়োজন, কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ওয়াটসান কমিটিগুলোকে কার্যকর করা।

৫.২.৬ ইউনিয়ন পরিষদ

কাঠামো ও কর্মকাণ্ড

জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার অঙ্গীকারের ভিত্তিতে সরকার স্থানীয় সরকারগুলো, বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদকে ক্ষমতায়ন ও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা নিয়েছে। সরকার বিভিন্ন উপায়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণকে এগিয়ে নিচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: (ক) স্থানীয় সরকারগুলোর সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ সমাবেশের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক কর্তৃত্ব ও উৎসাহ প্রদান; (খ) স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা; ও (গ) স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও/জনগোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠনগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা এবং স্থানীয় জনগণের কাছে তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।[৫৬]

স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘসময়ব্যাপী সক্রিয় একমাত্র স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। অথচ, অন্যান্য স্তরগুলো কখনও কখনও বিলুপ্ত ছিল অথবা পুরোপুরি কার্যকর ছিল না। ফলে বিভিন্ন জাতীয় ও উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তাপুষ্ট পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সরকারের সামর্থ্য বৃদ্ধি প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সবার দৃষ্টি এখন ইউনিয়ন পরিষদের দিকে।

এ জাতীয় কিছু ভালো উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম হলো: (ক) হাইসাওয়া ফান্ড, বিকেন্দ্রীকৃত গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানের নতুন একটি ধারণাকে (বক্স ৫.২ দেখুন) সহায়তা করে; (খ) ব্র্যাক-এর ওয়াশ কর্মসূচি, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এটি ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম ওয়াশ কমিটি ও স্থানীয় উদ্যোক্তাদেরকে সক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়তা প্রদান করে; (গ) বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা উন্নত করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এলজিডি'র আওতায় প্রতিষ্ঠিত আনুভূমিক শিখন কর্মসূচি (হরাইজন্টাল লার্নিং প্রোগ্রাম বা HLP)। এটি জুটিতে শিখন পদ্ধতি, যা ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে (বক্স ৫.৩ দেখুন) শ্রেষ্ঠ অনুশীলন ও পরিচালনাগত উন্নয়ন বিষয়ে আলোকপাত করে; ও (ঘ) সামাজিক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)-এর সামাজিক বিনিয়োগ কর্মসূচি। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এটি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন চাহিদার অগ্রাধিকারকরণ, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদ ও জনগোষ্ঠীকে সামর্থ্য বৃদ্ধিমূলক সহায়তা প্রদান করে। এসব প্রকল্পের বাইরেও আছে এলজিডি'র লোকাল গভার্নেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (LGSP)। ইউনিয়ন পরিষদের পরিকল্পনা, বাজেটিং ও সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সার্বিক সামর্থ্য বৃদ্ধিমূলক প্রকল্পটি গুরুত্ব পেয়েছে। অধিকন্তু, সরকার ও দাতাগোষ্ঠী উভয়েরই অর্থায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের আওতায় এলজিডি'র অধীন জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (NILG) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সামর্থ্য বৃদ্ধি সহায়তা দিয়ে থাকে। স্থানীয় শাসনের ভিন্ন ব্যবস্থা থাকায় পার্বত্য চট্টগ্রামে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনে (বক্স ৫.৪ দেখুন) জনগোষ্ঠীগুলো সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত।

[৫৬] স্টেপ টুয়ার্ডস চেঞ্জ বা পরিবর্তনের পদক্ষেপ: জাতীয় দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র ২ (সংশোধিত), অর্থ বছর ২০০৯-১১, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ডিসেম্বর ২০০৯।

বক্স ৫.২: হাইসাওয়া ফান্ড: বিকেন্দ্রীকৃত গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানের একটি নতুন ধারণা

গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনে ইউনিয়ন পরিষদ মুখ্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু, গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে এগুলোর নেতৃত্ব ও সক্ষমতা পুরোপুরি বিকশিত হয়নি। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়তা দিতে ডানিডা'র সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকার হাইসাওয়া ফান্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। একইসাথে গ্রামাঞ্চলে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজ উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে তহবিল সহায়তাও দেয়া হচ্ছে।

হাইসাওয়া ফান্ড

হাইসাওয়া ফান্ড ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে নিবন্ধিত একটি কোম্পানির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত একটি পর্ষদ তহবিলটি পরিচালনা করে। একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ফান্ড ব্যবস্থাপনা অফিস তহবিলের প্রশাসন ও দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা নির্বাহ করে। এটি একটি বাস্কেট ফান্ড, যাতে বাংলাদেশ সরকার ও দাতা সংস্থাসমূহের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে তহবিলে বাংলাদেশ সরকার, ডানিডা ও অস্ট্রেলীয় সরকার অর্থায়ন করছে।

একটি স্বাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে হাইসাওয়া ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা ছিল খুবই চ্যালেঞ্জিং কাজ। বর্তমানে দু'টি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এর একটি হলো অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এবং অন্যটি "স্বাভাবিক ব্যবসা" থেকে স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ চাহিদা-তাড়িত ধারণার ক্ষেত্রে Paradigm shift।

বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি

বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো হাইজিন, স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে হস্তান্তর করা। স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়নের চাবিকাঠি হলো তহবিলের সাথে সরাসরি যোগসূত্র স্থাপন। সক্ষমতা বৃদ্ধির উপাদানের সাথে এ যোগসূত্র স্থানীয় সরকারের কাছে ব্যাপক প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা হস্তান্তরকে এগিয়ে নেবে।

নতুন এ পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্ন-উর্ধ্ব (bottom-up) পরিকল্পনা পন্থা বাস্তবায়িত হচ্ছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী নিজেদের চাহিদা ও আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী হাইজিন, স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ কার্যক্রমে নিজেরাই প্রকল্প পরিকল্পনা করছে। সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য তারা ইউনিয়ন পরিষদে পাঠায়। হাইসাওয়া প্রকল্প সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা দিয়ে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তার জন্য বেসরকারি খাতের ব্যবস্থাপনা/প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান ও এনজিও নিয়োগ দেয়া হয়। মানবাধিকার, জেণ্ডার, সংস্কৃতি, উন্নয়ন ও স্বচ্ছতার মত পরস্পর-সম্পর্কিত (cross-cutting) বিষয়সমূহ প্রকল্প প্রণয়ন ও সম্পদ সমাবেশকরণ প্রক্রিয়ারই অংশ। এগুলো বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত। প্রকল্প কার্যক্রমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য জনগোষ্ঠীকে উৎসাহ ও সহায়তা দেয়া হয়।

ফলাফল

যদিও হাইসাওয়া প্রকল্পটি পরীক্ষামূলকভাবে কিছু নির্ধারিত এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে, সারাদেশে ছড়িয়ে দেবার জন্য এর ফলাফল আশাব্যঞ্জক। ২০১০ সনের মধ্যে প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২০,০০০ নলকূপ স্থাপিত হয়েছে। এতে প্রায় ১৩ লক্ষ মানুষের নিরাপদ পানির অধিকার নিশ্চিত হবে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষই হচ্ছে দরিদ্র ও হতদরিদ্র শ্রেণীর। এছাড়াও প্রকল্প এলাকায় প্রচারণা কার্যক্রমের প্রভাবে প্রায় ৩,৫০,০০০টি পরিবার স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

হাইসাওয়া ফান্ড ইউনিয়ন পরিষদকে প্রত্যক্ষ ও কার্যকর সহায়তা প্রদানে এর গুরুত্ব প্রমাণ করেছে। সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে ইউনিয়ন পরিষদকে ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের ভূমিকা এবং দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেয়া হলে তা খুবই প্রতিশ্রুতিশীল হয়ে থাকে। সরকারি ক্রয়বিধি ব্যবহার করে বেশিরভাগ ইউনিয়নই এখন বেসরকারি সেবাদানকারী (এনজিও ও ঠিকাদার) নিয়োগ করতে সক্ষম। আশা করা যায়, ধারণাটি ভবিষ্যতে উন্নয়নের অন্যান্য ক্ষেত্রে একটি মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

সূত্র: হাইসাওয়া প্রকল্প ডকুমেন্ট ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন।

যদিও পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন উন্নয়নে উপজেলা পরিষদের ভূমিকা সবে শুরু হতে চলেছে। সেক্টরের উদ্ভুত চ্যালেঞ্জসমূহ থাকা সত্ত্বেও, বিশেষ করে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে বিকেন্দ্রীকরণের সরকারি প্রচেষ্টায় ধারণা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে উপজেলা পরিষদের একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা থাকবে। জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে একটি পুনর্গঠিত ও কার্যকর কাঠামো নিশ্চিত করতে সরকার সার্বিক ব্যবস্থাটি তিন থেকে চার বছরের মধ্যে পর্যালোচনা করার মনস্থ করেছে।

বক্স ৫.৩ আনুভূমিক শিখন কর্মসূচি (হরাইজন্টাল লার্নিং প্রোগ্রাম - HLP)

বাংলাদেশ সরকার-এর সঞ্চালনে ও উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় জুটিতে শিখনের একটি উদ্যোগ হলো- ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালিত আনুভূমিক শিখন কর্মসূচি বা HLP। এ কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় সরকারগুলো পরস্পরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। উদ্দেশ্য - তাদের জুটির ভালো কাজগুলো চিহ্নিত, বিনিময় ও প্রতিরূপ (replication) বাস্তবায়ন করা।

HLP'র ফলাফল

২০১০ অর্থবছরে অংশগ্রহণকারী ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ১৭টি ভালো কাজের প্রতিরূপ বাস্তবায়নের জন্য ১.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করেছিল। এ অর্থের ৯০ ভাগ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত ভালো কাজের প্রতিরূপ প্রয়োগে ব্যয় করা হয় (আর্সেনিক স্ক্রীনিং, নলকূপ সংরক্ষণ, শতভাগ স্যানিটেশন ও প্রতিবেশ-বান্ধব গ্রাম প্রতিষ্ঠা)।

HLP নীতিসমূহ

১. *প্রশংসা করা: আমাদের সহজাত মূল্যবোধ, শক্তি ও সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার সম্ভাবনাকে উপলদ্ধি করা। সীমাবদ্ধতাকে প্রায়শঃ আমরা অচেতনভাবে নিজেদের ওপর আরোপ করি।*
২. *অনুশীলন: যেগুলো ইতোমধ্যেই ক্রিয়াশীল সেগুলো নিয়ে শুরু করা এবং স্থানীয় প্রেক্ষিতে ভালো কাজকে প্রকাশ করার মাধ্যমে শিখনে সমর্থ হওয়া।*
৩. *সংযোগ স্থাপন: আমাদের জুটির সত্ত্বা থেকে আমাদেরকে আলাদা করে এবং আমাদের সম্মিলিত কল্যাণ থেকে সরিয়ে দেয় - এমন প্রভেদ ঘুচিয়ে দেয়া।*

HLP প্রক্রিয়া

- *ইউনিয়ন পরিষদকে প্রথমে তাদের ভালো কাজসমূহ (নির্দেশক সহ) চিহ্নিত করতে উৎসাহিত করা হয়। সেগুলো পরে সহযোগী সংস্থা ও ইউনিয়ন পরিষদ বৈধতা প্রদান করে।*
- *সদস্য ইউনিয়ন পরিষদগুলো পরিদর্শন করতে চায় এমন ভালো কাজগুলো নির্বাচন করে এবং পরে তাদের সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রশংসামূলক অনুসন্ধানের মাধ্যমে সেগুলো সম্পর্কে জানে।*
- *এরপরে ইউনিয়ন পরিষদগুলো এসব ভালো কাজের অগ্রাধিকারক্রম তৈরি, নাগরিকদের সাথে আলোচনা ও নিজেদের বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেটে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করে।*
- *নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নিজেদের জুটির সহায়তায় ভালো কাজের প্রতিরূপ বাস্তবায়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদগুলো তাদের নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে।*

সূত্র: পানি ও স্যানিটেশন কর্মসূচি, বিশ্বব্যাংক, ঢাকা।

ইউনিয়ন পরিষদের সার্বিক ম্যান্ডেট পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যদিও স্থানীয় সরকারের কর্মকাণ্ড অনেক বিস্তৃত। অথচ সকল উদ্দেশ্য সাধনে ইউনিয়ন পরিষদে একজন মাত্র সচিব নিযুক্ত আছেন। ইউনিয়ন পরিষদ বার্ষিক থোক বরাদ্দ পায় উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে। কর ও ফীস আদায়ের মাধ্যমেও তারা স্বল্প পরিমাণ রাজস্ব আয় করে, যেমন: ভূমি হস্তান্তর কর ও রেজিস্ট্রেশন ফি এবং হাট-বাজার, জলাশয় ও ফেরীঘাট ইজারা, ইত্যাদি।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯-এর আওতায় জনকল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে ১৩টি স্থায়ী কমিটি গঠনের ব্যবস্থা আছে। ডিপিএইচই'র বিভিন্ন প্রকল্পে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাসুবিধার কাজে ইউনিয়ন পরিষদকে জড়িত করার লক্ষ্যে ১৯৯৪ সনে ওয়াটসান কমিটি গঠিত হয়েছে। এছাড়াও ১৯৯৮ সনে গঠিত হয়ে নলকূপের স্থান নির্বাচন কমিটি ও ২০০০ সনে গঠিত হয় ইউনিয়ন আর্সেনিক কমিটি।

ইউনিয়ন পরিষদ একটি দুর্বল প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার কারণ হচ্ছে এর কর্মী-স্বল্পতা, স্ব-শাসনের অভাব, অপর্যাপ্ত অর্থ-সম্পদ ও যথাযথ প্রশাসনিক সহায়তার অনুপস্থিতি। তারা গ্রামীণ মানুষের কাছাকাছি একটি প্রতিষ্ঠান এবং তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব আছে। অথচ, তাদের সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে জাগরিত করা হয়নি।

বক্স ৫.৪ পার্বত্র চট্টগ্রামে জনগোষ্ঠী ব্যবস্থাপনায় পাইপবাহিত পানি সরবরাহ স্কীম: অন্যত্র উন্নয়নের জন্য একটি ভালো মডেল

বান্দরবান সদর উপজেলার লাইমিপাড়া গ্রামের মানুষেরা ২০০৭ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশন-এর সহযোগিতায় একটি পাড়া (Neighborhood) কমিটি গঠন করে। তাঁরা মূলতঃ ব্যোম নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত। ৭২টি পরিবার সমন্বয়ে ১২ সদস্যের কমিটি গঠিত হয়। কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনসহ সমাজ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা। নিরাপদ ও পর্যাপ্ত খাবার পানির ক্ষেত্রে অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে পাড়া কমিটির অধীনে একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়েছিল।

স্থানীয় কারবারি (পাড়া/ওয়ার্ড পর্যায়ের সর্বনিম্ন স্তর - পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজতন্ত্রের উত্তরাধিকার), যিনি পাড়া কমিটিরও চেয়ারপার্সন বলেন, "আমাদের সম্মিলিত চাহিদার ভিত্তিতে কমিউনিটির সকল মানুষকে সম্পৃক্ত করে নিজেদের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য আমরা একটি বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করি। আমাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতি বছর তিনশত টাকা চাঁদা দিতে কমিউনিটির সকল পরিবার সিদ্ধান্ত নেয়। হিসাব সংরক্ষণ ও রেকর্ড রাখার জন্য ইতোমধ্যে আমরা একজন হিসাবরক্ষক নিয়োগ করেছি। আমাদের কমিউনিটিতে তিনটি অতি-দরিদ্র পরিবার ছিল, তাঁরা বার্ষিক চাঁদা দিতে পারছিল না। কিন্তু তাঁরাও কর্মসূচির সুফল পাবে।"

পাহাড়ের পাদদেশে পাড়ায় তাদের মাত্র একটি বা দু'টি নলকূপ থাকায় বিদ্যমান খাবার পানিসংকট নিরসনে কমিউনিটিতে একটি পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করার জন্য তারা অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতো। কমিউনিটি নেতারা এনজিও'র (ওয়ার্ল্ড ভিশন) সাথে আলোচনা করে এবং একটি পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপনে চুক্তিতে উপনীত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে, এনজিও নির্মাণ সামগ্রী (পাইপ, ফিটিংস ও ইট) যোগান দেয় এবং কমিটি পাইপলাইন স্থাপন, প্রয়োজন অনুযায়ী জলাধার ও চেম্বার নির্মাণ করে। এটা করতে, চেয়ারপার্সন আরো জানায়, "পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্মাণে ২-৩ মাস লেগেছে এবং প্রতি পরিবার থেকে একজন আবর্তনক্রমে মাসে ৩-৪ দিন কাজ করেছে।" পানির উৎস ছিল একটি পাহাড়ি ঝরণা/ফাউন্টেন, যা গ্রাভিটি ফ্লো'র মাধ্যমে পাইপলাইনে সরবরাহ করা হয়। পাহাড়ের চূড়ায় অনেক জায়গায় জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেখান থেকে স্বতন্ত্র পরিবারে পানি যায়। তারা ওয়ার্ল্ড ভিশনের উপকরণ সহায়তায় সকল পরিবারে পায়খানা তৈরি করেছে। তারা এখন পায়খানায় পানি সরবরাহ করার বিষয় ভাবছে।

কমিউনিটি যৌথভাবে উত্তোলিত তহবিল হতে পদ্ধতি পরিচালনা ও সংরক্ষণ ব্যয়ের পুরোটাই বহন করে। চেয়ারপার্সন সিদ্ধান্ত টানেন, "গত ৩ বছর যাবত আমাদের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত আছে। এখন আমরা সুবিধাদি নিয়ে বেশ সুখী। এটা আমাদের সামাজিক কল্যাণে সকল সম্পদ সমাবেশ করার ও একইভাবে আমাদের ঐক্য বজায় রাখার পথ দেখিয়েছে।"

সূত্র: ২১ মার্চ ২০১০ তারিখের পরিদর্শন (জনাব ওবায়দুল কবীর ও জনাব মো: জাকারিয়া কর্তৃক প্রণীত ফিল্ড নোট থেকে জনাব আবুল কাশেম কর্তৃক সম্পাদিত)।

ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মকাণ্ড নিচে উল্লেখ করা হলো:

বর্তমান কর্মকাণ্ড	ভবিষ্যত কর্মকাণ্ড
• নলকূপের স্থান নির্বাচন, থোক বরাদ্দ থেকে দরিদ্র পরিবারসমূহের জন্য পায়খানা সামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণ করা; • ওয়াটসান কমিটিকে সম্পৃক্ত করে স্যানিটেশন প্রচারণায় ও অন্যান্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা।	• ইউনিয়নের সকলের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত করা; • নকশা ও গুণমানসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন; • আর্সেনিক পরীক্ষা পরিচালনা; • সকল ক্ষেত্রে ডিপিএইচই'র কারিগরী সহায়তায় সকল

	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প সমন্বয়; ● হাইজিন প্রসার, পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ ও সার্ভিলেন্স, পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ, ইত্যাদি।

ইউনিয়ন পরিষদ ও তাদের কর্মীদের জন্য সামর্থ্য-বৃদ্ধি পরিকল্পনা

ইউনিয়ন পরিষদের সামর্থ্য বৃদ্ধি অনেকটাই সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ উদ্যোগের ওপর নির্ভরশীল, যেমনঃ আর্থিক ও কারিগরী জনবল দেয়ার বিষয়টি দীর্ঘদিনব্যাপী বিবেচনাধীন আছে। ইউনিয়ন পরিষদ কতটুকু দায়িত্ব বহন করতে পারবে সেটা নির্ভর করে এর ভবিষ্যত কাঠামো ও তাদেরকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের ওপর। যাহোক, তাদের বর্ধিত ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব পালন শুরু করার জন্য নিচের ব্যবস্থাগুলো গ্রহণের সুপারিশ করা হলোঃ

- নিজেদের উদ্যোগে বা এনজিও'র সহায়তায় গ্রাম পর্যায়ের কমিটি গঠন এবং আনুষ্ঠানিক কমিটিসমূহের সাথে সেগুলোর যোগসূত্র স্থাপন (যেমনঃ ওয়াটসান কমিটি)। একইসাথে স্থানীয় শিক্ষক ও ইমামগণকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করা। এসব কমিটি ও স্থানীয় ব্যক্তিগণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানে কার্যকর হবে;

- স্থানীয় অংশীদারিত্বমূলক মাস্টার প্ল্যান (মুখ্য পরিকল্পনা) অনুযায়ী ইউনিয়নে সরকারি এজেন্সি, এনজিও বা বেসরকারি খাত কর্তৃক গৃহীত সকল পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিনিয়োগ পরিকল্পনা অনুমোদন। এছাড়াও, তাদের অধিক্ষেত্রের মধ্যে সকল পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও ছাড়পত্র জারি করা; এবং

- কার্যপদ্ধতি উন্নত করা এবং ডিপিএইচই ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন ক্ষেত্র, যেমনঃ হিসাবরক্ষণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, শুল্ক সংগ্রহ ও সুশাসনে সামর্থ্য বৃদ্ধি।

অধ্যায় ৬

সেক্টর বিনিয়োগ পরিকল্পনা

এ অধ্যায়ে সেক্টর বিনিয়োগ পরিকল্পনা (SIP) উপস্থাপিত হয়েছে। এসডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নীতিমালা ও কৌশলসমূহ অনুযায়ী এটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ প্রাক্কলন করা হয়েছে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদের জন্য। বিনিয়োগ পরিমাণ হিসাব ও উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে গ্রামীণ ও নগর উপখাতগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়েছে বিভিন্ন ভৌগলিক ও পানি ভূ-তাত্ত্বিক পরিকল্পনা এলাকায়। প্রাক্কলন প্রস্তুতের জন্য বিবেচ্য প্রভাবকগুলোও একইসাথে উপস্থাপিত হলো। পরিকল্পনায় ভিত্তিমূল, মধ্যমান ও উচ্চ এ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উন্নয়ন দৃশ্যকল্প বিবেচিত এবং প্রতিটি দৃশ্যকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। বিভিন্ন দৃশ্যকল্পের জন্য বিভিন্ন উপখাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ পরিমাণের সংক্ষিপ্তসারসহ সারণিও উপস্থাপন করা হয়েছে অধ্যায়টিতে। সেক্টরের বিভিন্ন সহযোগী, যেমন: সরকারি খাত (উন্নয়ন সহযোগীসহ), পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন জনসেবা সংস্থাসমূহ, জনগোষ্ঠী কর্তৃক ব্যয়ভাগ বহন, ব্যক্তিগত ব্যবহারকারী পরিবার, বেসরকারি এন্টারপ্রাইজ ও এনজিওসমূহ থেকে তহবিল প্রাপ্তির উৎস উল্লেখ করা হয়েছে। পরিশেষে, স্বল্পমেয়াদে (২০১১-১৫) সরকারি খাতে বিনিয়োগ চাহিদাকে তুলনা করা হয়েছে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য সম্ভাব্য বাজেট লভ্যতার সাথে।

৬.১ ভূমিকা

এসডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নীতিমালা ও কৌশলসমূহের নিরিখে এর উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য সেক্টরের বিনিয়োগ প্রয়োজনীয়তা নির্ধারিত হয়েছে। বিনিয়োগ প্রয়োজনীয়তা স্বল্প (অর্থবছর ২০১১-১৫), মধ্য (অর্থবছর ২০১৬-২০) এবং দীর্ঘ (অর্থবছর ২০২১-২৫) মেয়াদে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

৬.১.১ পরিকল্পনার ক্ষেত্রসমূহ

নগর উপখাত ও গ্রামীণ উপখাতের জন্য আলাদা আলাদাভাবে বিনিয়োগ চাহিদা নিরূপিত। অধিকন্তু, বিভিন্ন ভৌগলিক ও পানি ভূ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যয় প্রতিফলিত করার লক্ষ্যে উপখাতসমূহকে সারণি ৬.১-এ প্রদত্ত মোট **১৯**টি পরিকল্পনা এলাকায় বিভক্ত করা হয়েছে। নগর উপখাতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য পরিকল্পনা এলাকা একই। কিন্তু, গ্রামীণ উপখাতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য পরিকল্পনা এলাকা ভিন্ন ভিন্ন।

সারণি ৬.১: বিনিয়োগ পরিকল্পনার বিবেচ্য পরিকল্পনা ক্ষেত্রসমূহ

উপখাতসমূহ	পরিকল্পনা ক্ষেত্রসমূহ
নগর উপখাত:	
ওয়াসাসহ নগরসমূহ	***পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন***
	১. ঢাকা নগরী
	২. চট্টগ্রাম নগরী
	৩. খুলনা নগরী

সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভাসমূহ ও বর্ধিষ্ণু কেন্দ্রসমূহ (গ্রোথ সেন্টার)	*পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন* ৪. রাজশাহী নগরী ৫. বরিশাল নগরী ৬. সিলেট নগরী ৭. বৃহৎ পৌরসভাসমূহ ৮. মাঝারী ও ক্ষুদ্র পৌরসভাসমূহ ৯. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পৌরসভাসমূহ ১০. অন্যান্য এলাকার গ্রোথ সেন্টারসমূহ ১১. পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার গ্রোথ সেন্টারসমূ	
গ্রামীণ উপখাতঃ	*পানি সরবরাহ* ১২. সমতলভূমি ১৩. উপকূলীয় অঞ্চল ১৪. আর্সেনিক সমস্যাযুক্ত এলাকা ১৫. দুর্গম এলাকা (পানি) ১৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের গ্রামীণ এলাকা	*স্যানিটেশন* ১৭. সাধারণ এলাকা ১৮. দুর্গম এলাকা (স্যানিটেশন) ১৯. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের গ্রামীণ এলাকা

পদ্ধতি, মৌলিক তথ্য, অনুমান ও প্রাক্কলনসহ সেক্টর বিনিয়োগ পরিকল্পনার (SIP) বিস্তারিত পৃথক ডকুমেন্টে উপস্থাপন করা হয়েছে (কার্যপত্র বা ওয়ার্কিং ডকুমেন্ট নম্বর ১৯)।

৬.২ বিনিয়োগ প্রাক্কলনের জন্য বিবেচিত প্রভাবকসমূহ

বিভিন্ন পরিকল্পনা এলাকার জন্য বিনিয়োগ চাহিদা প্রাক্কলনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

৬.২.১ জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ

নগর ও গ্রামীণ এলাকায় জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ চিত্র ২.২-এ দেখানো হয়েছে। ১৯টি পরিকল্পনা এলাকার প্রত্যেকটির জন্য আবারও পৃথক করা হয়েছে নগর ও গ্রমীণ জনসংখ্যাকে।

৬.২.২ প্রযুক্তি বিকল্প

বিকল্প প্রযুক্তি নির্বাচন ধারাবাহিক মেয়াদসমূহে উচ্চতর স্তরের প্রগতিশীল সেবা এবং পানিস্তর নিচে নেমে যাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা বিষয়ে আলোকপাত করতে সম্ভাব্য পদক্ষেপসমূহ বিবেচনা করেছে। এখন পর্যন্ত, সেক্টরে গতানুগতিক প্রযুক্তি আধিপত্য বিস্তার করে আছে। ভবিষ্যতে অনেক এলাকায় অগ্রসর প্রযুক্তির চাহিদা বিদ্যমান। পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে তিনটি মেয়াদে নিরূপিত সেবার লক্ষ্য অর্জনে গতানুগতিক ও অগ্রসর, উভয় প্রযুক্তিই বিবেচনায় রাখা হয়েছে। পানিসম্পদ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, বিশেষভাবে সাতটি সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে অধিকতর পরিমাণে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি ব্যবহৃত হবে। ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি পরিশোধন তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল - এরূপ প্রভাবও বিবেচিত হয়েছে।

৬.২.৩ পানির গুণগত মানদণ্ড

সেবার মান ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের সাথে সাথে, পানির অধিকতর কঠোর গুণগত মানদণ্ড ব্যবহৃত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধারণা করা হচ্ছে ভবিষ্যতে খাবার পানিতে আর্সেনিকের সর্বোচ্চ গ্রহণীয় মাত্রা ৫০ পিপিবি থেকে ১০ পিপিবিতে নামিয়ে আনা হবে। এতে, বিশেষ করে বিদ্যমান প্রযুক্তি প্রতিস্থাপনের জন্য নতুন প্রযুক্তি নির্বাচনের ব্যয়-সংশ্লিষ্টতা অনেক।

৬.২.৪ সেবার একক-প্রতি মূল্য (unit cost)

সকল ব্যয় প্রাক্কলনে ২০১০-এর মূল্যস্তর ধরা হয়েছে। বিভিন্ন উপাদান ও শ্রমব্যয় বিবেচনা করে ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা এলাকার জন্য আরোপিত হয়েছে পৃথক পৃথক একক মূল্য। পরিবর্তনশীল অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন উন্নয়ন দৃশ্যকল্পের জন্যও বিবেচিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন একক মূল্য।

৬.৩ সেক্টর উন্নয়ন দৃশ্যকল্পসমূহ

এসডিপি বাস্তবায়নের ফলস্বরূপ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের প্রত্যাশিত উন্নয়নের স্তরটি প্রধানতঃ নির্ভর করবে: (১) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ, যেমন: সরকার ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক সেক্টরের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট, এসডিপিতে নির্ধারিত সেক্টরের সামর্থ্য বৃদ্ধি কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও সেক্টর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ; এবং (২) দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, বিরাজমান শাসনব্যবস্থা ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা/পরিস্থিতির প্রভাবসহ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের বাহ্যিক প্রভাবকসমূহের ওপর। তিনটি দৃশ্যকল্পের ভিত্তিতে বিনিয়োগ ব্যয় প্রাক্কলনের উদ্দেশ্যে এসব প্রভাবক বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রতিটি দৃশ্যকল্প বর্ণিত হয়েছে সেবাস্তর ও পরিচালনা দক্ষতার মত দুটি স্থিতিমাপের (parameter) ভিত্তিতে: প্রথমটি - পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাসুবিধার মান ও ব্যবহারকারীদের সুবিধার নির্দেশক; এবং দ্বিতীয়টি - প্রযুক্তি পদ্ধতির বা সেবা প্রদানকারীর পরিচালনা দক্ষতার পর্যায় নির্দেশক।

- **দৃশ্যকল্প ১ (*ভিত্তিমূল ঘটনা*)** - নিম্নমানের সেবাস্তর ও পরিচালনা দক্ষতার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বর্তমান সেক্টরের অবস্থা;
- **দৃশ্যকল্প ২ (*মধ্যমান ঘটনা*)** - মধ্যমানের সেবাস্তর ও পরিচালনা দক্ষতা;
- **দৃশ্যকল্প ৩ (*উচ্চমান ঘটনা*)** - উচ্চমানের সেবাস্তর ও উচ্চ পরিচালনা দক্ষতা।

৬.৩.১ সেবাস্তর ও পরিচালনা দক্ষতার নির্দেশক

নগর পানি সরবরাহ, নগর স্যানিটেশন, গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও গ্রামীণ স্যানিটেশনের নির্দেশকের ভিন্ন ভিন্ন সেট যথাক্রমে সারণি ৬.২, ৬.৩, ৬.৪ ও ৬.৫-এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৬.২: নগর পানি সরবরাহে সেবাস্তর ও পরিচালনা দক্ষতার নির্দেশক

দৃশ্যকল্প	সেবাস্তর নির্দেশক					পরিচালনা দক্ষতা নির্দেশক		
	পাইপবাহিত পানি সরবরাহ কভারেজ (জনসংখ্যার % হার)	সরবরাহ (ঘন্টায় প্রতিদিন)	মাথাপিছু ভোগ (লি:/দিন)	আর্সেনিকের প্রেক্ষিতে পানির গুণগত মান (মি:গ্রা:/লি:)	ব্যাকটেরিয়ার প্রেক্ষিতে পানির গুণগত মান (ব্যাকটেরিয়া/ ১০০ মি:গ্রা:)	হিসাব বহির্ভূত পানি (UfW %)	কর্মী সংস্থান (কর্মী/ ১,০০০ সংযোগ)	আদায় দক্ষতা (%)
দৃশ্যকল্প ১ (ভিত্তিমূল ঘটনা)	৪৫ - ৯৫	<৬	<৭০	০.০৫ পর্যন্ত	>১০	>৩৫	>১৩	<৭৫
দৃশ্যকল্প ২ (মধ্যমান ঘটনা)	৬০ - ১০০	১২-২৪	৭০- ১০০	০.০৫ - ০.০১	>০ -১০	২০-৩৫	১০-১৩	৭৫-৯৫
দৃশ্যকল্প ৩ (উচ্চমান ঘটনা)	৭৫ - ১০০	২৪	>১০০	<০.০১	০	<২০	<১০	>৯৫

সারণি ৬.৩: গ্রামীণ পানি সরবরাহে সেবাস্তর ও পরিচালনা দক্ষতার নির্দেশক (উৎসভিত্তিক)

দৃশ্যকল্প	সেবাস্তর নির্দেশক				পরিচালনা দক্ষতা নির্দেশক
	পানির উৎসে অভিগম্যতা (জনসংখ্যা/উৎস)	আর্সেনিকের প্রেক্ষিতে পানির গুণগত মান (মি:গ্রা:/লি:)	ব্যাকটেরিয়ার প্রেক্ষিতে পানির গুণগত মান (ব্যাকটেরিয়া/১০০ মি:গ্রা:)	পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনার নিরিখে স্যানিটারী স্কোর	অকেজো পানি উৎস (%)
দৃশ্যকল্প ১ (ভিত্তিমূল ঘটনা)	>১০০	>০.০৫	>১০	৬ - ১০	>২০%
দৃশ্যকল্প ২(মধ্যমান)	১০ - ৫০	০.০৫ -০.০১	>০ -১০	৪ - ৫	১০ - ২০%
দৃশ্যকল্প ৩ (উচ্চমান)	১০ - ২৫	<০.০১	০	০ - ৩	<১০%

সারণি ৬.৪: নগর স্যানিটেশনে সেবাস্তর ও পরিচালনা দক্ষতার নির্দেশক

দৃশ্যকল্প	সেবাস্তর নির্দেশক			পরিচালনা দক্ষতা নির্দেশক	
	ডান কলামে উল্লিখিত প্রযুক্তির কভারেজ (নগর জনসংখ্যার % হার)	ব্যবহৃত বিকল্প প্রযুক্তি	পায়খানা সুবিধার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অবস্থা	অনসাইট স্যানিটেশন থেকে গাঁদ নিরাপদভাবে ব্যবস্থিত	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় পুনরূদ্ধার
দৃশ্যকল্প ১ (ভিত্তিমূল ঘটনা)	৫০ - ৮০	পরিশোধনসহ প্রচলিত ও স্মল বোর সূয়্যার এবং নিরাপদ গাঁদমুক্তকরণসহ সেপটিক ট্যাংক ও পৌরসভা পর্যায় পর্যন্ত অপসারণ ব্যবস্থা	অস্বাস্থ্যকরভাবে পরিচালিত	নিম্ন	নিম্ন
দৃশ্যকল্প ২ (মধ্যমান ঘটনা)	৩৫ - ৯৫	পরিশোধনসহ প্রচলিত ও স্মল বোর সূয়্যার এবং নিরাপদ গাঁদমুক্তকরণসহ সেপটিক ট্যাংক ও পৌরসভা পর্যায় পর্যন্ত অপসারণ ব্যবস্থা	সহনীয়ভাবে পরিচালিত	মধ্যম	মধ্যম
দৃশ্যকল্প ৩ (উচ্চমান ঘটনা)	২০ - ১০০	পরিশোধনসহ প্রচলিত ও স্মল বোর সূয়্যার এবং নিরাপদ গাঁদমুক্তকরণসহ সেপটিক ট্যাংক ও পৌরসভা পর্যায় পর্যন্ত অপসারণ ব্যবস্থা	স্বাস্থ্যসম্মত/ ভালোভাবে পরিচালিত	উচ্চ	উচ্চ

সারণি ৬.৫ গ্রামীণ স্যানিটেশনে সেবাস্তর ও পরিচালনা দক্ষতার নির্দেশক

দৃশ্যকল্প	সেবাস্তর নির্দেশক		পরিচালনা দক্ষতা নির্দেশক
	দৃশ্যকল্প	সেবাস্তর নির্দেশক	পায়খানা সুবিধার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ অবস্থা
দৃশ্যকল্প ১ (ভিত্তিমূল ঘটনা)	< ৪০	দুই গর্ত বিশিষ্ট জলাবদ্ধ পায়খানা এবং নিরাপদে গাঁদমুক্তকরণ ও অপসারণসহ সেপটিক ট্যাংক	অস্বাস্থ্যকরভাবে পরিচালিত
দৃশ্যকল্প ২ (মধ্যমান ঘটনা)	< ৬০	দুই গর্ত বিশিষ্ট জলাবদ্ধ পায়খানা এবং নিরাপদে গাঁদমুক্তকরণ ও অপসারণসহ সেপটিক ট্যাংক	সহনীয়ভাবে পরিচালিত

দৃশ্যকল্প ৩ (উচ্চমান ঘটনা)	< ৭৫	দুই গর্ত বিশিষ্ট জলাবদ্ধ পায়খানা এবং নিরাপদে গাঁদমুক্তকরণ ও অপসারণসহ সেপটিক ট্যাংক	স্বাস্থ্যসম্মত/ভালোভাবে পরিচালিত

বিভিন্ন দৃশ্যকল্পের জন্য বিভিন্ন প্রেক্ষিতে প্রধান প্রধান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার কভারেজের বিস্তারিত চিত্র পরিশিষ্ট ৭-এ দেয়া হলো। এতে নগর ও গ্রামীণ উপখাতের প্রতিটি পরিকল্পনা এলাকার বিভাজনও সন্নিবেশিত আছে।

৬.৪ বিনিয়োগ ব্যয় (investment costs)

তিনটি দৃশ্যকল্প ও পৃথকভাবে প্রতিটি পরিকল্পনা ক্ষেত্রের জন্য ব্যয়-প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রাক্কলনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বিভিন্ন সেবাস্তর ও পরিচালনা দক্ষতা এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনার জন্য উপরোল্লিখিত প্রভাবকসমূহ বিবেচিত হয়েছে। এসডিপিতে বর্ণিত পরিকল্পনা পদ্ধতির (চিত্র ১.৩ দ্রষ্টব্য) নিরিখে তিনটি মেয়াদের প্রতিটিতে সেবাস্তর ও পরিচালনা নির্দেশকের প্রগতিশীল বৃদ্ধি গণ্য করা হয়েছে। তিনটি মেয়াদের মূল লক্ষ্য পরিশিষ্ট ৭-এ দেখানো হয়েছে। মৌলিক তথ্য, প্রক্রিয়া ও প্রাক্কলনের বিস্তারিত উপস্থাপিত হয়েছে ১৯ নম্বর কার্যপত্রে (Working Document 19)। বিভিন্ন দৃশ্যকল্পের ও পৃথক মেয়াদসমূহের জন্য বিনিয়োগ ব্যয়ের একটি সংক্ষিপ্ত সার সারণি ৬.৬-এ দেয়া হলো:

সারণি ৬.৬: বিভিন্ন উন্নয়ন দৃশ্যকল্পের জন্য প্রাক্কলিত মোট বিনিয়োগ ব্যয়

(মিলিয়ন বাংলাদেশি টাকা)

দৃশ্যকল্পসমূহ	স্বল্পমেয়াদে অর্থবছর ২০২২-১৫	মধ্যমেয়াদে অর্থবছর ২০১৬-২০	দীর্ঘমেয়াদে অর্থ বছর ২০২১-২৫	মোট অর্থ বছর ২০১১-২৫
দৃশ্যকল্প ১	২৭০,৫৪৮	৩৭৮,৪৭৪	৪৭৫,১৫৭	১,১২৪,১৭৯
দৃশ্যকল্প ২	৩৮০,৪১০	৫২৪,০২১	৫৬১,০৮৯	১,৪৬৫,৫২০
দৃশ্যকল্প ৩	৪৬৩,৫৬১	৬৩৬,০৫৫	৬৫৪,৮৩৮	১,৭৫৪,৪৫৪

(মিলিয়ন ইউএস ডলার)

দৃশ্যকল্পসমূহ	স্বল্পমেয়াদে অর্থবছর ২০২২-১৫	মধ্যমেয়াদে অর্থবছর ২০১৬-২০	দীর্ঘমেয়াদে অর্থবছর ২০২১-২৫	মোট অর্থবছর ২০১১-২৫
দৃশ্যকল্প ১	৩,৮৬৫	৫,৪০৭	৬,৭৮৮	১৬,০৬০
দৃশ্যকল্প ২	৫,৪৩৪	৭,৪৮৬	৮,০১৬	২০,৯৩৬
দৃশ্যকল্প ৩	৬,৬২২	৯,০৮৬	৯,৩৫৫	২৫,০৬৪

দৃশ্যকল্প ১ এর জন্য প্রয়োজনীয় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১,১২৪,১৭৯ মিলিয়ন বাংলাদেশি টাকা (২০,৯৩৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার)। সে তুলনায় দৃশ্যকল্প ২ ও ৩-এ যথাক্রমে ১,৪৬৫,৫২০ মিলিয়ন টাকা (২০,৯৩৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার) ও ১,৭৫৪,৪৫৪ মিলিয়ন টাকা (২৫,০৬৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার) প্রয়োজন হবে। বিভিন্ন মেয়াদ ও দৃশ্যকল্পের তুলনামূলক বিনিয়োগ চাহিদার পরিমাণ রেখচিত্র (গ্রাফ) আকারে চিত্র ৬.১-এ উপস্থাপিত হলো:

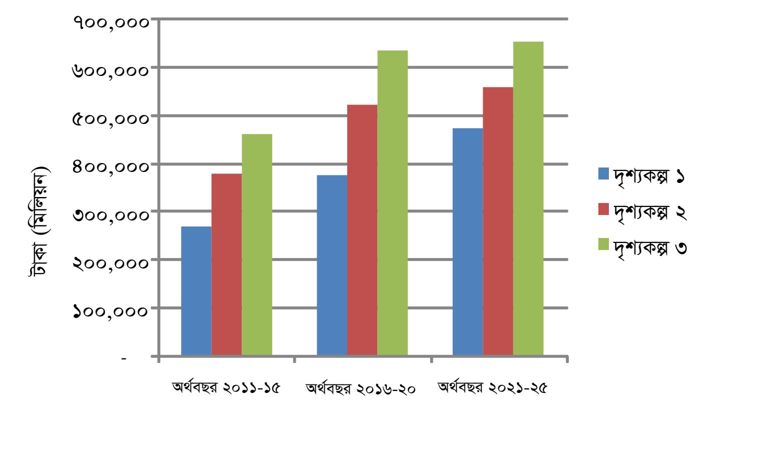

চিত্র ৬.১: স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ ব্যয়ের পরিমাণ

বৈশ্বিক ও দেশীয় অর্থনৈতিক প্রবণতা এবং সরকারের পরিকল্পিত উন্নয়ন নীতিমালা ও কৌশলসমূহ বিবেচনা করে প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের উন্নয়নের গতি বিগত সময়ের উন্নয়ন প্রবণতা থেকে উচ্চতর হবে। এর ভিত্তিতেই দৃশ্যকল্প ২ (মধ্যমান ঘটনা)কে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় গণ্য এবং সেকারণেই মেয়াদেটিতে ব্যয়ের অধিকতর প্রাক্কলন বিবেচিত হয়েছে।

৬.৪.১ ভৌত লক্ষ্যমাত্রা

আশা করা যায়, এসডিপি'র তিনটি পাঁচবছর মেয়াদে কভারেজ ও সেবাস্তর পর্যায়ক্রমে উন্নত হবে। তিনটি মেয়াদে বিভিন্ন পরিকল্পনা এলাকার জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ পরিশিষ্ট ৭-এ দেখানো এবং নিচে এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ (দৃশ্যকল্প ২) যুক্ত করা হলো।

সরকারি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্বল্পমেয়াদে পাইপবাহিত পানি সরবরাহ, নলকূপ ও অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে ১০০ ভাগ মানুষকে পানি সরবরাহ সেবা প্রদান করা হবে। তিনটি ওয়াসার বিদ্যমান পাইপবাহিত পানি সরবরাহ কভারেজ ৪০-৮৩ থেকে বেড়ে হবে ৭০-৯০ ভাগ। সিটি কর্পোরেশনগুলোতে বিদ্যমান ৪০ ভাগ পাইপবাহিত পানি সরবরাহ কভারেজ বৃদ্ধি পেয়ে ৭০-৮০ ভাগে দাঁড়াবে। বড় পৌরসভাগুলোতে বর্তমানের ৪০ থেকে উন্নীত হবে ৭০ ভাগে এবং ছোট ছোট পৌরসভাগুলোতে বিদ্যমান ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৫০ ভাগে উন্নীত করা হবে। গ্রামীণ এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বর্তমানের ন্যায়ই প্রধানতঃ নলকূপ নির্ভর-ই থাকবে, এর সাথে যুক্ত হবে কিছুটা বর্ধিত পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হলো - গ্রামাঞ্চলের মানুষের জন্য নিশ্চিত করতে হবে আর্সেনিক নিরসন প্রযুক্তি সরবরাহ। পানি সরবরাহের মত একইভাবে স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে স্যুয়ারেজ পদ্ধতি থেকে শুরু করে গর্ত পায়খানার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে ১০০ ভাগ কভারেজ। ঢাকা শহরের স্যুয়ারেজ কভারেজ বিদ্যমান ৩৫ থেকে ৫০ ভাগে উন্নীত করা এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর চট্টগ্রামে স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

মধ্যমেয়াদে, ওয়াসাভুক্ত তিনটি বড় শহরে পাইপবাহিত পানি সরবরাহ কভারেজ ১০০ ভাগ হবে। সিটি কর্পোরেশনগুলোতেও পাইপবাহিত পানি সরবরাহ কভারেজ অর্জিত হবে ১০০ ভাগ। বড় ও ছোট পৌরসভাগুলোর কভারেজ হবে যথাক্রমে ৮০ ও ৭০ ভাগ। এছাড়া ৪০ ভাগ নগরকেন্দ্রে পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। একই সময়ে ৫-১০ ভাগ গ্রামও পাইপবাহিত পানি সরবরাহের আওতায় আসবে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে স্যুয়ারেজ কভারেজ বাড়বে যথাক্রমে ৫৫ ও ১০ ভাগের মত। খুলনা ও অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনগুলোতে পরিশোধন সুবিধাসহ স্মল-বোর স্যুয়ার পদ্ধতি ও বিকেন্দ্রীকৃত স্যুয়ারেজ পরিশোধন প্ল্যান্ট-এর মত উদ্ভাবনীমূলক অফসাইট স্যানিটেশন প্রযুক্তি সীমিত আকারে প্রবর্তন করা হবে। গ্রামীণ এলাকায় ব্যবহৃত হতে দেখা যাবে বর্ধিত হারে উন্নত স্যানিটেশন পদ্ধতি, যার প্রায় ১০ ভাগে ব্যবহৃত হবে সেপটিক ট্যাংক।

দীর্ঘমেয়াদে, পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা আরো বেশি সম্প্রসারিত হবে। এতে বড় পৌরসভাগুলোতে পানি সরবরাহ কভারেজ উন্নীত হবে ৯০, ছোট পৌরসভাগুলোতে ৮৫, নগর কেন্দ্রগুলোতে ৪০ ও গ্রামীণ এলাকায় ১০-২০ ভাগে। স্যুয়ারেজ কভারেজ ঢাকা শহরে ৬০, চট্টগ্রাম শহরে ৩০, খুলনায় ২৫ ও অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনগুলোতে ১০ ভাগে উন্নীত হবে। একই মেয়াদে অন্যান্য বড় পৌরসভায় স্যুয়ারেজ পদ্ধতির প্রবর্তন করা হবে এবং এর আওতায় আসবে পৌরসভাগুলোর মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ ভাগ।

৬.৪.২ বিনিয়োগ ব্যয় বিভাজন

দৃশ্যকল্প ২ এর বিভিন্ন শ্রেণীর নগর উপখাত ও গ্রামীণ উপখাতের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ব্যয় নিচের সারণি ৬.৭-এ প্রদর্শন করা হলো।

সারণি ৬.৭: বিভিন্ন শ্রেণীর নগর উপখাত ও গ্রামীণ উপখাতের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ব্যয়

শ্রেণী	স্বল্পমেয়াদ (২০১০-২০১৫)	মধ্যমেয়াদ (২০১৬-২০২০)	দীর্ঘমেয়াদ (২০২১-২০২৫)	মোট
নগর পানি সরবরাহ	১৬৫,২২০	২৮০,৪৬৭	২৬৯,২৫৭	৭১৪,৯৪৫
নগর স্যানিটেশন	৯৩,৫১৩	১০৭,৫৫৫	১৩৪,৮২৩	৩৩৫,৮৯১
নগর পানি-নিষ্কাশন	৪০,৪৮৫	৬৫,৪৪৯	৭৪,৫৩৮	১৮০,৪৭২
গ্রামীণ পানি সরবরাহ	৪৪,৬৮৭	৪২,৮২৪	৫৫,১১১	১৪২,৬২২
গ্রামীণ স্যানিটেশন	৩৬,৫০৪	২৭,৭২৬	২৭,৩৬০	৯১,৫৯০
মোট	**৩৮০,৪১০**	**৫২৪,০২১**	**৫৬১,০৮৯**	**১,৪৬৫,৫২০**

নিচের চিত্র ৬.২ স্বল্পমেয়াদে মোট ব্যয়ের শতাংশ বিভাজন ব্যাখ্যা করেছে। এ থেকে প্রতীয়মান হবে যে, বিনিয়োগের বেশিরভাগ অংশই (৭৯%) নগর উপখাতের জন্য প্রয়োজন। নগর উপখাতে বিনিয়োগের উচ্চ অনুপাত থেকে আপাতঃ মনে হতে পারে সেক্টর সম্পদের বৈষম্যমূলক বিতরণ হয়েছে। কিন্তু, নগর এলাকায় উচ্চ বিনিয়োগ চাহিদা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার তুলনামূলকভাবে উচ্চ একক মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করছে। যেমন: পাইপবাহিত পানি সরবরাহ, ঢাকা শহরের স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা ও নগর নিষ্কাশন প্রণালী। তদুপরি নগর এলাকায়, বিশেষ করে বড় বড় শহরগুলোতে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয় দারিদ্র্য এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে মৌলিক সেবার অভাবের বিষয়গুলো। মোট শহুরে জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বস্তিবাসী এবং এ সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বস্তিতে স্যানিটেশন কভারেজের পরিমাণ মাত্র ৮.৫ ভাগ (MICS, 2009)। নিরাপদ পানির ক্ষেত্রে ৩০ ভাগেরও বেশি বস্তিবাসীর অভিগম্যতা নেই। এসডিপি'র অভিপ্রায় হলো অন্ততঃপক্ষে মৌলিক মানদণ্ড অনুযায়ী দরিদ্রসহ সকলের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করা। তদপ্রেক্ষিতে, নগর এলাকায় বিনিয়োগ দরিদ্রদের জন্য সবচেয়ে বেশি সুফল বয়ে আনবে। অথচ বর্তমানে এসব সেবার ক্ষেত্রে তাদের কোন অধিকার নেই।

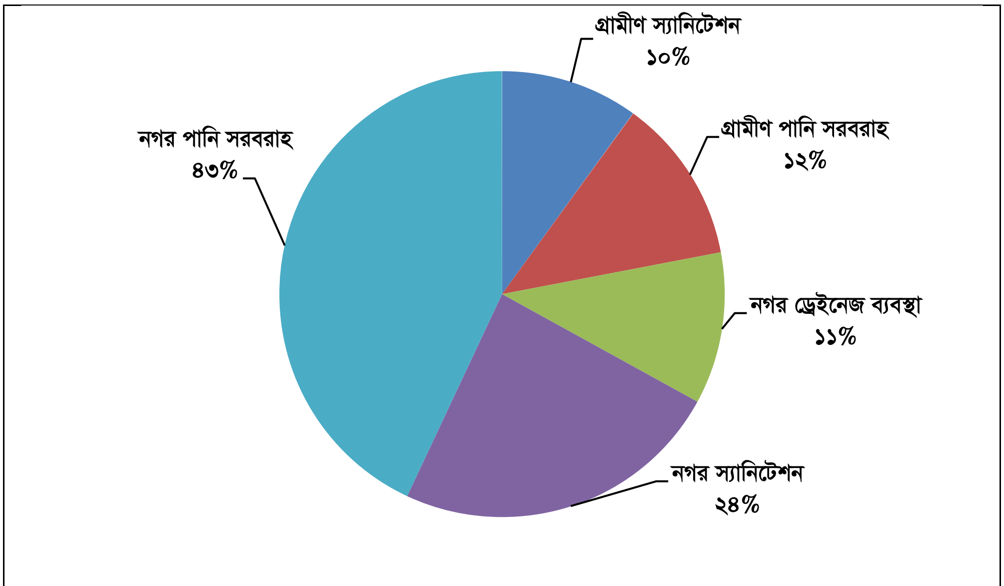

চিত্র ৬.২: স্বল্পমেয়াদে (অর্থবছর ২০১১-১৫) বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে মোট ব্যয়ের শতকরা বিভাজন

৬.৫ তহবিলের উৎস

সেক্টরের সকল অংশীদারের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে SDP বাস্তবায়িত হবে। তদানুযায়ী বিনিয়োগ ব্যয়ও নিম্নরূপ তিনটি বৃহত্তর দলে বিভক্ত সেক্টরের সহযোগীরা বহন করবে:

– **সরকারি খাত** (সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীসমূহ কর্তৃক অর্থায়ন এবং ওয়াসা ও পৌরসভার পানি সরবরাহ বিভাগের মত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানকারী কর্তৃক রাজস্ব সংগ্রহসহ);
– **বেসরকারি খাত** (ব্যয় ভাগাভাগির নিমিত্তে জনগোষ্ঠীর সহায়ক চাঁদা, ব্যক্তিগত খানা কর্তৃক বিনিয়োগ ও বেসরকারি উদ্যোক্তাসহ); এবং
– **এনজিও** (তাদের নিজস্ব তহবিল অথবা সরাসরি দাতা-সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তহবিল থেকে অনুদানসহ)।

পরিচালনা ও সংরক্ষণ ব্যয়সহ পূর্ণ বিনিয়োগ ব্যয়বহনের জন্য তহবিলের উৎস (দৃশ্যকল্প ২) নিচে উল্লিখিত সারণি ৬.৮-এ দেখানো হয়েছে:

সারণি ৬.৮: মোট বিনিয়োগ ব্যয় অর্থায়নের ক্ষেত্রে সেক্টর সহযোগীদের অবদান

তহবিল উৎসসমূহ	অর্থবছর ২০১১-১৫	অর্থবছর ২০১৬-২০	অর্থবছর ২০২১-২৫	মোট অর্থবছর ২০১১-২৫
১. সরকারি খাত:				
সরকারি খাতের বিনিয়োগ	২১০,৪৫৬	২৮৮,২৯৯	২৩২,৩৭৮	৭৩১
পানি ও স্যানিটেশন সেবাসংস্থাগুলোর রাজস্ব আয়	৮৮,৯৬০	১৪৪,৪৬৬	২০৯,৫২৬	৪৪২
২. বেসরকারি খাত:				
ব্যয়ভার বহনে ব্যবহারকারীর সহায়ক চাঁদা	২,১০৮	১০৬	৭০	২,২৮৪
ব্যক্তিগত পরিবারের বিনিয়োগ	৬৯,৬৭৭	৭০,১৯৩	৮৫,৩৮৫	২২৫,২৫৪
বেসরকারি উদ্যোক্তা	-	১৪,৭৭৫	২৮,৪৬৮	৪৩,২৪৩
৩. এনজিসসমূহ	৯,২০৯	৬,১৮২	৫,২৬৪	২০,৬৫৫
মোট (মিলিয়ন বাংলাদেশি টাকা)	**৩৮০,৪১০**	**৫২৪,০২১**	**৫৬১,০৮৯**	**১,৪৬৫,৫২০**
মোট (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	***৫,৪৩৪***	***৭,৪৮৬***	***৮,০১৬***	***২০,৯৩৬***

স্বল্পমেয়াদে পুরো বিনিয়োগ ব্যয়ের জন্য তহবিল উৎসের শতকরা হার ৬.৩ চিত্রে প্রদর্শন করা হয়েছে। বাংলাদেশি টাকার অঙ্কে এর পরিমাণ ৩৮০,৫০০ মিলিয়ন। এ বিনিয়োগ ব্যয়ের সিংহভাগ আসবে সরকারি খাত (৫৫ ভাগ) এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা সংস্থাগুলোর আদায়কৃত রাজস্ব (২৩ ভাগ) থেকে। ব্যক্তিগত খানার অবদানও (উদাহরণস্বরূপ, তাদের নিজস্ব নলকূপ ও পায়খানার জন্য) হবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ (১৮ ভাগ)।

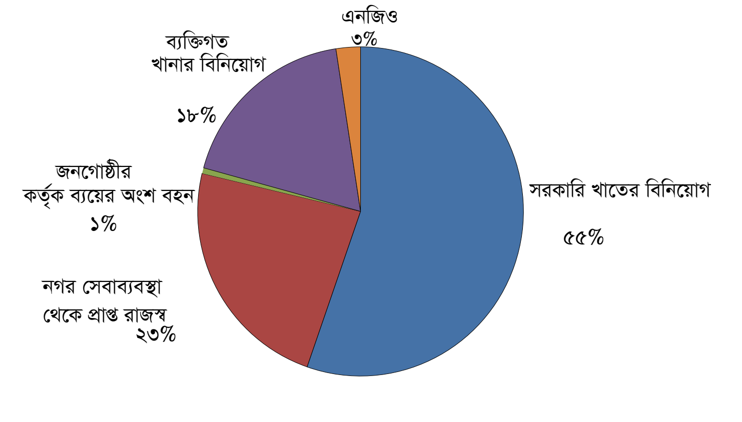

চিত্র ৬.৩ স্বল্পমেয়াদে (অর্থ বছর ২০১১-১৫) তহবিল উৎসের শতকরা হার

৬.৫.১ বাজেট লভ্যতা (availability)

বিগত পাঁচ বছরের বাজেট বরাদ্দ

সরকারি খাতের আওতায় গত পাঁচ বছরে পানি ও স্যানিটেশন খাতে বাজেট বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। চিত্র ৬.৪ থেকে দেখা যাবে যে, সকল এডিপি বরাদ্দের মধ্যে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতে ২০০৭ ও ২০১১ অর্থবছরসমূহে বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ২.৩ ও ৫.৬ ভাগ। স্পষ্টতঃই বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ। চিত্র ৫.৬ হতে দেখা যায় ২০০৭ ও ২০১১ অর্থবছরে প্রকৃত বরাদ্দের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬,৭৩৪ ও ২২,৩৯৮ মিলিয়ন টাকা। বাজেট বরাদ্দের পরিমাণের দিক থেকে এটা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি। একই সময়ে দাতাদের সহায়তার পরিমাণ ছিল পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতে মোট এডিপি বরাদ্দের প্রায় ৫০ ভাগ।

বাজেট প্রয়োজনীয়তা ও প্রাপ্যতা

এসডিপি'র স্বল্পমেয়াদ, অর্থাৎ ২০১১-১৫ অর্থবছরসমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতের জন্য লভ্য বাজেটের পরিমাণ নিরুপিত হয়েছে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF)তে প্রথম তিন বছরের (২০১১-১৩) রক্ষিত বরাদ্দ থেকে। অন্যদিকে ২০১৩ বছরের বরাদ্দ থেকে শুরু করে বার্ষিক পাঁচ ভাগ বৃদ্ধির ভিত্তিতে পরবর্তী দু'বছরের (২০১৪-১৫) প্রক্ষেপিত বাজেট প্রাক্কলন করা হয়েছে।

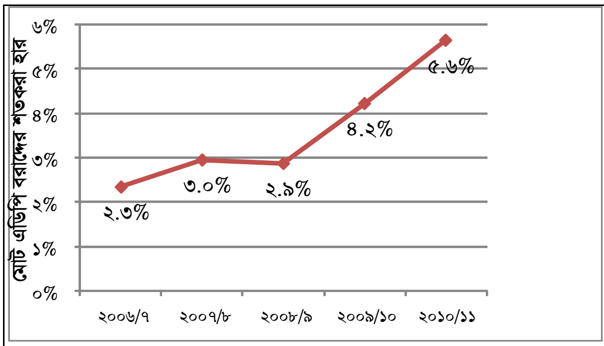

চিত্র ৬.৪: ২০০৭-১১ অর্থবছরসমূহে এডিপি বাজেট বরাদ্দের শতকরা হার

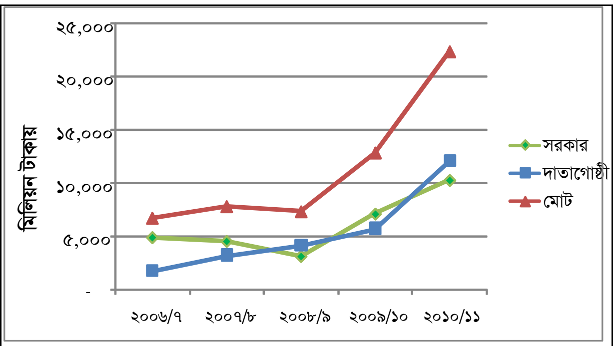

চিত্র ৬.৫: ২০০৭-১১ অর্থবছরসমূহে এডিপি বরাদ্দের (মিলিয়ন বাংলাদেশি টাকায়) পরিমাণ

সারণি ৬.৯-এ উপস্থাপিত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে লভ্য বাজেটের সাথে, স্বল্পমেয়াদে (অর্থবছর ২০১১-১৫) এডিপিতে বরাদ্দ দেয়া হবে, সরকারি খাতের এমন বিনিয়োগ চাহিদার তুলনা করা হয়েছে। নগর ও গ্রামীণ উপখাত এবং সরকারি খাতের সংস্থাসমূহের বিনিয়োগ প্রয়োজনীয়তা ও বাজেট লভ্যতার বিভাজনও দেখানো হয়েছে সারণিটিতে।

প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী, এসডিপি'র স্বল্পমেয়াদে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য সরকারি খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ চাহিদার পরিমাণ ২১০,৪৫৬ মিলিয়ন টাকা। বিপরীতে একই সময়ে বাজেট লভ্যতার পরিমাণ মোট ১১০,৫২৮ মিলিয়ন টাকা। অর্থাৎ, মেয়াদটিতে সম্ভাব্য বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ৪৭ শতাংশ। স্পষ্টতঃই নগর উপখাতে ঘাটতি সবচেয়ে বেশি, যার পরিমাণ গ্রামীণ উপখাতের ২৩ শতাংশের তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ। বাজেট ঘাটতির অধিকাংশই ওয়াসাসমূহের আওতা বহির্ভূত নগর উপখাতে, যেখানে প্রধানতঃ ডিপিএইচই ও স্বল্পতর পরিসরে এলজিইডি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদান করে থাকে। ডিপিএইচই'র বাজেট ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৭৬ শতাংশ। খুলনা ওয়াসার ঘাটতির পরিমাণও বাস্তবিক অর্থে ব্যাপক (৭০ শতাংশ)। ঢাকা ওয়াসার বাজেট ঘাটতি সর্বোচ্চ, টাকার প্রকৃত অঙ্কে যার পরিমাণ ৪৭,৪৪৪ মিলিয়ন।

সারণি ৬.৯: এসডিপি'র স্বল্পমেয়াদে সরকারি খাতে বিনিয়োগ চাহিদা ও বাজেট লভ্যতা

(মিলিয়ন বাংলাদেশি টাকায়)

উপখাত ও সংস্থাসমূহ	সরকারি খাতে বিনিয়োগ চাহিদা	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য লভ্য (MTBF) ও প্রক্ষেপিত বাজেট বরাদ্দ	বাজেট ঘাটতি	বাজেট ঘাটতির হার
১. নগর উপখাত:				
ওয়াসাসমূহ				
ঢাকা ওয়াসা	৯৭,৯০১	৫০,৪৫৬	৪৭,৪৪৪	৪৮%
চট্টগ্রাম ওয়াসা	৩০,৯৪৫	২১,১০৯	৯,৮৩৬	৩২%
খুলনা ওয়াসা	৭,০৬৯	২,১০০	৪,৯৬৮	৭০%
সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভাসমূহ ও অন্যান্য:				
ডিপিএইচই	৩৭,৯২৫	৮,৯৫৪	২৮,৯৭১	৭৬%
এলজিইডি	১২,৬৪২	১১,২৮০	১,৩৬১	১১%
২. গ্রামীণ উপখাত:				
ডিপিএইচই	২৩,৯৭৫	১৬,৬২৮	৭,৩৪৭	৩১%
মোট (মিলিয়ন বাংলাদেশি টাকা):	**২১০,৪৫৬**	**১১০,৫২৮**	**৯৯,৯২৮**	**৪৭%**
মোট (মিলিয়ন মার্কিন ডলার):	***৩,০০৭***	***১,৫৭৯***	***১,৪২৮***	***৪৭%***

বিগত পাঁচ বছরে (অর্থবছর ২০০৭-১১) এডিপি বরাদ্দের প্রবণতা এবং মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোয় (MTBF) ২০১১-১৩ অর্থবছরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতে প্রদত্ত বরাদ্দ রেখচিত্র (graph) আকারে চিত্র ৬.৬-এ প্রদর্শিত হলো। বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বিগত দুই বছরে উচ্চ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু, ২০১১-১৩ অর্থবছরের এমটিবিএফ বরাদ্দ তেমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়েনি।

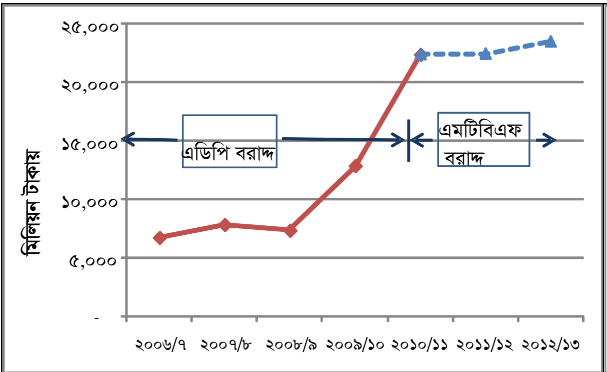

চিত্র ৬.৬: বিগত পাঁচ বছরের এডিপি ও ২০১১-১৩ অর্থবছরের MTBF বরাদ্দ

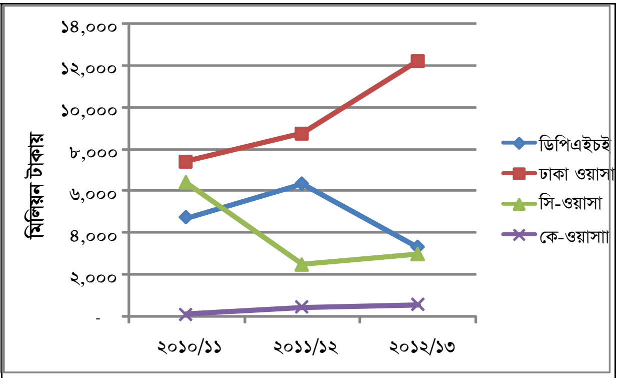

চিত্র ৬.৭: সেক্টর সংস্থাসমূহের MTBF বরাদ্দ

চিত্র ৬.৭-এ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের বিভিন্ন সংস্থার অনুকূলে MTBF বরাদ্দ (২০১১-১৩) দেখানো হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঢাকা ওয়াসার বরাদ্দ বেড়েছে। প্রান্তিকভাবে বেড়েছে খুলনা ওয়াসার বরাদ্দ। কিন্তু, ডিপিএইচই ও চট্টগ্রাম ওয়াসার বরাদ্দ কমেছে ব্যাপকভাবে। এর সার্বিক ফল হলো, ২০১১-১৩ অর্থবছরসমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য মোট MTBF বরাদ্দ শুধুমাত্র প্রান্তিকভাবে বেড়েছে। দু'বছরের (২০১১-১৩) বরাদ্দ প্রবণতার ভিত্তিতে ধারণা করা হচ্ছে ২০১৩-১৫ অর্থবছরসমূহেও MTBF বরাদ্দ একই থাকবে। স্বল্পমেয়াদে এসডিপি'র লক্ষ্য অর্জনের জন্য এমটিবিএফ-এর বরাদ্দ বর্তমান পর্যায় থেকে বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা প্রয়োজন।

পরবর্তী পাঁচ বছরে সেক্টরে বিনিয়োগের পরিমাণ ন্যূনপক্ষে দ্বিগুণ বাড়াতে হবে।

বিগত পাঁচ বছরে উন্নয়ন সহযোগীরা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনে মোট সরকারি খাতের বাজেটের প্রায় ৫০ ভাগ আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করেছে। আশা করা হচ্ছে, স্বল্পমেয়াদে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে একইরকম আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে। তাই, উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে মোট বিনিয়োগ চাহিদার ৩,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে ১,৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে উন্নয়ন সহযোগীদের সম্ভাব্য অর্থায়নের একটি হিসেব (পরিশিষ্ট ৮) থেকে দেখা যায়, স্বল্পমেয়াদে প্রত্যাশিত বরাদ্দ হবে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। স্থানীয় সরকার বিভাগ পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ-এর সাথে পরামর্শ করে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে আরও আর্থিক সহায়তা চাইতে পারে।

অধ্যায় ৭

সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন

সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (SDP) বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রস্তুত। এ অধ্যায়ে এসডিপি বাস্তবায়নের প্রারম্ভিক কিছু কঠিন কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে আইন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, নীতিমালা ও কৌশলসমূহের উন্নয়ন এবং একটি সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা। তৈরি করা হয়েছে এসডিপি বাস্তবায়ন তফশিলের (schedule) জন্য একটি পথ-নির্দেশনা (road-map)। সবশেষে, আলোচনা করা হয়েছে এসডিপি বাস্তবায়নের অনুমিত ঝুঁকি ও প্রশমনমূলক ব্যবস্থাসমূহ।

৭.১ সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (SDP) বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

এসডিপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারের উচ্চ গুরুত্ব প্রদানের নীতির প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ এসডিপি বাস্তবায়নকে সহায়তা, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করতে পিএসইউ-কে দায়িত্ব অর্পণ করেছে। নীতি সহায়তা কার্যক্রমসমূহ মূলধারামুখী করার লক্ষ্যে সরকার বর্তমানে প্রকল্প হিসেবে পরিচালিত পিএসইউ-কে ২০১৪ সনের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর নিয়মিত সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করবে।

৭.২ এসডিপি বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণ

উন্নয়ন ও সমন্বয়ের এমন একটি কাঠামো এসডিপি তৈরি করেছে যেখানে সেক্টরের অনেক সহযোগী অংশগ্রহণ করবে। এসডিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সহযোগীদের অংশগ্রহণ ও তাদের সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের ধরন সম্পর্কে একটা সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। গঠিত হয়েছিল অনেকগুলো বিষয়ভিত্তিক (thematic) গ্রুপ। এদের দায়িত্ব ছিল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান এবং এগুলো বাস্তবায়নের পথ-নির্দেশনা প্রদান ও সমন্বয় অব্যাহত রাখা। এ পদ্ধতি সহযোগীদের মধ্যে এসডিপি'র প্রতি উচ্চমানের মালিকানাবোধ জাগিয়েছে। সহযোগীদের অংশগ্রহণের জন্য প্রধান মোর্চা হিসেবে কাজ অব্যাহত রাখবে বিদ্যমান জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরাম (NFWSS)। বিভিন্ন সহযোগী সমন্বয়ে গঠিত কয়েকটি কমিটি ও গ্রুপ এ ফোরামের অধীনে সচল থাকবে বলে আশা করা যাচ্ছে (পরের অনুচ্ছেদে বিস্তারিত উল্লেখ আছে)।

৭.৩ এসডিপি কার্যক্রম সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

এসডিপি'র লক্ষ্য অর্জনে সেক্টর সঠিক পথে চলছে কী না তা নিরূপণে একটি শক্তিশালী সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রচলন ও বাস্তবায়ন খুবই কঠিন। একটি কার্যকর সেক্টর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার অনেকগুলো সুবিধা আছে: ভালো বা দুর্বল কর্মসম্পাদনের কারণ চিহ্নিত করার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ; সেবা প্রদানকারীদের স্বচ্ছ পন্থায় তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য খুব সহজেই জবাবদিহিতে বাধ্য করা যায়; কর্মসম্পাদন পরিমাপের, যেমন: কার্যকর পরিবীক্ষণ, আর্থিক পরিচালন (tracking) সমীক্ষা ও মূল্যায়নের উপায়গুলো সমন্বিতকরণ। নীতিমালার কার্যকারিতা নির্ণয় ও অধিকতর ভালো নীতিমালা প্রণয়নে সমর্থ হওয়ার জন্য উন্নত তথ্য; এবং, সেক্টরের জন্য আরও বেশি সম্পদ যোগান[৫৭] দিতে অধিকতর আস্থাশীল পদ্ধতি, ইত্যাদি।

---

[৫৭] সুবিবৃত টীকা (Well Briefing Note) নং ৭.১: উগান্ডার পানি ও স্যানিটেশনে জাতীয় সেক্টর কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন। WEDC-এর Julie Fisher কর্তৃক সংকলিত। বিবৃত টীকার উৎস: Mike Thomson, Patric A Okuni and Kavin Samson. WELL, Water, Engineering and Development Centre (WEDC). Loughborough University, UK.

এ অনুচ্ছেদে প্রথমে সেক্টর পর্যায়ে সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা, পরে প্রধান প্রধান সমস্যাগুলোর উল্লেখ ও সবশেষে একগুচ্ছ কর্ম-নির্দেশনা উপস্থাপিত হয়েছে।

৭.৩.১ সেক্টর পর্যায়ে সমন্বয়ের বর্তমান অবস্থা

দু'টি বৃহত্তর পর্যায়ে আছে সমন্বয় করা হবে: জাতীয় পর্যায় ও স্থানীয় পর্যায়।

জাতীয় পর্যায়

জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা (NPSWSS), ১৯৯৮ মতে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধিবৃন্দ সমন্বয়ে এবং সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর সভাপতিত্বে গঠিত জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরাম (NFWSS) সেক্টর কার্যক্রম সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। ২০০০ সনে ফোরামটি গঠনের পর থেকে তা সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও কৌশলপত্রের অনেকগুলো দলিল অনুমোদন, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করেছে। এর দু'টি উপকমিটি আছে: উপকমিটি 'ক' নীতিমালা ও কৌশলপত্রসমূহের এবং উপকমিটি 'খ' কারিগরী বিষয়ের জন্য গঠিত। এসব উপকমিটির আওতায় অনেকসংখ্যক ওয়ার্কিং গ্রুপ ও বিষয়ভিত্তিক (থিম্যাটিক) গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলোর কিছু গ্রুপ সংশোধিত এসডিপি প্রণয়ন পর্যায়ে গঠিত এবং সেগুলো খুব মূল্যবান অবদান রেখেছে (বিস্তারিত অধ্যায় ২)। এ থেকে এরূপ ধারণা জন্মেছে যে, বাস্তবায়নকালেও বিষয়ভিত্তিক (থিম্যাটিক) গ্রুপগুলো কারিগরী সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবে।

অধিকন্তু, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর সভাপতিত্বে রয়েছে জাতীয় স্যানিটেশন টাস্কফোর্স। ২০১০ সনের মধ্যে সকলের জন্য শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনের লক্ষ্যে ২০০৪ সনের মধ্যভাগে টাস্কফোর্সটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সংশোধিত সময়সীমা ২০১৩ সনের মধ্যে সকলের জন্য স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত উপকমিটিসহ টাস্কফোর্সের তিনটি উপকমিটি আছে। যাহোক, ইউনিসেফ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যৌথ পরিবীক্ষণ কর্মসূচির প্রতিবেদন এবং জাতীয় স্যানিটেশন সচিবালয় প্রণীত প্রতিবেদনের মধ্যে স্যানিটেশন কভারেজ-এর সংজ্ঞাগত পার্থক্য আছে। তাই বুয়েটকে আহ্বায়ক করে গঠন করা হয়েছে একটি স্বাধীন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি। এখানে সবার দৃষ্টিগোচর করা প্রয়োজন যে, জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০০৫ মতে, পরিবীক্ষণ পদ্ধতি ও পরিবীক্ষণে ব্যবহৃতব্য স্থিতিমাপ (প্যারামিটার) নিরূপণ এবং সকল পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত (ওয়ার্ড হতে সিটি, সিটি হতে জাতীয়) যাচাই করার দায়িত্ব জাতীয় স্যানিটেশন সচিবালয়ের। আর্সেনিক সমস্যা মোকাবিলা করতে জাতীয় ফোরাম আরেকটি উপকমিটি গঠন করেছে। জাতীয় আর্সেনিক নিরসন নীতিমালা ২০০৪ ও বাংলাদেশে আর্সেনিক নিরসন বাস্তবায়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা এ কমিটির কাজ। এ উপকমিটিটি ২০০৯ সনের গোড়ার দিকে 'খ' উপকমিটির অধীনে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপে পরিণত হয়েছিল।

এতদ্ব্যতীত, বাংলাদেশে স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ-এর ছত্রছায়ায় (LCG) অন্যান্য সহযোগী, সরকারি সংস্থা ও এনজিওসমূহের অংশগ্রহণে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক দাতাদের একটি গ্রুপ আছে। LCG সাবগ্রুপ পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা করে। এ ছাড়াও সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও সামঞ্জস্যবিধান করে সেক্টর উন্নয়ন কার্যক্রমের। এ সাবগ্রুপটি প্রয়োজনমত অস্থায়ী ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করতে পারে।

স্থানীয় পর্যায়

স্থানীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় (focal) প্রতিষ্ঠান হলো ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান-এর সভাপতিত্বে ইউনিয়ন ওয়াটসান কমিটি। এ ছাড়াও চেয়ারম্যান নলকূপের স্থান নির্বাচন কমিটিরও সভাপতি। অধিকন্তু, বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র-সহায়ক কৌশলপত্র ২০০৫ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে ওয়ার্ড পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটিসমূহকে মাসিক সভার কার্যবিবরণী ইউনিয়ন পরিষদে প্রেরণ করতে হয়। কার্যবিবরণীতে সাধারণভাবে বিদ্যমান

ওয়াটসান পরিবেশ ও সুনির্দিষ্টভাবে হত-দরিদ্রদের বিষয় উল্লেখ থাকে। ইউনিয়ন আর্সেনিক নিরসন কমিটি, অন্যান্যের মধ্যে ইউনিয়নে জরুরি পানি সরবরাহ কর্মসূচি তদারকি ও সমন্বয় করে।

৭.৩.২ সমস্যাসমূহ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমের অধিকতর কার্যকর সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে বিবেচনায় নেয়া আবশ্যক এমন প্রধান সমস্যাগুলো নিম্নরূপ:

বহুলবিস্তৃত কমিটি ও গ্রুপসমূহ: সেক্টর কর্মকাণ্ড সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে জাতীয় পর্যায়ের কমিটি ও গ্রুপসমূহ সাধারণভাবে কার্যকরী অবদান রাখছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর আরও লাভবান হতো, যদি বিদ্যমান বিপুলসংখ্যক কমিটি ও গ্রুপগুলোকে সংকুচিত ও যৌক্তিক করা যেত। এরূপ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয় যে, বহুলসংখ্যক কমিটি ও গ্রুপ প্রায়শঃই "সভাজনিত ক্লান্তি"তে ভোগে। একই কর্মকর্তরা বিভিন্ন উপলক্ষে সভায় অংশ নেয়ায় ও কাজকর্মে অধিক্রমণ (overlapping) ঘটার ফলশ্রুতিতে মানব ও অর্থসম্পদ এবং সময়ের অপচয় ঘটে।

জাতীয় সংস্থাসমূহ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা: পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের ফোকাল এজেন্সি হিসেবে সেক্টর কর্মকাণ্ড কার্যকরভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ডিপিএইচই'তে কর্মরত কর্মীদের সার্মথ্যের অভাব রয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে, সকল পর্যায়ে তথ্য ও উপাত্তের যথাযথ সংরক্ষণে এবং নিয়মিত সেগুলো হালনাগাদকরণ ও প্রকাশনায় যথেষ্ট উন্নতিবিধান আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে একটি ঘটনা হলো, *ডিপিএইচই ডাটা বুক* শেষবার হালনাগাদকরণ করা হয়েছিল ২০০৪ সনে। ডাটা বুক-এ কর্মসম্পাদন নির্দেশকসহ পৌরসভা সংক্রান্ত কার্যকর তথ্য আছে। এটি বার্ষিকভিত্তিতে প্রকাশ করার কথা। একইভাবে, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের অভ্যন্তরে তথ্য ব্যবস্থাপনাও পর্যাপ্ত নয়।

স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন ওয়াটসান কমিটিগুলোও দুর্বল। খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য গঠিত এজিও ফোরাম ১৬টি দক্ষতা নির্দেশক ব্যবহার করে। তাদের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে এমন ইউনিয়ন পরিষদসমূহের দক্ষতা মূল্যায়নে দেখা গেছে, ৫০ শতাংশ ইউনিয়ন পরিষদ ওয়াটসান কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সন্তোষজনক নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম। অন্যদিকে ৩৫ শতাংশ আংশিকভাবে এবং অবশিষ্ট ১৫ শতাংশ ইউনিয়ন পরিষদ দুর্বল সামর্থ্যের অধিকারী।[৫৮]

সেক্টরভিত্তিক অপর্যাপ্ত তথ্য: প্রথমত, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে এককভাবে সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার নিজস্ব সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা আছে। এগুলোর অধিকাংশই উন্নয়ন প্রকল্পভিত্তিক এবং এখানে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজ ও দক্ষতা পর্যাপ্তরূপে বিবেচিত নয়। দ্বিতীয়ত, সেক্টরের প্রধান প্রধান নির্দেশকসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে ব্যবহৃত সংজ্ঞা, পরিভাষা ও পদ্ধতি সরকারি এবং অন্যান্য সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পে প্রায়শঃই সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। এ অসঙ্গতি আন্তঃপ্রকল্প দক্ষতার তুলনাকে কঠিন করে তোলে এবং সেক্টরের সার্বিক দক্ষতার অপর্যাপ্ত প্রতিফলন ঘটায়। তৃতীয়ত, আরেকটি সমস্যা রয়েছে যা সেক্টরভিত্তিক তথ্যের অভাব থেকে সৃষ্ট। এটা হলো নীতিমালা ও অগ্রাধিকারসমূহের এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও জেণ্ডার অগ্রগতিতে অর্থব্যয়ের ফলাফলের সাথে আর্থিক সম্পদ বরাদ্দের কার্যকর সংযোগসাধন, যা স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রণীত MTBF-এ প্রয়োজন। পরিশেষে, ব্যক্তি উদ্যোগে স্থাপিত হস্তচালিত নলকূপ ও স্যানিটেশন সুবিধাদির মত বড় অবদানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত না করতে পারার কারণে সেক্টরের প্রকৃত সাফল্য বা নৈপূণ্য অন্ধকারাচ্ছন্নই থেকে যায়।

৭.৩.৩ সেক্টর সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের জন্য কর্ম-নির্দেশনা

কার্যকর সমন্বয়সাধন ও সেক্টরের নৈপূণ্য মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন:

---

[৫৮] খাবার পানি ও স্যানিটেশনের জন্য এনজিও ফোরাম-এর বার্ষিক প্রতিবেদন, অনুচ্ছেদ ৩: পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যমান কমিটি ও গ্রুপগুলো সহজতর করা: জাতীয় পর্যায়ে কেবলমাত্র জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরাম (NFWSS) কার্যকর থাকবে। ফোরামের অধীনে থাকবে দু'টি কমিটি: (১) নীতি ও পরিবীক্ষণ কমিটি, এলজিডি'র যুগ্ম-সচিব (পানি সরবরাহ) কমিটির সভাপতি হবেন এবং পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ) এখানে সচিবালয়ের দায়িত্ব পালন করবে; এবং (২) কারিগরী সহায়তা কমিটি, বিদ্যমান থিম্যাটিক গ্রুপসমূহের সদস্যবৃন্দ সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সভাপতি হবেন ডিপিএইচই'র প্রধান প্রকৌশলী (চিত্র ৭.১ দেখুন)।

জাতীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ডসমূহে সহযোগীদের অংশগ্রহণের জন্য জাতীয় ফোরাম প্রধান মোর্চা (platform) হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সেক্টরের কর্মকাণ্ড সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের জন্যও ফোরাম দায়িত্ববদ্ধ থাকবে। নীতি ও পরিবীক্ষণ কমিটি প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক বিষয়াদির পাশাপাশি নীতিমালা, কৌশলপত্র ও এসডিপি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে। এটি সরকারি সংস্থা, এনজিও ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় এবং সেক্টর তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (SIS) কার্যকারিতার বিষয়টিও দেখভাল করবে। কারিগরী কমিটি সেক্টরের কারিগরী দিকসমূহ ও থিম্যাটিক গ্রুপের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবে। এগুলো ব্যতীরেকে বিদ্যমান অন্য সকল উপকমিটি ও ওয়ার্কিং গ্রুপ বাতিল হবে। স্থানীয় পরামর্শক দলের (LCG) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সাব-গ্রুপ, যা উন্নয়ন সহযোগীদের একটি অপরিহার্য মোর্চা বিবেচিত, প্রয়োজনানুযায়ী জাতীয় ফোরামের দু'টি উপকমিটির সাথে সমন্বয়বিধান করবে।

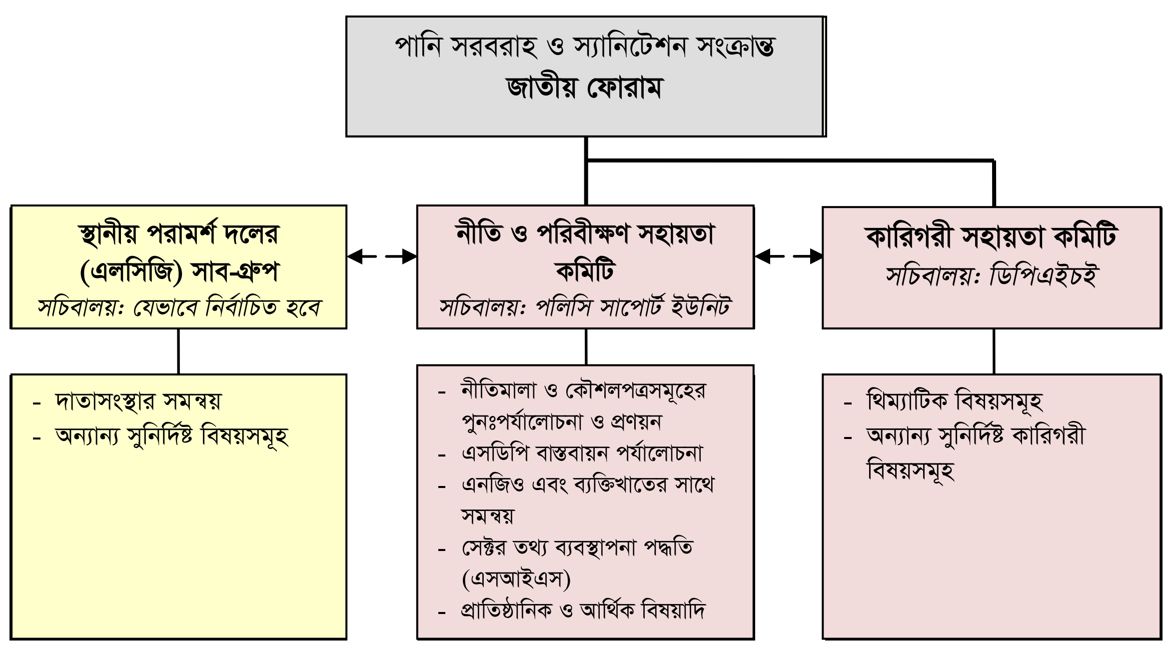

চিত্র ৭.১ সেক্টর সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা

সেক্টর তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (SIS) প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন: প্রথমেই পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে একটি নিবেদিত SIS প্রতিষ্ঠা জরুরি। পর্যাপ্ত আর্থিক ও ভৌত সম্পদের সমর্থনে প্রশিক্ষিত কর্মীগণ পদ্ধতিটি পরিচালনা করবে (বক্স ৭.১)।[৫৯] লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগতি পরিবীক্ষণে এবং সেক্টরের অগ্রগতি বিষয়ে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী ও জনসাধারণকে অবহিত করার ক্ষেত্রে SIS একটি অপরিহার্য হাতিয়ার বা উপায়। সেক্টর নৈপূণ্যের সঠিক দিক বজায় (track) রাখার জন্য নির্দেশকগুলো সহজ, পরিমাপযোগ্য ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য বা বাস্তবায়নযোগ্য হতে হবে। তদানুসারে, প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) সেক্টরের প্রধান ৮টি নির্দেশক ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা

---

[৫৯] কেনিয়ান পানি খাতের তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, MWI-এর তথ্য উন্নয়ন, পানি ও সেচ মন্ত্রণালয়, পানি সেক্টর ওয়ার্কিং গ্রুপ, চূড়ান্ত প্রতিবেদন, নভেম্বর ২০০৬ হতে নেয়া।

করবে, যেগুলোর ভিত্তিতে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম। তবে, প্রতিষ্ঠানগুলোকে এজন্য পর্যাপ্ত আর্থিক, ভৌতসম্পদ ও সামর্থ্য বৃদ্ধি সহায়তা প্রদান করতে হবে (সারণি ৭.১)।

সারণি ৭.১ জাতীয় পর্যায়ে সেক্টর তথ্য ব্যবস্থাপনা দক্ষতার প্রধান নির্দেশকসমূহ

দক্ষতা প্রদর্শণের ক্ষেত্রসমূহ	প্রধান নির্দেশকসমূহ	নির্দেশকগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ (একক)
অভিগম্যতা	পানি সরবরাহ কভারেজ	নিরাপদ খাবার পানিতে টেকসই অভিগম্যতা আছে এমন জনসংখ্যার অনুপাত (%)
	স্যানিটেশন কভারেজ	উন্নত স্যানিটেশন সেবাসুবিধায় অভিগম্যতা আছে এমন জনসংখ্যার অনুপাত (%)
কার্যকারিতা বা সচলতা (ফাংশনালিটি)	হিসাব বহিঃর্ভূত পানি	নিবন্ধিত গ্রাহকদের মধ্যে সরবরাহকৃত পানির তুলনায় উৎপাদিত পানির অনুপাত (%)
	পানির গুণমান	ব্যবহার-পর্যায়ে সংগৃহীত পানির গুণগত মানদণ্ড জাতীয় মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন সংগ্রহীত পানির নমুনার অনুপাত (%)
সাংগঠনিক দক্ষতা	ব্যয় পুনরুদ্ধার	পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সংগৃহীত রাজস্ব আয় দ্বারা পূরণকৃত বিনিয়োগ এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের অনুপাত (%)
বিনিয়োগ দক্ষতা	একক মূল্য	অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে সেবা প্রদানের একক-প্রতি মূল্য (মাথাপিছু বাংলাদেশি টাকা)
অন্তর্ভুক্তিমুখীতা	দরিদ্র-সহায়ক	পানি ও স্যানিটেশন সেবাসুবিধায় অভিগম্যতা আছে এমন দরিদ্র জনসংখ্যার অনুপাত (%)
আচরণ পরিবর্তন	হাত ধোয়া	পায়খানা ব্যবহারের পর ও খাবার গ্রহণের আগে সাবান বা ছাই দিয়ে হাত ধৌত করে এমন মানুষের অনুপাত (%)

সংক্ষেপে নির্দেশকগুলো হলো: (১) পানি সরবরাহ কভারেজ (নগর, গ্রামীণ ও জাতীয়); (২) স্যানিটেশন কভারেজ (নগর, গ্রামীণ ও জাতীয়); (৩) হিসাব বহির্ভূত পানি (নগর); (৪) পানির মান (নগর, গ্রামীণ ও জাতীয়); (৫) ব্যয় পুনরুদ্ধার (নগর); (৬) সেবার একক-প্রতি মূল্য (নগর, গ্রামীণ ও জাতীয়); (৭) দরিদ্র-সহায়ক (নগর, গ্রামীণ ও জাতীয়); এবং (৮) হাত ধৌতকরণ (নগর, গ্রামীণ ও জাতীয়)। পরিশেষে, সেক্টর সমন্বয় ও উন্নয়নের দায়িত্বপ্রদানের প্রেক্ষিতে, PSU কারিগরী সহযোগিতা সহায়তাসহ SIS উন্নয়নে নেতৃত্বদানকারীর ভূমিকা গ্রহণ করবে।

বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা: রিপোর্টিং লাইনসহ বিভিন্ন ধরণের সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা সারণি ৭.২-এ দেখানো হলো। বিভিন্ন পর্যায়ে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এর নিজস্ব পরিবীক্ষণ ও রিপোর্টিং ছক তৈরি করবে। তবে, প্রদত্ত ৮টি প্রধান নির্দেশকের বাইরেও সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত নির্দেশক অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। প্রতিটি পর্যায়ের কমিটিগুলো অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ আলোচনা করবে এবং নিজেরাই যতটুকু সম্ভব সেগুলো সমাধা করবে। এ ছাড়াও উন্নত নৈপূণ্য প্রদর্শণের জন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন হলে তা উচ্চতর পর্যায়ে অবগত করবে। কমিটিসমূহ অব্যবহিত নিচের স্তরে প্রতিবার্তা (ফিডব্যাক) প্রেরণ করবে। তাতে সার্বিক অবস্থার বিষয় ও তাদের নিজস্ব পর্যায়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য উল্লেখ থাকবে।

বক্স ৭.১ প্রস্তাবিত সেক্টর তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সরলীকৃত রূপরেখা

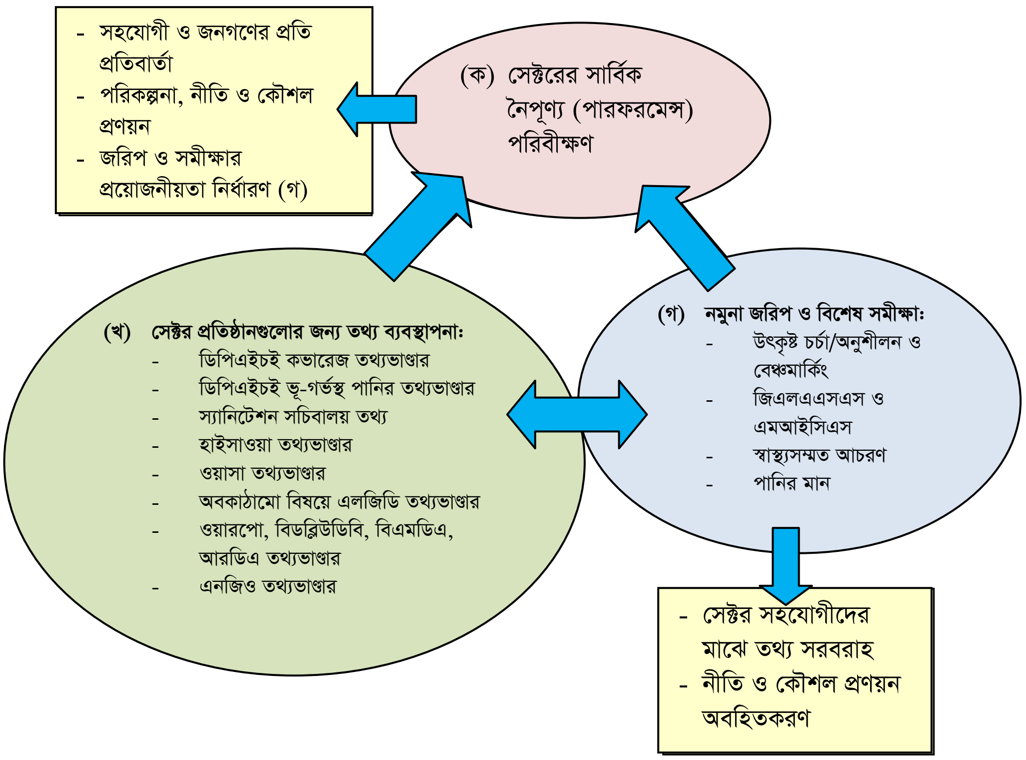

ক. ***সেক্টরের সার্বিক কর্মদক্ষতা পরিবীক্ষণ:*** *পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের কর্মদক্ষতা পরিবীক্ষণের জন্য প্রাথমিকভাবে ৮টি প্রধান নির্দেশক, যেমন: পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজ (বিস্তারিত সারণি ৭.১ দেখুন)।*

খ. ***সেক্টর প্রতিষ্ঠনসমূহের তথ্য ব্যবস্থাপনা:*** *কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ম্যান্ডেট-সংক্রান্ত অগ্রগতি পরিবীক্ষণে, এনজিওসহ সেক্টর প্রতিষ্ঠানসমূহে বিস্তারিত তথ্যব্যবস্থা। এটা প্রধানতঃ অগ্রগতি ও কর্মদক্ষতা পরিবীক্ষণের জন্য ব্যবহৃত। এসব প্রতিষ্ঠান তাদের পরিবীক্ষণ ও রিপোর্টিং পদ্ধতিতে ৮টি নির্দেশকের বাইরেও সংশ্লিষ্ট নির্দেশকসমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।*

গ. ***নমুনা জরিপ ও বিশেষ সমীক্ষা:*** *সেক্টর সম্পর্কিত বিষয়সমূহের ওপর বিশেষ সমীক্ষার ফলাফল পাওয়া। এগুলোর মধ্যে আছে: ভ্যালু ফর মানি সমীক্ষা, অধিকারের বিষয়সমূহের ওপর বিশেষ সমীক্ষা, জেণ্ডার, পানি ব্যবহারের ধরণ, সেচের দক্ষতা, ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রাপ্ত গবেষণা ও সমীক্ষার ওপর প্রতিবেদন তৈরির ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, ওয়েবসাইটে সংযুক্তির মাধ্যমে দলিলিকরণ হতে সকল সেক্টর সহযোগী সুফল পাবে।*

নোট: *SIS-এর 'খ' ও 'গ' অংশ 'ক' অংশের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত যোগাবে।*

সর্বনিম্ন স্তরের স্থানীয় সরকার হিসেবে, ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড ও জনগোষ্ঠী পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করার দায়িত্ব নেবে। যেখানে জনগোষ্ঠী বা ওয়ার্ড পর্যায়ে সংগঠন বিদ্যমান, সেখানে ইউনিয়ন পরিষদ তাদের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। কার্যকর পরিবীক্ষণ ও রিপোর্টিংয়ের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান সমস্যা হলো জনবল সীমাবদ্ধতা। ইউনিয়ন পরিষদ পরিবীক্ষণ ও রিপোর্টিংয়ের জন্য ইউনিয়নে কর্মরত চলমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প বা কোন আগ্রহী এনজিও'র বা ব্যক্তির সহায়তা নিতে পারে। সেক্টরের নেতৃত্বদানকারী সংস্থা হিসেবে ডিপিএইচই উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সমন্বয় ও রিপোর্টিংয়ে সহায়তা করবে। টেকসই উন্নয়নের জন্য, ইউনিয়ন পরিষদের অতিরিক্ত জনবল, বিশেষ করে হিসাব সহকারী ও কার্য সহকারী থাকা বাঞ্ছনীয়।

বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও এনজিওসমূহের সদর দপ্তর পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ চালিয়ে নেবে এবং স্টাণ্ডার্ড ছকে জাতীয় তথ্যভাণ্ডারে তথ্য প্রেরণ করবে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর পর্যায়ে,

SIS পরিচালিত হবে এলজিডি (PSU)/ডিপিএইচই কর্তৃক এবং এনজিওসহ বিভিন্ন সংগঠনের পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ের প্রধান সংস্থা জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরামের (NFWSS) কাছে প্রতিবেদন দেবে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক প্রস্তাবিত সচিব কমিটি আন্তঃসেক্টর সমন্বয় করবে।

জাতীয় পর্যায়ের মত, স্থানীয় পর্যায়েও বিভিন্ন কমিটি সহজ করা প্রয়োজন। এসব কমিটির কর্মকাণ্ড একই ধরণের বা অধিক্রমিত (overlapped)। ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে আর্সেনিক কমিটিসমূহ সংশ্লিষ্ট ওয়াটসান কমিটিসমূহের সাথে একীভূত (merge) করতে হবে। একইভাবে, ইউনিয়ন পর্যায়ে নলকূপের স্থান নির্বাচন কমিটি ইউনিয়ন ওয়াটসান কমিটির সাথে একীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সারণি ৭.২ বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য প্রস্তাবিত সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা

পর্যায়সমূহ	সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা	রিপোর্টিং লাইন
আন্তঃখাত	পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সচিব কমিটি	সময়ে সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও জাতীয় কমিটির নিকট
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর	পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত জাতীয় ফোরাম এলজিডি/ডিপিএইচই কর্তৃক পরিচালিত SIS	সময়ে সময়ে সচিব কমিটি, অন্যান্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় কমিটিসমূহ ও সেক্টর সহযোগীদের কাছে; এবং সেক্টর সহযোগীদের মাঝে তথ্য প্রচার
সেক্টর প্রতিষ্ঠানসমূহের সদর দপ্তর (ডিপিএইচই, ওয়াসাসমূহ,এলজিইডি, এনজিওসমূহ, ইত্যাদি)	সরকারি সংস্থা ও এনজিওসমূহের সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ বিভাগ	বিভিন্ন সংস্থার তথ্যভাণ্ডারের তথ্য সমন্বিত (কমপাইল) করা ও নির্ধারিত ছকে জাতীয় SIS-এ প্রেরণ।
জেলা	জেলা সমন্বয় কমিটি। ডিপিএইচই নির্বাহী প্রকৌশলী সদস্য-সচিব বা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য ফোকাল পারসন	সঙ্কলন, বৈধকরণ ও ডিভিশনে অনুলিপিসহ ডিপিএইচই সদর দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ। পাইপবাহিত পানি সরবরাহভুক্ত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা (এবং ইউনিয়ন ও উপজেলাসমূহ) ডিপিএইচই'র জেলা নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে রিপোর্ট করবে, অনুলিপি জেলা সমন্বয় কমিটিতে প্রেরণ করবে।
উপজেলা	উপজেলা ওয়াটসান কমিটিসমূহ (অথবা উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি)। ডিপিএইচই উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বা নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী সহকারী প্রকৌশলী) সদস্য সচিব	সঙ্কলিত প্রতিবেদন ডিপিএইচই নির্বাহী প্রকৌশলীকে অনুলিপিসহ জেলা সমন্বয় কমিটিতে প্রেরণ করবে।
ইউনিয়ন	ইউনিয়ন ওয়াটসান কমিটিসমূহ	সঙ্কলিত প্রতিবদেন ডিপিএইচই উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে অনুলিপিসহ উপজেলায় প্রেরণ করবে। ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ডসমূহ/কমিউনিটিসমূহ থেকে প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সঙ্কলন এবং উপজেলায় প্রেরণ করবে। ইউনিয়নে একটি ফোকাল এনজিও, অন্য সংস্থা, উন্নয়ন প্রকল্প বা আগ্রহী ব্যক্তি পাওয়া গেলে বিভিন্ন পর্যায়ে সভা আয়োজন ও প্রতিবেদন তৈরিতে ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা করতে পারে
ওয়ার্ড	ওয়ার্ড ওয়াটসান কমিটিসমূহ	ওয়ার্ড তথ্য সঙ্কলন ও ইউনিয়নে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।
কমিউনিটি	কমিউনিটি উন্নয়ন কমিটিসমূহ	সহজ ছক ও উপকরণ ব্যবহার এবং ওয়ার্ডে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে (বা কতিপয় ক্ষেত্রে সরাসরি ইউনিয়নে)।

৭.৪ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে সেক্টর-ভিত্তিক পন্থা (SWAp)

সেক্টর পর্যায়ে প্রয়োগযোগ্য এক ধরণের কর্মসূচিভিত্তিক পন্থা হলো সেক্টর ওয়াইড এ্যাপ্রোচ বা সোয়াপ {জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNPA), ২০০৫}। উন্নয়ন আলোচনায় এটা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে, একক বা বিচ্ছিন্ন প্রকল্প সাধারণতঃ যে কোন সেক্টরেই খণ্ডিত বা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন উন্নয়ন সাধন করে থাকে। প্রকল্প শেষ হবার পর এর ফলাফল টেকসই হয় না এবং অনানুপাতিকভাবে দুষ্প্রাপ্য মানবিক সামর্থ্য ও তহবিলকে সংকুচিত করে (UNPA, ২০০৪)। অধিকন্তু, বহুমুখী দাতাদের মাধ্যমে প্রদত্ত সাহায্য প্রায়শঃ খণ্ডিত বাজেটীয় ও ব্যবস্থাপনা কাঠামোর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয় এবং বিদ্যমান নীতিমালাসমূহের ও মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মধ্যে সঙ্গতির অভাব থাকে।[৬০] টেকসই ও ন্যায়সঙ্গত নিরাপদ খাবার পানি ও পরিবেশগত স্যানিটেশনে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এটা ইতোমধ্যেই উন্নয়ন সহযোগীদের সমর্থন ও সহায়তা লাভ করেছে। এসব প্রেক্ষিত বিবেচনায় এবং সোয়াপ-এর সুবিধা অনুধাবন করে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-এর অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ এসডিপি বাস্তবায়নকালে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে সোয়াপ অবলম্বন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এ অনুচ্ছেদ প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে সোয়াপ-এর ধারণা ব্যাখ্যা করেছে। তারই অনুসরণে গতানুগতিক প্রকল্প ধারণার প্রেক্ষিতে এর সুবিধাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তারপর বাংলাদেশে সোয়াপ বাস্তবায়ন পরিস্থিতি ও অর্জিত শিখন বিবরণী উল্লেখ করা হয়েছে। এটা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে সম্ভাব্য সোয়াপ পরিকল্পনায় প্রয়োগ করা যাবে। সবশেষে, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে সোয়াপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ ও এগুলোর সমাধানে কর্ম-নির্দেশনা আলোচনা করা হয়েছে।

৭.৪.১ সোয়াপ সম্পর্কে ধারণা

সেবা প্রদান ব্যবস্থাকে যৌক্তিক, সহজ ও উন্নত করতে সোয়াপ প্রতীকিভাবে, "সরকারি নেতৃত্বে, সেক্টরের মধ্যে সাধারণ পন্থা অনুসরণে, একটি একক সেক্টর নীতি ও ব্যয় কর্মসূচিকে সমর্থন এবং সকল তহবিলের হিসাব ও ব্যয়-নির্বাহে সরকারি নিয়ম-কানুনের ওপর নির্ভরতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে"[৬১] (M. Foster, A. Brown, A. and F. Naschold, 2001)।

এটা জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সোয়াপ একটি পন্থা বা পদ্ধতি। এটি কোন নীল-নকশা নয় এবং দেশভেদে ও সেক্টরভিত্তিতে এর প্রয়োগে তারতম্য ঘটে। তাই একটি সোয়াপ অবলম্বন-ই শেষ কথা নয়, বরং এটি পরিচালনা ও সহযোগিতার একটি প্রক্রিয়াভিত্তিক পদ্ধতি হিসেবে গণ্য হওয়া দরকার।

সাধারণভাবে, একটি সেক্টরের সামর্থ্য বৃদ্ধি ও এর দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সোয়াপ প্রতিষ্ঠার জন্য নিচের উপাদানগুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন (চিত্র ৭.২):

- ক) **সেক্টর নীতিমালা ও কৌশলপত্র:** একটি স্পষ্ট জাতীয় মালিকানাধীন সেক্টর নীতিমালা ও কৌশলপত্র থাকতে হবে। এগুলো দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রসহ অবশ্যই সরকারের সার্বিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কৌশলগত কাঠামো থেকে নির্গত ও সেগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে;
- খ) **সেক্টরের মধ্যমেয়াদি ব্যয়-কাঠামো:** একটি মধ্যমেয়াদি ব্যয় (অথবা বাজেটীয়) কাঠামো থাকা প্রয়োজন। সেটি নিশ্চিত করবে যে, সেক্টর কর্মপরিকল্পনার প্রস্তাবসমূহের ব্যয় যথাযথভাবে হিসাব করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত সরকারি ও বহিঃসম্পদের বাস্তবসম্মত প্রাক্কলনের বিপরীতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত;

---

[৬০] জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও), ২০০৭। মাইকেল ওয়েলস, মেলিসা ব্রাউন ও এলিসিয়া ফার্ণান্দেজ কর্তৃক বিনিয়োগ ও সম্পদ সমাবেশকরণে সেক্টর ওয়াইড এ্যাপ্রোচ (সোয়াপ), জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, মে ২০০৭, রোম।

[৬১] এম. ফস্টার, এ. ব্রাউন ও এফ. নাসকোল্ড, ২০০১। "সেক্টর প্রোগ্রাম এ্যাপ্রোচ: এগুলো কি কৃষিখাতে কার্যকর?"- একটি উন্নয়ন নীতিমালা পর্যালোচনা, ২০০১, ১৯(৩)।

গ) **অর্থায়ন ব্যবস্থা:** কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সম্পদের সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা রাখা, যা সেক্টরকে সহায়তা করবে, এর ফলে নিশ্চিত তহবিল উৎসের সাথে স্পষ্টভাবে প্রকল্পসমূহ ও কার্যক্রমের এবং বাস্তবায়নের জন্য সম্মত তফসিলের ভিত্তিতে বিস্তারিত কর্মসূচির যোগসূত্র স্থাপন হবে;

ঘ) **নৈপূণ্য পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা:** এমন একটি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা, যা অগ্রগতি পরিমাপ পদ্ধতি ও দায়বদ্ধতা মজবুত করবে;

ঙ) **সহযোগীদের সাথে পরামর্শ:** সকল উল্লেখযোগ্য সহযোগীদের সম্পৃক্ত করে ব্যাপক পরামর্শ গ্রহণের ব্যবস্থা;

চ) **সংলাপ ও সমন্বয় প্রক্রিয়া:** পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জাতীয় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করে সেক্টর পর্যায়ে সাহায্য সমন্বয় ও সংলাপের জন্য সরকার পরিচালিত একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া; এবং

ছ) **সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যবস্থা:** প্রতিবেদন, বাজেট, অর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অর্থ সংগ্রহের জন্য সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটাতে একটি সম্মত প্রক্রিয়া।

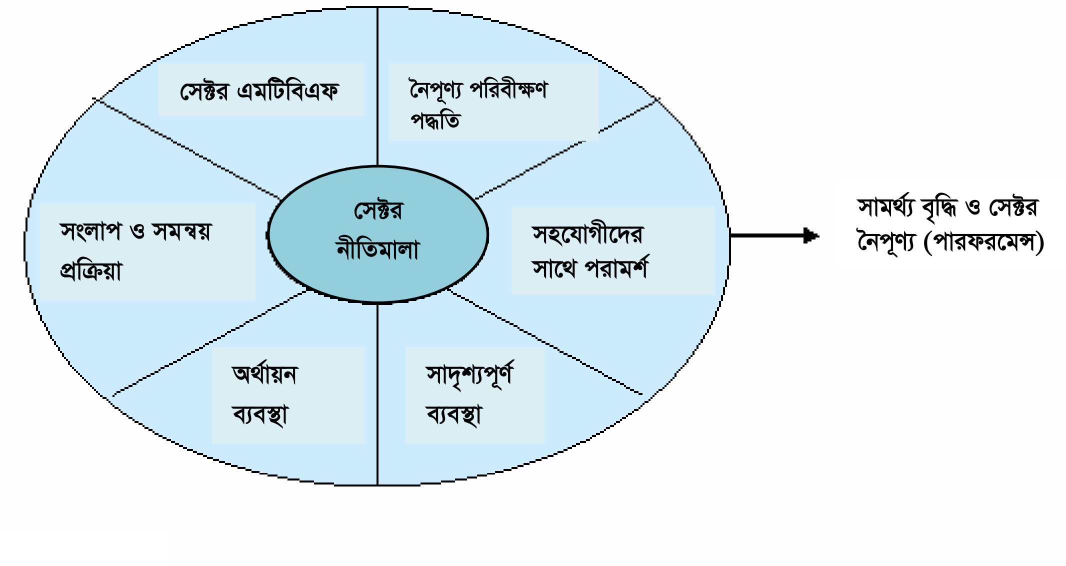

চিত্র ৭.২: একটি সোয়াপের উপাদানসমূহ

সূত্র: অসেড, ২০০৬ এবং জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, ২০০৭

সাধারণভাবে, চিরাচরিত প্রকল্প পদ্ধতির বদলে সোয়াপ ধারণার (সেক্টর কর্মসূচি) ভিত্তিতে উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের সুবিধা অনেক (বক্স ৭.২ দেখুন)।

বক্স ৭.২: প্রকল্প ধারণার পরিবর্তে সোয়াপ-এর সুবিধাসমূহ	
সোয়াপ	প্রকল্প ধারণা
১. **সরকারি মালিকানা** ও **নেতৃত্বের** ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং সরকারকে সেক্টরের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।	১. খুব বেশি দাতা-চালিত হতে পারে, দাতাদের অগ্রাধিকারকে প্রতিফলিত করে, সামান্যই সরকারি মালিকানার বহি:প্রকাশ ঘটায় এবং ফলশ্রুতিতে প্রকল্প প্রায়শঃই ব্যর্থ হয়।
২. **ফলাফল- ভিত্তিক** (সেক্টর দক্ষতার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করাসহ)।	২. ফলাফলের গুরুত্ব আছে, তবে সার্বিক সেক্টর প্রেক্ষিতের দিক হতে লক্ষ্য তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন হতে পারে।
৩. **নীতি বিষয়ে** অধিকতর গুরুত্ব প্রদানকে উৎসাহিত করে - **খুঁটিনাটি বিষয়ে নয়**।	৩. খুঁটিনাটি বিষয় দেখতে চায় এবং সর্বদা ব্যাপক-বিষয়গুলো কার্যকরভাবে বিবেচনা করতে পারে না।
৪. দাতাদের সহায়তাকে **বেশ সুসমন্বিত** করে তোলে।	৪. কার্যক্রমের ওপর সম্ভবতঃ কিছু তথ্য-বিনিময় ছাড়া দাতাদের মধ্যে সামান্যই বা কোন সমন্বয়ই হয় না।
৫. **অর্থায়নকে** স্বচ্ছতর ও **অধিকতর প্রত্যাশামূলক করে**। যদি একটি মাত্র ব্যয়-পরিকল্পনা থাকে, তখন সকল	৫. বিচ্ছিন্ন একটি প্রকল্প সার্বিক ব্যয়-কাঠামোর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই সার্বিক অর্থপ্রবাহ অস্পষ্ট প্রতীয়মান

সহযোগীই দেখতে পায় কোথায় তাদের অর্থ ব্যয় হচ্ছে।	হয় ও খুবই অপ্রত্যাশিত হতে পারে।
৬. **লেনদেন ব্যয় কমায়।** উন্নয়ন সহযোগী ও সরকার সীমিত ও সেক্টর-কেন্দ্রিক যৌথ পর্যালোচনায় সম্মত হতে পারে।	৬. অসংখ্য প্রকল্প পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও অন্যান্য মিশনের মাধ্যমে প্রায়শঃ নীতি-নির্ধারকদের উল্লেখযোগ্য সময় নিয়ে নেয়।
৭. **দায়বদ্ধতার উন্নয়ন ঘটায়।** সেক্টর কর্মসূচি প্রদানে সরকারি সেক্টরের মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহ দায়ী থাকে।	৭. প্রায়শঃই দাতাদের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে থাকে।
৮. স্থানীয় ব্যবস্থার ওপর ব্যাপক নির্ভরতার কারণে **সামর্থ্য বৃদ্ধিতে** অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে **উৎসাহিত** করা হয়।	৮. সরকারি ব্যবস্থাকে এড়িয়ে যেতে পারে। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট পরিচালনার জন্য অনেক ভালো ভালো সরকারি কর্মীদের নিয়ে যেতে পারে।
৯. কম সম্পদশালী সেক্টরে **সম্পদ বরাদ্দ অধিকতর বাড়াতে** পারে।	৯. প্রকল্পের পরিবেশ কদাচিৎ সেক্টর প্রবাহের সাথে সম্পর্কিত করা হয়। তাই সেক্টরের ভিতরে বা সেক্টরসমূহের মধ্যে সম্পদ বরাদ্দে তাদের প্রভাব কমই এবং কোনভাবে ভারসাম্যহীন হলে তা সামান্যই বিবেচনা করতে পারে।
১০. বাজেট প্রক্রিয়ায় **স্বচ্ছতার উন্নয়ন ঘটায়।** বিবৃত জাতীয় ও সেক্টর অগ্রাধিকারের সাথে সম্পদ বরাদ্দ সঙ্গতিপূর্ণ কি না তা যাচাই করতে একটি একক পরিকল্পনা ব্যয় সকল সহযোগীদের অনুমতি দেয়।	১০. প্রকল্পে এ রূপ ঘটে না। তাই সার্বিক তহবিল প্রবাহে সমান্য স্বচ্ছতা থাকে - এটাও সম্ভব নয় যে, সার্বিক তহবিল প্রবাহকে অগ্রাধিকারের সাথে তুলনা করা যাবে।

UNFPA, ২০০৫ হতে সংকলিত।

ঘটনাক্রমে সোয়াপ পদ্ধতি গ্রহণ করা হলে, বিদ্যমান প্রকল্পগুলো প্রত্যাহার করা উচিত হবে কী না তারপরও সে প্রশ্ন থেকে যায়। এটা স্বীকৃত যে, অব্যাহত প্রকল্প অর্থায়ন আবশ্যিকভাবে সেক্টর কর্মসূচির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যখন সোয়াপ-এর লক্ষ্য বিচ্ছিন্ন প্রকল্পগুলোকে একটি সমন্বিত কর্মসূচির আওতায় আনা, তখন তার অর্থ এ নয় যে, প্রত্যেকটি একক প্রকল্পকে পুরোপুরি একীভূত করতে হবে। একীভূতকরণ হলো কেবল আপেক্ষিকভাবে বর্ণনাযোগ্য অবিচ্ছেদ্য বিষয় (এমন ধারাবহিকতা, যেখানে কোনটি স্বতন্ত্র নয়, কিন্তু প্রথমটি থেকে সর্বশেষটি আলাদা)। যাহোক, বিদ্যমান প্রকল্পগুলো যেন সেক্টর কর্মসূচিকে তুচ্ছজ্ঞান না করে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বরং, প্রকল্পগুলোর উচিত: (ক) প্রকল্প লক্ষ্য ও কর্মকাণ্ড কীভাবে সেক্টরের উদ্দেশ্য সাধনে অবদান রাখতে পারে তা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করা; (খ) অন্যান্য ধরণের সহযোগিতার ক্ষেত্রে কেন প্রকল্প সহায়তা অগ্রগণ্য তা ব্যাখ্যা দেয়া; (গ) সরকারি বাজেট শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী ব্যয়-বিভাজন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বহুবার্ষিক প্রতিশ্রুতি দেয়ার চেষ্টা করা; ও (ঘ) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সরকারি পদ্ধতি ব্যবহার করা (যেমন: সংগ্রহ পদ্ধতি ও সেক্টর পর্যালোচনা ব্যবস্থা) অথবা এরূপ করা না হলে সুস্পষ্ট যৌক্তিকতা তুলে ধরা[৬২] (UNFPA, ২০০৫)।

৭.৪.২ বাংলাদেশে সোয়াপ বাস্তবায়ন পরিস্থিতি ও অর্জিত শিখন

এ যাবৎ বাংলাদেশে দুটো সোয়াপ বাস্তবায়ন হচ্ছে: একটি স্বাস্থ্য খাতে, অন্যটি প্রাথমিক শিক্ষা খাতে। দুটো কর্মসূচি-ই আমাদের জন্য মূল্যবান শিখন উপহার দিয়েছে (বক্স ৭.৩), যা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতে সম্ভাব্য সোয়াপ প্রণয়নে ব্যবহার করা যাবে।

অর্জিত শিখন: যখন সোয়াপ-এর বাস্তবিক কিছু সুবিধা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান, তখন অনেক সমস্যাও পোহাতে হচ্ছে। HNPSP'র ওপর পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, সোয়াপ পন্থার কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: (ক) সরকারি স্বাস্থ্য নীতিকে তা ভালো রূপ দিয়েছে ও শক্তিশালী করেছে। বাস্তবায়নকে কারিগরী ও আর্থিকভাবে সহায়তা দিয়েছে; (খ) বহিঃস্থ স্বাস্থ্য অর্থায়নকে যৌক্তিক ও সহজীকরণ করেছে। অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় এটাকে অধিক নমনীয়, সদৃশ্যপূর্ণ ও আন্দাজক্ষম করে তুলেছে; ও (গ) ব্যাপকভাবে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের

[৬২] UNFPA, ২০০৫। সেক্টর-ভিত্তিক পন্থা: UNFPA কর্মীদের জন্য একটি সহায়ক দলিল। HLSP ইনস্টিটিউট কর্তৃক UNFPA'র জন্য প্রস্তুতকৃত, সেপ্টেম্বর ২০০৫, যুক্তরাজ্য।

মধ্যেকার কর্ম-সম্পর্কে উন্নয়ন ঘটিয়েছে।[৬৩] অন্যদিকে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর বহুল-প্রার্থীত সাংগঠনিক ও শাসন বিষয়ক সংস্কার আনয়নে সোয়াপ-এর কার্যকারিতার প্রশ্ন এখনো অমীমাংসিত থেকে গেছে। তদুপরি, সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর মধ্যেকার দুর্বল সংলাপ, হীনবল নেতৃত্ব ও অপর্যাপ্ত পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্যভাবে সোয়াপ-এর কার্যকারিতাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে।

বক্স ৭.৩: বাংলাদেশে সোয়াপ বাস্তবায়ন

স্বাস্থ্য খাত

বাংলাদেশে প্রথম সোয়াপ হলো স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচি (HPSP)। এটা বাস্তবায়ন হয়েছিল ১৯৯৮ হতে ২০০৩ সময়ে। যাহোক, সমাপ্ত HPSP'র মূল্যায়ন এটা তুলে ধরেছে যে, দরিদ্রদের স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণে মোটাদাগে ঘাটতি রয়েছে। অন্যদিকে HPSP'র আওতায় স্বাস্থ্যসূচকগুলোর উন্নতিবিধানের অগ্রগতি ছিল কাঙ্খিত পর্যায় অপেক্ষা কম। HPSP'র ত্রুটিসমূহ কাটিয়ে উঠতে এবং একটি সংবেদনশীল, দক্ষ ও ন্যায়সঙ্গত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত প্রতিষ্ঠা করতে নতুন একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ২০০৩ থেকে শুরু হওয়া এ কর্মসূচির নাম হলো: স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচি (HNPSP)। এটি শেষ হবার নির্ধারিত সময় ২০১০ সন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর অধীনে অনেকগুলো বিভাগ কর্তৃক HNPSP বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে: মহাপরিচালক স্বাস্থ্যসেবা (DGHS), মহাপরিচালক পরিবার পরিকল্পনা ও নার্সিং সেবা পরিদপ্তর। তিনটি উৎস হতে HNPSP'র অর্থায়ন হয়ে থাকে। এগুলো হলো সরকারি রাজস্ব, সরকারি উন্নয়ন ও উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা। উন্নয়ন সহযোগীদের তহবিল বরাদ্দ, ব্যয়ন ও ব্যবহার করার জন্য দুটি পৃথক পদ্ধতি আছে। সম্মত কার্যকরী পরিকল্পনায় বর্ণিত প্রত্যেক উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়ন অংশের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে একটি সাধারণ তহবিল (Pooled Fund)। উন্নয়ন সহযোগীগণ কর্তৃক প্রদত্ত এ তহবিলটি সরকারের স্বাভাবিক বাজেটীয় চ্যানেলে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের কাছে সহজলভ্য করে তোলা হয়। উন্নয়ন সহযোগীদের সাধারণ তহবিলবহিঃর্ভূত অর্থ (Non-pooled Fund) সুনির্দিষ্ট প্রকল্পে বা কার্যকর পরিকল্পনার বাজেট লাইনের দিকে পরিচালিত। এটা সরকার ও সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থা অনুযায়ী হয়ে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষা খাত

দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (PEDP II) শিক্ষা খাতের সর্বপ্রথম সোয়াপ। এ কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষা উপখাত জুড়ে আছে। এ কর্মসূচিটি ২০০৪ সনের সেপ্টেম্বরে চালু হয়। আশা করা হচ্ছে, এটি ২০১১ সন নাগাদ সমাপ্ত হবে। বর্তমানে একটি অনুগমনকারী কর্মসূচি প্রণয়নের কাজ চলছে। কর্মসূচিটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (DPE)। অতীতের মত প্রকল্প ঢঙের বাস্তবায়ন ব্যবস্থা থেকে ভিন্নভাবে PEDP II বাস্তবায়িত হচ্ছে DPE'র লাইন বিভাগগুলোর মাধ্যমে। চারটি উৎস হতে PEDP II'র তহবিল পাওয়া যায়। এগুলো হলো: সরকারি তহবিল, সাধারণ তহবিল, Non-pooled Fund এবং Non-pooled আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের জন্য সমান্তরাল অর্থায়ন।

পর্যবেক্ষণে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, সমস্যা সোয়াপ মডেলে নয়, বরং এর প্রয়োগের মধ্যে নিহিত। তদুপরি, পর্যবেক্ষণে প্রধান প্রধান সোয়াপ নীতিসমূহের ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আছে: সরকারি নেতৃত্ব, বাস্তবানুগ সরকারি স্বাস্থ্য পরিকল্পনা, সাধারণ পর্যবেক্ষণ অবলম্বনের অঙ্গীকার, রিপোর্টিং ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা, বিশোষক ক্ষমতা (absorbtion capacity) বৃদ্ধি করে এমন উপায়ে বহিঃস্থ অর্থায়ন যোগানের অব্যাহত প্রচেষ্টা।

PEDP II'র ক্ষেত্রে, DPE কর্তৃক তৃতীয় কর্মসূচির জন্য প্রণীত ধারণাপত্রে অন্যান্যের সাথে নিম্নবর্ণিত শিখনগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে: (ক) কর্মসূচির প্রতি DPE এর অধিকতর মালিকানাবোধ দেখা দিয়েছে। যেহেতু অস্থায়ী হিসেবে পরিগণিত প্রকল্পের বিপরীতে PEDP II'র কার্যক্রমকে মূলধারার হিসেবে অনুধাবন করা হয়েছে; (খ) যেহেতু কর্মসূচি

[৬৩] Javier Martinez, ২০০৮। সংকটময় সময়ে সেক্টর-ভিত্তিক পন্থা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত। কারিগরি পদ্ধতি পত্র। HLSP ইনস্টিটিউট, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, যুক্তরাজ্য।

সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যাপক সুযোগ দিয়েছে, তাই DPE'র লাইন বিভাগের কর্মীদের সক্ষমতা বেড়েছে; (গ) বিচ্ছিন্নভাবে দাতা-চালিত প্রকল্পের বিপরীতে স্থায়িত্বশীলতার উচ্চ সম্ভাবনা বিদ্যমান; (ঘ) অতীতের বিক্ষিপ্ত কার্যক্রমের বিপরীতে এটি একটি হলিস্টিক পদ্ধতি; (ঙ) সরকারি প্রক্রিয়ার মূলধারা অনুসরণে উন্নয়ন কার্যক্রমে উন্নত শৃঙ্খলা ও শাসন বজায় রাখা (যেমন, উন্নয়ন সহযোগীদের একই সারিতে আসা)।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক[৬৪] ২০০৯ সনে PEDP II'র আরেকটি মূল্যায়ন করে। এতে সিদ্ধান্ত টানা হয় যে, সোয়াপ একটি প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর পন্থা। সে কারণে এটা উন্নয়ন সহযোগীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কমিয়ে আনতে সহায়তা এবং অনেক ফলাফল অর্জনে সামঞ্জস্যবিধানকে উন্নীত করে। বিশেষভাবে এটা হয়, তালিকাভুক্তকরণে বর্ধিত অভিগম্যতা ও জেণ্ডার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে। যাহোক, মূল্যায়নে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে যে, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও গুণগত মান সংক্রান্ত পদ্ধতিগত সমস্যাগুলো সমাধানে আরও প্রচেষ্টা থাকা প্রয়োজন।

৭.৪.৩ সমস্যাসমূহ

বৈশ্বিকভাবে, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে সোয়াপ অন্তর্ভুক্তকরণ তুলনামূলকভাবে নতুন সংযোজন হলেও ভিয়েতনাম, উগান্ডা ও কেনিয়ার মত অনেক উন্নয়নশীল দেশে এটি ইতোমধ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিদ্যমান প্রকল্পভিত্তিক পন্থা থেকে কর্মসূচিভিত্তিক পন্থায় সহজভাবে উত্তরণের (transition) প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইতোমধ্যে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সোয়াপ-এর জন্য অপরিহার্যভাবে প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচিত এ সকল অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে: (ক) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য জাতীয় ও সেক্টর নীতিমালা ও কৌশলসমূহের বিদ্যমানতা; (খ) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য গৃহীত কার্যক্রম অর্থায়নের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো গ্রহণে সরকারের মালিকানার বহিঃপ্রকাশ, (গ) সেক্টর স্টিয়ারিং কমিটি ও জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সরকারি মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ এবং অন্যান্য সেক্টর সহযোগীদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধনের জন্য একটি পদ্ধতি বাস্তবায়ন; এবং (ঘ) ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা ওয়াসাকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে একটি অংশীদারিত্বমূলক কাঠামো চুক্তি সম্পাদন।

এসকল অগ্রগতি সত্ত্বেও, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে সোয়াপ প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হলো মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের, সুনির্দিষ্ট করে এলজিডি ও ডিপিএইচই'র মত প্রধান দুটি সংস্থার (ভূমিকাপালনকারীর) অপর্যাপ্ত সামর্থ্য।

৭.৪.৪ সোয়াপ বিষয়ে সুপারিশমালা

এখানে HNPSP ও PEDP II'র থেকে অর্জিত শিখন এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের সোয়াপ সংক্রান্ত ইতোমধ্যে অর্জিত অগ্রগতির প্রেক্ষিতে কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে একটি সোয়াপ উন্নয়ন ও গ্রহণ সংক্রান্ত সুপারিশগুলো নিম্নরূপ:

- **সহজ ও ক্ষুদ্র।** শুরুতেই পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের সোয়াপ সহজ ও ক্ষুদ্র আকারের হওয়া উচিত। সক্ষমতা ও আস্থা বৃদ্ধির সুযোগ দিতে প্রকল্প থেকে কর্মসূচি ধারণায় উত্তরণ হতে হবে পর্যায়ক্রমিক। তদানুসারে, ধাপে ধাপে সোয়াপ পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য এলজিডিকে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। তিনটি ওয়াসা নিয়ে একটি সাব-সোয়াপ দিয়ে শুরু করা যায়। এটা ধরে নিতে হবে, সম্মত অংশীদারিত্বমূলক কাঠামোর আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। তারপর পর্যায়ক্রমে ছোট শহরসমূহ, বড় শহরসমূহ, মহানগরগুলোতে ও গ্রামীণ এলাকায় সম্প্রসারণ করা যাবে (চিত্র ৭.৩)। বিবেচনার জন্য আরেকটি সমান্তরাল ব্যবস্থা আছে। সেটা হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জন্য স্বল্পমেয়াদে একটি পৃথক সাব-সোয়াপ বাস্তবায়ন। ধারণা করা হচ্ছে

[৬৪] এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ২০০৯। বাংলাদেশে শিক্ষা: সেক্টর-ভিত্তিক পদ্ধতিতে কোনটি ভালো কাজ করে ও কেন? লার্নিং কার্বস, ম্যানিলা।

গ্রামীণ উপখাতে, ওয়াসাসহ বড় নগরীগুলোতে এবং সিটি কর্পোরেশনসমূহ ও পৌরসভাসমূহে সাব-সোয়াপ বাস্তবায়িত হতে পারে।

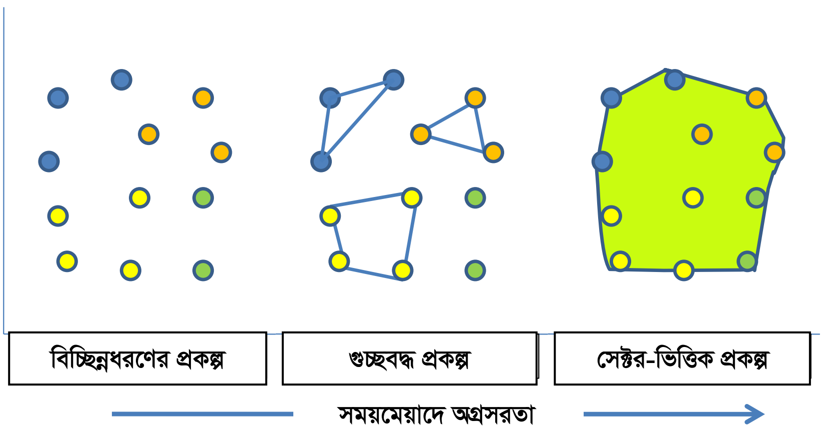

চিত্র ৭.৩ বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে সোয়াপ-এর স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম।

– প্রস্তুতিমূলক কাজ। এটা মেনে নিতে হবে যে, সোয়াপ পদ্ধতি উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত সময়, প্রচেষ্টা, সম্পদ ও অব্যাহত অঙ্গীকার প্রয়োজন। PEDP II'র ক্ষেত্রে প্রায় দু'বছর লেগে যায় প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে। ঐ সময়ে কর্মসূচির পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সহযোগীদের সাথে নিবিড় পর্যালোচনা হয়। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য সোয়াপ প্রবর্তনের প্রস্তুতিমূলক কাজে যেসব বিষয় গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন সেগুলো হলোঃ (১) সোয়াপ-এর প্রকৃতি সম্পর্কে উৎসাহী উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে মধ্যস্থতা/আলোচনা; (২) এলজিডি ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের জন্য সোয়াপ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ প্রদান; (৩) মধ্যমেয়াদি ব্যয়-কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য কর্মীদের সামর্থ্য বৃদ্ধি; (৪) তহবিল প্রবাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন; (৫) পরিবীক্ষণ ও রিপোর্টিং পদ্ধতি উন্নয়ন; (৬) সাহায্য সামঞ্জস্যকরণ নীতির প্রেক্ষিতে সরকারি আর্থিক, সম্পদ সংগ্রহ ও রিপোর্টিং প্রক্রিয়া ব্যবহারে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সম্মত হওয়া; এবং

– প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে নেতৃস্থানীয় সংস্থা। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-এর অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর PSU প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে নেতৃস্থানীয় সংস্থা হিসেবে কাজ করবে এবং সহযোগীদের সাথে আলোচনাক্রমে সকল প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড সমন্বয় করবে।

৭.৫ এসডিপি বাস্তবায়নের পথ-নির্দেশনা (Road map)

পূর্বেকার অধ্যায়সমূহে চিহ্নিত প্রধান কর্ম-নির্দেশনা সমন্বয়ে SDP বাস্তবায়নের পথ-নির্দেশনা তৈরি করা হয়েছে। পথ-নির্দেশনা সেক্টর এজেন্সীসমূহ অর্থাৎ এলজিডি, ওয়াসাসমূহ, ডিপিএইচই ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কর্ম-নির্দেশনা প্রদর্শন করছে। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বিভিন্ন কর্ম-নির্দেশনার বিপরীতে স্বল্পমেয়াদে SDP পরিবীক্ষণ মাইলফলকসহ কাজগুলো দেখানো হলো। পরিশিষ্ট ৯-এ বিস্তারিত কর্ম-নির্দেশনা উল্লেখিত আছে।

৭.৫.১ প্রারম্ভিক পর্যায়ে প্রধান কার্যক্রমসমূহ

প্রাথমিক দু' থেকে তিনবছরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড রয়েছেঃ

– **SDP বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা:** সরকার ইতোমধ্যে PSU-কে SDP বাস্তবায়নের সহায়তাকারীর দায়িত্ব দিয়েছে। কিছু মুখ্য কার্যক্রমের জন্য সরকার তহবিলও সংরক্ষিত রেখেছে। এসব কার্যক্রমকে এখন শক্তিশালী করাটাই জরুরি। পাশাপাশি সকল সেক্টর সহযোগীর সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা দরকার যেন তারা তাদের কাজগুলো এসডিপি কাঠামোর অধীনে সঞ্চালন করতে পারে;

– **সেক্টর সহযোগীদের মধ্যেকার চুক্তি:** এসডিপি অনুসারে, উন্নয়ন সহযোগী ও এনজিওসমূহসহ প্রধান সেক্টর এজেন্সিগুলো তাদের বাস্তবায়ন কৌশল পরিচালনার জন্য চুক্তিতে উপনীত হবে। প্রধান চুক্তিগুলো, যেমন: এলজিডি, ডিপিএইচই ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ) মধ্যেকার ত্রিপাক্ষিক চুক্তিনামাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এসডিপি বাস্তবায়নের শুরু থেকেই সরকারি সম্মতি নিতে হবে সোয়াপ ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের রূপরেখা বিষয়ে;

– **সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ:** আন্তঃখাত পর্যায়ে, আর্সেনিক সংক্রান্ত সচিব কমিটিকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে বর্ধিত করা যায়। এটি আন্তঃখাত বিষয়গুলো সম্পর্কে ব্যবস্থা নেবে। বিদ্যমান কমিটি ও গ্রুপসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের নির্দেশনার জন্য থিম্যাটিক গ্রুপগুলোর কর্ম-পরিচালনা পুনর্গঠনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের সমন্বয় কাঠামো দক্ষতর করতে হবে। বিদ্যমান NFWSS সকল পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত বিষয় সমন্বয় ও প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন SISও। দেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধাদির অবস্থা জানতে একটি জাতীয় জরিপ পরিচালনা করা এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার ক্ষেত্রে নাজুক জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতার মত সুনির্দিষ্ট বিষয়েও সমীক্ষা চালানো আবশ্যক;

– **সেক্টর সক্ষমতা:** সেক্টরের ভবিষ্যত উন্নয়ন সফলতার দিক থেকে ডিপিএইচই'র মত প্রধান সেক্টর সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি একটি মৌলিক বিষয়। কর্মী নিয়োগ, সাংগঠনিক পুনর্গঠন ও কর্মীদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারমূলক মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন;

– **আইন প্রণয়ন, নীতিমালা ও কৌশলপত্রসমূহ নবায়ন করা:** এলজিডি কর্তৃক পানি সেবা আইনের মত নতুন আইন প্রণয়ন, খসড়া পানি আইন সংশোধন ও একটি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এলজিডিকে ডিপিএইচই'র সহায়তায় বিদ্যমান নীতিমালা ও কৌশলপত্রসমূহ সহজ করারও ব্যবস্থা নিতে হবে;

– **উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান:** সকল নতুন প্রকল্প এসডিপি'র কাঠামোর আওতায় প্রণয়ন এবং চলমান প্রকল্পগুলো সংশোধনকালে এর সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে; ও

– **বাজেট বরাদ্দ:** এলজিডি, পরিকল্পনা কমিশন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য এজেন্সিগুলো উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সরকারি ও উন্নয়ন সহযোগীদের উৎস থেকে আর্থিক সহায়তা চাইতে পারে। এ জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো ও অত্যাসন্ন ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পর্যাপ্ত ব্যয়-বরাদ্দ রাখতে হবে।

৭.৬ ঝুঁকিসমূহ ও নিরসনমূলক পদক্ষেপ

সারণি ৭.৩-এ এসডিপি বাস্তবায়নে প্রধান প্রধান ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। ঝুঁকিসমূহের স্তরকে বিন্যস্ত করা হয়েছে তিনটি শ্রেণীতে: উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের ওপর ঝুঁকি উপাদানগুলোর প্রভাবের ভিত্তিতে স্তরগুলো নির্ধারিত। এসডিপিতে ঝুঁকির বিপরীতে প্রশমন পদক্ষেপসমূহও দেখানো হলো।

সারণি ৭.৩ অনুমিত ঝুঁকিসমূহ ও প্রশমনমূলক পদক্ষেপ

অনুমিত ঝুঁকিসমূহ	ঝুঁকিসমূহের স্তর	প্রশমনমূলক ব্যবস্থা
আইনি দলিলপত্র, নীতিমালা, কৌশলপত্রসমূহ ও পরিকল্পনাসহ এসডিপিতে নির্ধারিত সেক্টর সংস্কার হয়নি।	নিম্ন	স্থানীয় সরকার বিভাগ এসডিপি বাস্তবায়নের ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের দায়িত্ব PSU-কে প্রদান করেছে। এর অন্যতম প্রধান কাজ হলো সেক্টরের সংস্কার কাজ শুরু করা। PSU'র মূল কার্যক্রমের জন্য আগামী পাঁচ বছরের বাজেট ইতোমধ্যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। SDP বাস্তবায়নে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দিতে উন্নয়ন সহযোগীরা আগ্রহ দেখাচ্ছে।
স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর অধীনস্থ এজেন্সিসমূহ, বিশেষতঃ ডিপিএইচই ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি বাস্তবায়িত হয়নি।	মধ্যম	স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এর অধীনস্থ এজেন্সিসমূহ, যেমন: ডিপিএইচই ও ওয়াসাসমূহ সংস্কার ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সম্মত বিবৃতি স্বাক্ষর করেছে। প্রত্যাশা করা হয়েছিল যে, এজেন্সিগুলো অগ্রাধিকারভিত্তিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালনায় সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি সরকারের নীতি ও রাজনৈতিক বিবেচনার ওপর নির্ভর করে এবং এতে কিছু সময়ও লাগতে পারে। যাহোক পরামর্শ হলো, সরকারি এজেন্সি ও এনজিওরা সক্ষমতাজনিত ঘাটতি পূরণে সহায়তা দিতে পারে।
এসডিপিতে প্রতিফলিত প্রত্যাশা অনুযায়ী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক বাজেট বরাদ্দ বাড়েনি।	নিম্ন	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে এবং একটি SDP বিদ্যমান থাকায় এটা সম্ভব যে, এসব উদ্যোগ সহায়তার জন্য সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীরা সম্পদ যোগান দিতে পারে। SDP নির্দেশিত পরামর্শ হলো, অতিরিক্ত সম্পদ সমাবেশের জন্য পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয় ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ-এর মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ করা যায়।
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর বর্তমানে যেরূপ রাজনৈতিক সমর্থন ও প্রতিশ্রুতি পাচ্ছে ভবিষ্যতে তা নাও পেতে পারে।	নিম্ন	এটা প্রত্যাশিত যে, রাজনৈতিক সমর্থন অব্যাহত থাকবে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব বজায় রাখতে স্থানীয় সরকার বিভাগকে সমস্যা ও অগ্রগতি বিষয়ে অবহিত রাখতে হবে।
ঘন ঘন বয়ে যাওয়া বড় ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।	নিম্ন	বড় ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে পারে এমন প্রস্তুতি ও দুর্যোগকালীন প্রটোকলসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার রূপরেখা দিয়েছে SDP।
স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন সক্ষমতা উন্নীত করা, সিভিল সার্ভিস সংস্কার, দুর্নীতি দমন, মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন, ই-গভার্নেন্স সম্প্রসারণ ও সেক্টরাল সুশাসন উন্নীতকরণসহ PRSP II-তে ব্যক্ত অনুকূল পরিবেশ পুরোপুরি সৃষ্টি হয়নি।	মধ্যম	আশা করা যায় যে, পর্যায়ক্রমিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে অনুকূল পরিবেশ পর্যাপ্তভাবে উন্নীত হবে।
বৈশ্বিক অর্থনীতি অস্থিতিশীল থাকতে পারে ও বড় ধরণের অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিতে পারে।	নিম্ন	প্রত্যাশা করা যায় যে, বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় আরো সহিষ্ণুতা গড়ে তুলবে। যে রকমটি দেখা গিয়েছিল ২০০৮-০৯ অর্থবছরে। সংকটকালে মৌলিক সেবা হিসেবে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অগ্রাধিকার পাবে।